# নিরীক্ষা

এপ্রিল-জুন ২০২০

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর গণমাধ্যম সাময়িকী

২৩০তম সংখ্যা

মুজিববর্ষ সংখ্যা-৩

## তাঁর নাম বাংলাদেশ

নিরীক্ষা

২৩০তম সংখ্যা : এপ্রিল-জুন ২০২০ (বিশেষ সংখ্যা)

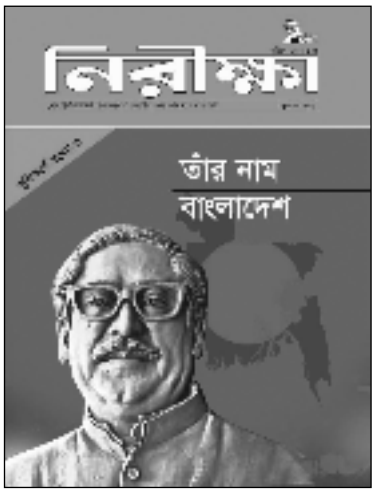


নানা প্রস্তুতি শেষে ১৭ মার্চ থেকে মুজিববর্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করেছি আমরা। যদিও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষের ক্ষণগণনা শুরু হয়েছে তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন ১০ জানুয়ারি থেকে। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ১৭ মার্চ ২০২১, অর্থাৎ জাতির পিতার এক জন্মদিন থেকে আরেক জন্মদিন পর্যন্ত বছরটি উদ্‌যাপিত হবে মুজিববর্ষ হিসেবে। বিশ্বব্যাপী করোনার সংক্রমণ এবং এ সংক্রান্ত সতর্কতার কারণে নির্ধারিত আয়োজন কিছুটা কাটছাঁট করা হয়েছে। তারপরও এই মহান নেতার জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ এবং শ্রদ্ধার আবহ থাকছে বিশ্বজুড়েই। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ দেশের শীর্ষ ব্যক্তিত্বদের শ্রদ্ধা জানানোর মধ্য দিয়ে গোটা জাতি স্মরণ করছে বাঙালির প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের এই মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের মানুষকে এক করে দেশকে উন্নয়নের সোপানে দাঁড় করানোর কারিকর হলেন বঙ্গবন্ধু। যাঁর রাজনৈতিক জীবনের সিংহভাগ কেটেছে আন্দোলন, সংগ্রাম আর কারাবরণে। তিনি কখনো ক্ষমতা ভোগের মানসিকতা নিয়ে রাজনীতি করেননি। সারাজীবন সাদামাটা জীবনযাপন করেছেন। কখনো মানুষের কাছ থেকে দূরে থাকেননি। কারণ, বঙ্গবন্ধু মনে করতেন তাঁর শক্তিই হলো জনগণ। স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান থেকে কারামুক্তি পেয়ে দেশে ফেরার পর ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বঙ্গবন্ধুর কাছে জানতে চেয়েছিলেন তাঁর শক্তির উৎস কী আর তাঁর দুর্বলতা কোথায়? দুটোর উত্তরই ছিল এক। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, আমি আমার জনগণকে ভালোবাসি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেভাবে উপমহাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র বদলে দিয়েছিলেন, তা বিশ্বের বিস্ময়! শুধু উপমহাদেশ নয়, বিশ্বের শোষিত মানুষের পক্ষে সগৌরবে অবস্থান নিয়েছিলেন তিনি। উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন– বিশ্ব শাসক ও শোষিত দুই ভাগে বিভক্ত, তিনি শোষিতের পক্ষে। কেবল বাংলাদেশ নয়। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার কোটি কোটি মুক্তিকামী মানুষের অনুপ্রেরণার অপর নাম বঙ্গবন্ধু। মাত্র সাড়ে তিন বছরের রাষ্ট্রপরিচালনায় তিনি বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবে যে উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন, তার তুলনা আর কোথাও নেই। বিশ্বপরিমণ্ডলে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ অসামান্য মর্যাদা ও সম্মান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁর নেতৃত্বে আয়তনে ছোটো রাষ্ট্র বাংলাদেশ হয়ে উঠেছিল বৈশ্বিক পরিমণ্ডলের বড়ো পক্ষ। জাতিসংঘ, ওআইসি, কমনওয়েলথ, ন্যাম প্রভৃতি বিশ্ব সংস্থায় বঙ্গবন্ধু ছিলেন নিপীড়িত রাষ্ট্রগুলোর প্রাগ্রসর প্রতিনিধি। সে কারণে আজও পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে স্বাধীনতা বা স্বাধিকারের প্রশ্ন এলে একজন শেখ মুজিবের প্রয়োজনীয়তার কথা উদাহরণ হিসেবে উঠে আসে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সংহতির প্রতীক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এখনো তাঁর জীবন, কর্ম ও বাণী দিয়ে জাতিকে শক্তি জুগিয়ে চলছেন। ভবিষ্যতের দিনগুলোয়ও বঙ্গবন্ধুর জীবন, কর্ম ও বাণী বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে পথ দেখিয়ে চলবে। আমরা বিশ্বাস করি, বঙ্গবন্ধু আর কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল বা সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ নেই। তিনিই বাংলাদেশ, অন্যভাবে বললে– তাঁর নাম বাংলাদেশ।

**সম্পাদক**
**জাফর ওয়াজেদ**

**সহযোগী সম্পাদক**
ফায়জুল হক

**সহকারী সম্পাদক**
দুলাল কৃষ্ণ আচার্য

**সহ-সম্পাদক**
আকিল উজ জামান খান

**শিল্প নির্দেশনা**
মোমিন উদ্দীন খালেদ

**প্রকাশনা কর্মকর্তা**
সরদার মো. রেজাউল করিম

**প্রতিবেদক**
নুরুন্নাহার নুরু

**সংশোধক**
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

# সূচিপত্র

৩ **শেখ মুজিব আমার পিতা**
শেখ হাসিনা

৬ **বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে দক্ষিণ এশিয়া অন্যরকম হতো**
প্রণব মুখার্জি

৮ **কী আশ্চর্য সেই ভবিষ্যদ্বাণী**
তোয়াব খান

২০ **একষট্টিতেই বাঙালির স্বাধীনতার কথা বলেছেন বঙ্গবন্ধু -আমির হোসেন আমু**
বনশ্রী ডলি

৩০ **বঙ্গবন্ধু ইতিহাসের স্রষ্টা**
মুহম্মদ শফিকুর রহমান

৩৩ **মৃত্যু-বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান**
মহিউদ্দিন আহমদ

৪৪ **বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে পূর্ণতা পেল বাঙালি জাতীয়তাবাদ**
স্বদেশ রায়

৪৮ **বঙ্গবন্ধু বললেন, সোনার বাংলার সঠিক সৈনিক তৈরির দায়িত্ব তোমাদের ওপর রইল -সৈয়দ আহমাদ ফারুখ**
দুলাল আচার্য

৫৩ **সংবিধান প্রণয়নে বঙ্গবন্ধু**
বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক

৫৬ **আমার বঙ্গবন্ধু**
মেজর জেনারেল (অব.) সুবিদ আলী ভূঁইয়া

৬০ **মণিময় স্মৃতি: ছয় দশক পেরিয়ে**
পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়

৬৪ **বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের আশ্রয়দাতা দেশগুলোর উচিত দুঃখ প্রকাশ করা**
রেজা সেলিম

৬৭ **আমার দেখা বঙ্গবন্ধু**
মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পু

৭১ **বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের বন্ধু**
শাহাব উদ্দিন মাহমুদ

৮০ **চিরায়ত বাঙালি**
জাফর ওয়াজেদ



ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
পিআইবি'র সকল প্রকাশনা অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com
এবং বাতিঘর ঢাকা ও চট্টগ্রাম

মূল্য ২০ টাকা

**প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)**
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এসোসিয়েট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

# শেখ মুজিব আমার পিতা

## শেখ হাসিনা

বাইগার নদীর তীর ঘেঁষে ছবির মতো সাজানো সুন্দর একটি গ্রাম। সে গ্রামটির নাম টুঙ্গিপাড়া। বাইগার নদী এঁকেবেঁকে গিয়ে মিশেছে মধুমতী নদীতে। এই মধুমতী নদীর অসংখ্য শাখার একটি বাইগার নদী। নদীর দুই পাশে তাল-তমাল, হিজল গাছের সবুজ সমারোহ। ভাটিয়ালি গানের সুরে ভেসে আসে হালধরা মাঝির কণ্ঠ থেকে। পাখির গান আর নদীর কলকল ধ্বনি এক অপূর্ব মনোরম পরিবেশ গড়ে তোলা।

প্রায় ২০০ বছর আগে মধুমতী নদী এই গ্রাম ঘেঁষে বয়ে যেত। এই নদীর তীর ঘেঁষেই গড়ে উঠেছিল জনবসতি। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে ধীরে ধীরে নদীটি দূরে সরে যায়। চর জেগে গড়ে ওঠে আরও অনেক গ্রাম। সেই ২০০ বছর আগে ইসলাম ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব নিয়েই আমাদের পূর্বপুরুষরা এসে এই নদীবিধৌত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সুষমামণ্ডিত ছোট্ট গ্রামটিতে তাদের বসতি গড়ে তোলেন এবং তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে। অনাবাদি জমিজমা চাষবাস শুরু করেন এবং গ্রামের বসবাসকারী কৃষকদের নিয়ে একটা আত্মনির্ভরশীল গ্রাম হিসেবেই এই গ্রামটিকে বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রামরূপে গড়ে তোলেন। যাতায়াতব্যবস্থা বলতে প্রথমে শুধু নৌকাই

ছিল একমাত্র ভরসা। পরে গোপালগঞ্জ থানা স্টিমার ঘাট হিসেবে গড়ে ওঠে।

আমাদের পূর্বপুরুষরা টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জমিজমা ক্রয় করে বসতির জন্য কলকাতা থেকে কারিগর ও মিস্ত্রি এনে দালানবাড়ি তৈরি করেন, যা সমাপ্ত হয় ১৮৫৪ সালে। এখনো কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই দালানের ধ্বংসাবশেষ। ১৯৭১ সালে যে দুটো দালানে বসতি ছিল, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আগুন দিয়ে সে দুটোই জ্বালিয়ে দেয়। আমার আব্বার শৈশব কেটেছিল টুঙ্গিপাড়ার নদীর পানিতে ঝাঁপ দিয়ে, মেঠোপথের ধুলো-বালি মেখে, বর্ষার কাদাপানিতে ভিজে। বাবুই পাখি বাসা কেমন করে গড়ে তোলে, মাছরাঙা কীভাবে ডুব দিয়ে মাছ ধরে, কোথায় দোয়েল পাখির বাসা– এসব দেখে। দোয়েল পাখির সুমধুর সুর আমার আব্বাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করত। আর তাই গ্রামে ছোটো ছোটো ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে বেড়াতে তাঁর ভালো লাগত। ছোট্ট শালিক পাখির ছানা, ময়না পাখির ছানা ধরে তাদের কথা বলা ও শিস দেওয়া শেখাতেন। বানর ও কুকুর পুষতেন, তারা তাঁর কথামতো যা বলতেন তাই করত। আবার এগুলো দেখাশোনার ভার দিতেন ছোটো বোন হেলেনের ওপর। এই পোষাপাখি জীবজন্তুর প্রতি এতটুকু অবহেলা তিনি সইতে পারতেন না। মাঝেমধ্যে এজন্য ছোটো বোনকে বকাও খেতে হতো। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিমদিক ঘেঁষে একটা সরু খাল চলে গেছে, যে খাল মধুমতী ও বাইগার নদীর সংযোগ রক্ষা করে। এই খালের পাড়েই ছিল বড়ো কাচারি ঘর। আর এই কাচারি ঘরের পাশে মাস্টার, পণ্ডিত ও মৌলবি সাহেবদের থাকার ঘর ছিল। তাঁরা গৃহশিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তাঁদের কাছে আমার আব্বা বাংলা, আরবি, ইংরেজি ও অঙ্ক শিখতেন। আমাদের পূর্বপুরুষদেরই গড়ে তোলা গিমাডাঙ্গা টুঙ্গিপাড়া স্কুল। তখন ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়। বাড়ি থেকে প্রায় সোয়া কিলোমিটার দূরে। আমার আব্বা এই স্কুলেই প্রথম লেখাপড়া করেন। একবার বর্ষাকালে নৌকা করে স্কুল থেকে ফেরার সময় নৌকাডুবি হয়ে যায়। আমার আব্বা খালের পানিতে পড়ে যান। এরপর আমার দাদি তাঁকে আর ওই স্কুলে যেতে দেননি। একরত্তি ছেলে, চোখের মণি, গোটা বংশের আদরের দুলাল তাঁর এতটুকু কষ্ট যেন সবারই কষ্ট। সেই স্কুল থেকে নিয়ে গিয়ে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে ভর্তি করে দেন। গোপালগঞ্জ আমার দাদার কর্মস্থল ছিল। সেই থেকে গোপালগঞ্জেই তিনি পড়ালেখা করতে শুরু করেন। মাঝখানে একবার দাদা মাদারীপুর বদলি হন। তখন কিছুদিনের জন্য মাদারীপুরেও আব্বা পড়ালেখা করেন। পরে গোপালগঞ্জেই তাঁর কৈশোরবেলা কাটে।

আমার আব্বার শরীর ছিল বেশ রোগা। তাই আমার দাদি সব সময়ই ব্যস্ত থাকতেন কীভাবে তাঁর খোকার শরীর ভালো করা যায়। আদর করে দাদা-দাদিও খোকা বলেই ডাকতেন। আর ভাই-বোন গ্রামবাসীদের কাছে ছিলেন মিয়াভাই বলে পরিচিত। গ্রামের সহজসরল মানুষদের সঙ্গে অত্যন্ত সহজভাবে তিনি মিশতেন। আমার দাদি সব সময় ব্যস্ত থাকতেন খোকার শরীর সুস্থ করে তুলতে। তাই দুধ, ছানা, মাখন ঘরেই তৈরি হতো। বাগানের ফল, নদীর তাজা মাছ সব সময় খোকার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত থাকত। কিন্তু আমার আব্বা ছোট্টবেলা থেকে ছিপছিপে পাতলা ছিলেন। তাই দাদির আফসোসের সীমা ছিল না যে কেন তাঁর খোকা একটু হৃষ্টপুষ্ট-নাদুসনুদুস হয় না। খাবারবেলায় খুব সাধারণ ভাত, মাছের ঝোল, সবজিই তিনি পছন্দ করতেন। খাবার শেষে দুধ, ভাত, কলা ও গুড় খুব পছন্দ করতেন। আমার চার ফুপু ও এক চাচা ছিলেন। এই চার বোনের মধ্যে দুই বোন সবার বড়ো ছিলেন। ছোট্ট ভাইটির যাতে কোনো কষ্ট না হয়, এজন্য সদাসর্বদা ব্যস্ত থাকতেন বড়ো দুই বোন। বাকিরা ছোট্ট কিন্তু দাদা-দাদির কাছে খোকার আদর ছিল সীমাহীন। আমাদের বাড়িতে আশ্রিতের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। আমার দাদার বা দাদির বোনদের ছেলেমেয়ে বিশেষ করে যারা পিতৃ-মাতৃহারা, তাদেরকে দাদা-দাদি নিজেদের কাছে এনেই মানুষ করতেন। আর তাই প্রায় সতেরো-আঠারো জন ছেলেমেয়ে একই সঙ্গে বড়ো হয়ে ওঠে। আব্বার যখন দশ বছর বয়স, তখন তাঁর বিয়ে হয়। আমার মায়ের বয়স ছিল মাত্র তিন বছর। আমার মা পিতৃহারা হওয়ার পর তাঁর দাদা এই বিয়ে দিয়ে সমস্ত সম্পত্তি মা ও খালার নামে লিখে দেন। আমার খালা মায়ের থেকে তিন-চার বছরের বড়ো। আত্মীয়ের মধ্যেই দুই বোনকে বিয়ে দেন এবং আমার দাদাকে মুরুব্বি (গার্ডিয়ান) করে দেন।

কিন্তু আমার আব্বা ছোট্টবেলা থেকে ছিপছিপে পাতলা ছিলেন। তাই দাদির আফসোসের সীমা ছিল না যে কেন তাঁর খোকা একটু হৃষ্টপুষ্ট-নাদুসনুদুস হয় না। খাবারবেলায় খুব সাধারণ ভাত, মাছের ঝোল, সবজিই তিনি পছন্দ করতেন। খাবার শেষে দুধ, ভাত, কলা ও গুড় খুব পছন্দ করতেন

আমার আব্বার লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতি দারুণ ঝোঁক ছিল। বিশেষ করে ফুটবল খেলতে খুব পছন্দ করতেন। মধুমতী নদী পার হয়ে চিতলমারী ও মোল্লারহাট যেতেন খেলতে। গোপালগঞ্জে স্কুলের টিম ছিল। এদিকে আমার দাদাও খেলতে পছন্দ করতেন। আব্বা যখন খেলতেন, তখন দাদাও মাঝে মাঝে খেলা দেখতে যেতেন। দাদা আমাদের কাছে গল্প করতেন যে, তোমার আব্বা এত রোগা ছিল যে বলে জোরে লাথি মেরে মাঠে গড়িয়ে পড়ত। আব্বা যদি ধারেকাছে থাকতেন তবে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করতেন। আমরা তখন সত্যিই খুব মজা পেতাম। এর পেছনে মজার ঘটনা হলো, মাঝেমধ্যে আব্বার টিম ও দাদার টিমের মধ্যেও খেলা হতো। এখনো আমি যখন ওইসব এলাকায় যাই, অনেক বয়স্ক লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়, যারা আব্বার ছোটোবেলার কথা বলতেন। আমাদের বাড়িতেই এই খেলার

অনেক ফটো ও কাগজ ছিল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। ফলে সব শেষ হয়ে যায়।

আমার দাদা-দাদি অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ছিলেন। আব্বা যখন কাউকে কিছু দান করতেন, তখন কোনো দিনই তাকে বকাঝকা করতেন না বরং উৎসাহ দিতেন। আমার দাদা ও দাদির এই উদারতার আরও অনেক নজির রয়েছে। স্কুল পড়তে পড়তে আব্বার বেরিবেরি রোগ হয় এবং চোখ খারাপ হয়ে যায়। ফলে চার বছর লেখাপড়া বন্ধ থাকে। তিনি সুস্থ হওয়ার পর পুনরায় স্কুলে ভর্তি হন। এই সময় আব্বার একজন গৃহশিক্ষক ছিলেন, তাঁর নাম ছিল হামিদ মাস্টার। তিনি ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় এবং বহু বছর জেল খাটেন। পরবর্তী পর্যায়ে আব্বা বিভিন্ন সময় যখন জেলে থাকতেন অথবা পুলিশ গ্রেফতার করতে আসত, আমার দাদি মাঝে মাঝেই সেই মাস্টার সাহেবের নাম নিতেন আর কাঁদতেন। এমনিতে আমার দাদা-দাদি অত্যন্ত উদার মনের মানুষ ছিলেন। ছেলের কোনো কাজে কখনো তাঁরা বাধা দিতেন না বরং উৎসাহ দিতেন। অত্যন্ত মুক্ত পরিবেশে আমার বাবার মনের বিকাশ ঘটেছে। প্রতিটি কাজ, যখনই যেটা ন্যায়সংগত মনে হয়েছে, আমার দাদা তা করতে নিষেধ না করে বরং উৎসাহ দিয়েছেন। ১৯৪৬ সালে তিনি বিএ পাস করেন। পাকিস্তান-ভারত ভাগ হওয়ার সময়ে যখন দাঙ্গা হয়, তখন দাঙ্গা দমনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। কাজ করে যেতেন নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। আমার মেজো ফুপু তখন কলকাতায় থাকতেন। ফুপুর কাছে শুনেছি, মাঝে মাঝে অভুক্ত অবস্থায় হয়তো দুইদিন বা তিনদিন কাজ করে গেছেন। মাঝেমধ্যে যখন ফুপুর খোঁজখবর নিতে যেতেন, তখন ফুপু জোর করে কিছু খাইয়ে দিতেন। অন্যায়কে তিনি কোনো দিনই প্রশ্রয় দিতেন না। ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে তিনি কখনো পিছপা হননি। পাকিস্তান হওয়ার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। তখন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে সমর্থন দেন এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করতে গিয়ে গ্রেফতার হন। অল্প কয়েক দিন পর মুক্তি পান। এই সময় পাকিস্তানের সংবিধান রচনা করার কথা ঘোষণা দেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দিলে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি বাঙালি প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। ছাত্রসমাজ এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। এই আন্দোলনে ১৯৪৯ সালে আমার আব্বা গ্রেফতার হন। আমি তখন খুব ছোটো আর আমার ছোটো ভাই কামাল কেবল জন্মগ্রহণ করেছে। আব্বা ওকে দেখারও সুযোগ পাননি।

একটানা ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি বন্দি ছিলেন। সেই সময় আমাদের দুই ভাইবোনকে নিয়ে আমার মা দাদা-দাদির কাছেই থাকতেন। একবার একটা মামলা উপলক্ষ্যে আব্বাকে গোপালগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হয়। কামাল তখন অল্প অল্প কথা বলা শিখেছে। কিন্তু আব্বাকে ও কখনো দেখেনি, চেনেও না। আমি যখন বারবার আব্বার কাছে ছুটে যাচ্ছি, আব্বা-আব্বা বলে ডাকছি ও শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে। গোপালগঞ্জ থানায় একটি বড়ো পুকুর আছে, যার পাশে বড়ো খেলার মাঠ। ওই মাঠে আমরা দুই ভাইবোন খেলা করতাম এবং ফড়িং ধরার জন্য ছুটে বেড়াতাম। আর মাঝে মাঝেই আব্বার কাছে ছুটে আসতাম। অনেক ফুল-পাতা কুড়িয়ে এনে থানার বারান্দায় কামালকে নিয়ে খেলতে বসেছি। ও হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করল, হাসু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি। কামালের সেই কথা আজ যখন মনে পড়ে, আমি তখন চোখের পানি রাখতে পারি না। আজ ও নেই। আমাদের আব্বা বলে ডাকারও কেউ নেই। ঘাতকের বুলেট শুধু আব্বাকেই ছিনিয়ে নেয়নি, আমার মা, কামাল, জামাল, ছোট্ট রাসেলও রেহাই পায়নি। রেহাই পায়নি কামাল-জামালের নবপরিণীতা সুলতানা ও রোজী, যাদের হাতে মেহেদির রং বুকের রক্তে মিশে একাকার হয়ে গেছে। খুনিরা এখানেই শেষ করেনি, আমার একমাত্র চাচা শেখ আবু নাসের, তরুণ নেতা আমার ফুপাতো ভাই শেখ মনি, ছোট্টবেলার খেলার সাথী শেখ মনির অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজুকে খুন করেছে। এই খুনিরা একই সঙ্গে খুন করেছে আবদুর রব সেরনিয়াবাত (আমার ফুপা), তার তেরো বছরের কন্যা বেবি, দশ বছরের ছেলে আরিফকে, তার জ্যেষ্ঠ পুত্র আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর চার বছরের শিশুপুত্র বাবুও খুনিদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। কর্নেল জামিল, যিনি আমার পিতার জীবন রক্ষার জন্য ঘুম থেকে উঠে ছুটে এসেছিলেন, তাকেও তারা হত্যা করে। এ কেমন বর্বর নিষ্ঠুরতা? আজও গুলির আঘাতে পঙ্গু হয়ে আছেন আমার মেজো ফুপু।

অন্যায়কে তিনি কোনো দিনই প্রশ্রয় দিতেন না। ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে তিনি কখনো পিছপা হননি

সেদিন কামাল আব্বাকে ডাকার অনুমতি চেয়েছিল, আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে আব্বার কাছে নিয়ে যাই, আব্বাকে ওর কথা বলি। আব্বা ওকে কোলে তুলে নিয়ে অনেক আদর করেন। আজ আর তাঁরা কেউই বেঁচে নেই– আজ বারবার আমার মন আব্বাকে ডাকার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মায়ের স্নেহ, ভাইদের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকি; কিন্তু শত চিৎকার করলেও তো কাউকে আমি পাব না। কেউ তো আর সাড়া দিতে পারবে না। তাঁদের জীবন নৃশংসভাবে বুলেট দিয়ে চিরদিনের মতো যে ঘাতকরা স্তব্ধ করে দিল, তাদের কি বিচার হবে না?

**লেখক: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**

# বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে দক্ষিণ এশিয়া অন্যরকম হতো

**প্রণব মুখার্জি**

প্রথম থেকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি যখন লন্ডন থেকে দিল্লি আসেন, তখন প্রথম সম্মুখসাক্ষাৎ। দীর্ঘদেহী ও বজ্রকণ্ঠের মানুষটিকে দেখে শ্রদ্ধায় মন ভরে গিয়েছিল।

বর্তমান বাসভবন ১০ নম্বর রাজাজি মার্গে উঠেছি কিছুদিন হলো। সাবেক রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামও অবসর নেওয়ার পর এ বাংলোয় থাকতেন। রাজধানী দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবন, নর্থ ও সাউথ ব্লকের নির্মাতা ব্রিটিশ স্থপতি এডওয়ার্ড টিয়েন এ বাংলোতেই বাস করতেন। দোতলা বাংলোর একতলায় বসার ঘর। সেখানকার বড়ো কাঠের টেবিলটা দেখলে আরেকটা টেবিলের কথা মনে পড়ে। আমি যখন প্রথম অর্থমন্ত্রী হই, তখন আমার টেবিলটা ছিল অতিকায়। সে টেবিলের একটা ইতিহাস আছে। ভারতের প্রথম অর্থমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান এ টেবিলে বসতেন। পরে তিনি পাকিস্তান চলে যান। শুনেছি, ভারত ভাগ হওয়ার সময় তার পূর্বাভাস ছিল– পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানকে বোধহয় বেশিদিন একত্রে রাখা

যাবে না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সে পূর্বাভাস সত্যে রূপান্তর করেছিলেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও বাঙালিত্ব কখনো ভুলতে পারি না। রাইসিনা হিলসের রাষ্ট্রপতি ভবনে এই প্রথম একটি বাংলা বইয়ের গ্রন্থাগার তাই গড়ে উঠেছে আমার আমলে। সেখানে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত বহু পুস্তক রয়েছে।

রয়েছে বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'। আমার কাছে মনে হয়, বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানতে হলে এ গ্রন্থটি একমাত্র প্রামাণ্যদলিল। আজও আমি বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন থেকে অনুপ্রাণিত হই, বাঙালি হিসেবে তাঁকে নিয়ে গর্ববোধ করি। আসলে নিজের জাতিসত্তা সম্পর্কে গর্ববোধ না থাকলে কোনো জাতি বড়ো হতে পারে না। সেটিই বঙ্গবন্ধুর জীবন থেকে আমার প্রথম শিক্ষা। অবশ্য বঙ্গবন্ধুকে আমি যতটুকু জানি, তার চেয়ে অনেক বেশি জানতেন রাজনীতিতে আমার আদর্শ ইন্দিরা গান্ধী। মনে আছে, ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুকে একবার সতর্ক করেছিলেন জীবনসংশয় নিয়ে; কিন্তু বঙ্গবন্ধুর জবাব ছিল– 'ওরা আমারই সন্তান। আমাকে কেন হত্যা করবে?' অথচ সেই সেনাবাহিনীর একাংশের হাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। এরই মধ্যে তাঁর হত্যাকাণ্ডের বিচারও হয়েছে; কিন্তু আমার মনে এখনো সন্দেহ রয়েছে, হত্যার ষড়যন্ত্র কতটা উদ্‌ঘাটন করা গেছে। সাধারণভাবে হত্যাকারী কারা, এখন আমরা সবাই জানি। কিন্তু তাঁর হত্যাকাণ্ডের পেছনের ষড়যন্ত্র নিয়ে প্রকৃত তদন্ত আজও সমাপ্ত হয়নি। প্রকৃত রহস্য এখনো উদ্‌ঘাটিত হয়নি।

আমরা দেখেছি, বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বাংলাদেশ সৃষ্টি করেন। কিন্তু ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তিনি পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কেননা তিনি অত্যন্ত উদারনীতির প্রবর্তক ছিলেন। ১৯৭৪ সালে তিনি লাহোর যান। পাকিস্তান শাসকদের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। এর অবশ্য মূল কারণ ছিল– যেসব বাঙালি তখনও পাকিস্তান রয়ে গিয়েছিলেন, তাদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যই ছিল প্রধান। আমি মনে করি, বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি ছিল জোটনিরপেক্ষ। পাকিস্তানবিরোধী বলেই ইসরাইল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় প্রথম কয়েকটি দেশের মধ্যে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরাইলি যুদ্ধের সময় মিসরের পক্ষ নিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর কথা মনে হলে আমার প্রথমেই মনে পড়ে তাঁর ভাষণের কথা। আমি বলতে পারি, এক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমান দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ জননেতা। তাঁর বাগ্মিতার তুলনা মেলা ভার। পরে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক নেতা হয়ে উঠছিলেন। দক্ষিণ এশিয়ার দুর্ভাগ্য যে, এ ধরনের জনপ্রিয় রাষ্ট্রনেতাদের অকালেই প্রাণ হারাতে হয়। বঙ্গবন্ধু, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, বন্দরনায়েকে– এঁরা জীবিত থাকলে আজ হয়তো দক্ষিণ এশিয়ার চেহারা অন্যরকম হতো। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এ ধরনের রাষ্ট্রনেতাদের আজ বড়োই অভাব। যেদিন তাঁকে হত্যা করা হয়, সেদিন আমি দিল্লিতে ছিলাম না; কলকাতায় ছিলাম। আকাশবাণীর সংবাদে খবরটা জানার পর আমি বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারিনি। স্বজন হারানোর মতো শোকাকুল হয়েছিলাম। পরে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ফোন পেয়ে দিল্লি ছুটে যাই। মনে হয়েছিল, যে অশুভ শক্তি মুজিবকে হত্যা করেছে, তারা হয়তো সেখানেই থেমে থাকবে না।

নব্যসৃষ্ট বাংলাদেশকে ফের অন্ধকার রাজত্বে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। তাই ভারত সরকার সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। আমাদের সৌভাগ্য, মুজিবের সুযোগ্য কন্যা হাসিনা-রেহানা সেদিন ঢাকায় ছিলেন না। তাই আজ বাংলাদেশ ফের মুজিব আদর্শে পরিচালিত হচ্ছে। আমি বলি 'মুজিবিজম'। সেটিই তাঁর দর্শন; বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সহযোগিতা পাওয়ার জন্য মুজিবকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করতে হয়। এ ব্যাপারে অনেকেই তাঁকে উপযুক্তভাবে সহযোগিতা করেনি। বঙ্গবন্ধুর বিশ্বাস ছিল, বাংলাদেশের কেউ তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। সে ধারণা তাঁর ভ্রান্ত ছিল। সেটা জীবন দিয়ে উপলব্ধি করতে হলো; কিন্তু বিশ্ব হারাল যোগ্যতম নেতা।

আজও আমি বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন থেকে অনুপ্রাণিত হই, বাঙালি হিসেবে তাঁকে নিয়ে গর্ববোধ করি। আসলে নিজের জাতিসত্তা সম্পর্কে গর্ববোধ না থাকলে কোনো জাতি বড়ো হতে পারে না। সেটিই বঙ্গবন্ধুর জীবন থেকে আমার প্রথম শিক্ষা

বলে রাখি, প্রথম থেকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি যখন লন্ডন থেকে দিল্লি আসেন, তখন প্রথম সম্মুখসাক্ষাৎ। দীর্ঘদেহী ও বজ্রকণ্ঠের মানুষটিকে দেখে শ্রদ্ধায় মন ভরে গিয়েছিল। অনেক কথা হয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন আমাকে দেখিয়ে, এ মানুষটি (প্রণব) আপনাদের জন্য বিশ্বে সমর্থন আদায় করতে ছুটে গিয়েছিলেন। সেসময় বঙ্গবন্ধুর মুখে ব্যক্তিগত স্তুতি শুনে কিছুটা লজ্জিত হয়েছিলাম।

সত্তরের দশকে আমরা দেখেছি বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধুর নাম। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ গোটা বিশ্বে নিপীড়িত, শোষিত মানুষের কাছেই আদর্শ। আমার মননে সব সময়ই এ দেশটি আলোড়িত করে। ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, প্রথম বিদেশ সফর হবে বাংলাদেশ। তবে আবার একবার বাংলাদেশ যাওয়ার ইচ্ছা রয়ে গেছে। এবার যাব সাধারণ নাগরিক হিসেবে। একজন বাঙালি হিসেবে।

**লেখক: সাবেক রাষ্ট্রপতি, ভারত**

# কী আশ্চর্য সেই ভবিষ্যদ্বাণী

**তোয়াব খান**

দক্ষিণ এশিয়ার চিন্তাচেতনা এবং মননে সব থেকে প্রগতিশীল রাষ্ট্রের স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে নানা অনুষ্ঠান আর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের কর্মসূচিকে সামনে রেখেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে মহানায়কের বিপুল কর্মযজ্ঞের মাত্র কয়েকটি দিক নিয়েই আমার এই নিবেদন।

বঙ্গবন্ধুকে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে অনেক আগে থেকেই দেখেছি। তবে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ স্বাধীন বাংলা বেতারের কর্মীদের বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে। ওইদিনই তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। বঙ্গবন্ধু জানতে চান, কে কী করছে। অনেকেই ছিলেন সেখানে। যারা শিল্পী, গান গাইতেন– তারাও ছিলেন।

সময়টা বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর। গণভবনে, এখন যেটা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট। রমনা পার্কের অপরদিকে। ওইখানে পুবদিকের বারান্দায় সবাই বসে ছিলেন। এটাই প্রথম সাক্ষাৎ। আমি তখন দৈনিক বাংলার সম্পাদক হিসেবে কাজ করছি। মুক্তিযুদ্ধ থেকে এসে দৈনিক বাংলাতেই ফিরে গেছি। আমাদের লক্ষ্যই ছিল– যে যেখানে ছিলাম, সেখানেই যাব। আমি

নিজের বা আমার সহকর্মীদের কথা বলছি, যারা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন আমাদের সঙ্গে। যেমন– আমার ছোটো দুই ভাই, যারা মুক্তিযুদ্ধের একদম সক্রিয় যোদ্ধা। তাদের কাউকে বলতে শুনিনি, ফিরে গিয়ে আমি অমুক পদে যাব বা আমার একটা অত বড়ো পদ চাই। অমুক পদ চাই। যে ছাত্র সে বলেছে, আমি ছাত্র, আমি ছাত্রই থাকতে চাই। খুব স্বাভাবিকভাকে আমার লক্ষ্য ছিল, যেখানে আমার কাজ ছিল, আমি সেখানেই যাব। সাংবাদিকতা করব। অর্থাৎ দৈনিক বাংলায় কাজ করতে চাই। এই সাক্ষাৎকারের সময় বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলা বেতারের কে কোথায় আছেন, কী করছেন– এসব জানতে চান। আমি কিছু বলার আগেই বঙ্গবন্ধু বললেন, ওকে তো আমি জানি। ও তো দৈনিক বাংলায় আছে, সম্পাদক। এখান থেকেই জানা ও বোঝার পালা শুরু। বঙ্গবন্ধু বললেন, মাঝেসাঝে এসো। কথা বলব।

একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ দেখা-সাক্ষাৎ না হলেও সংবাদপত্রে কাজের সূত্রে নানাভাবে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সাংবাদিক হিসেবে জড়িয়ে যেতে হয়। এভাবে একটা পরোক্ষ যোগসূত্র সব সময়ই ছিল। দৈনিক সংবাদে কাজ করার সময় এ ধরনের কিছু ঘটনার সূত্রপাত। দৈনিক সংবাদে যখন বার্তা সম্পাদক হিসেবে কাজ করি, সেই সময়ের কিছু ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৬৪ সালে পাকিস্তানের শাসকচক্র বিশেষ করে মোনেম খান, সবুর খান পরিকল্পিতভাবে এদেশে দাঙ্গা লাগিয়ে দেয়। তবে এটাকে দাঙ্গা না বলে পরিকল্পিতভাবে হিন্দুদের বাড়িঘর, দোকানপাট লুটপাট এবং নির্বিচারে মানুষ খুন বলা-ই উচিত। কারণ দাঙ্গা হয় দুই পক্ষের মধ্যে। এদেশে হিন্দুদের দাঙ্গায় সক্রিয় হওয়ার মতো কোনো শক্তিই ছিল না। তারা শুধু মারই খেয়েছে। তাদের বাড়িঘর পুড়েছে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান লুট হয়েছে। দাঙ্গা তথা লুটপাটের উপলক্ষ্য ছিল কাশ্মীরের হজরতবালের একটি ঘটনা। ওই সময়ে এদেশে অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব-মোনেম চক্রের প্রতিক্রিয়াশীল স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করছিল। মোনেম-সবুর খানচক্র হজরতবাল ইস্যু নিয়ে এদেশে দাঙ্গাহাঙ্গামা লাগিয়ে ঘটনাধারা অন্য খাতে নিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারিতে প্রথমে খুলনায় কিছু গোলযোগের সূত্রপাত ঘটায়। তবে বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে ঢাকায় বিহারি আর ভাড়াটে গুন্ডাদের দিয়ে ঢাকার নওয়াবপুরে হিন্দুদের দোকানপাটে হামলা চালায়। এরপরই শুরু হয়ে যায় মোনেম খানের প্রশাসনের কেরামতি। তারা সঙ্গে সঙ্গে কারফিউ জারি করে। লোকজন দোকানপাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে নিরাপদে আশ্রয় নেওয়া শুরু করছে। কিন্তু নিরাপত্তায় যারা গ্যারান্টি দেবে, সেই সেনাবাহিনী বা পুলিশ কারও কোনো টিকিটি দেখা যাচ্ছে না। কোনো পাত্তাই নেই। নওয়াবপুর রোডজুড়ে একের পর এক বোমা ফাটছে। হিন্দুদের যত দোকানপাট ছিল, লুট হয়ে গেল। বিশেষ করে মিষ্টির দোকানগুলো নিমিষেই সাফ। রাস্তায় পড়ল কিছু লাশ। জ্বলল বাড়িঘর। পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের কাজ যখন শেষ, তখন রাস্তায় নামল পাকিস্তান সেনাবাহিনী। সাইরেন বাজিয়ে রীতিমতো মহড়া দিয়ে। প্রাণভয়ে যারা আগুনে পোড়া ঘরবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়েছিল নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে, তাদেরও পাকড়াও করে নিয়ে গেল।

আলোচ্য সময়ে দৈনিক সংবাদের অফিস ছিল বংশাল রোডে। আমরা অফিসে এ সময়ে খুবই উদ্বেগের মধ্যে ছিলাম। প্রথমত, 'সংবাদ' সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী একটি গণতান্ত্রিক পত্রিকা। তাই দাঙ্গার মূল পরিকল্পনাকারী মোনেম-সবুর খান চক্রের গুন্ডাপান্ডাদের প্রধান টার্গেট ছিল সংবাদ। এ ছাড়াও আমাদের সহকর্মী সন্তোষ গুপ্ত সেদিন অফিসে আসেননি। স্বাভাবিকভাবেই আমরা তার নিরাপত্তা নিয়ে ছিলাম উদ্বিগ্ন। রাতে বাড়ি ফেরার জন্য কারফিউ পাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সংবাদ কর্তৃপক্ষ একটি জিপ গাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন রাতের শিফটের সবার বাড়ি যাওয়ার জন্য। সংবাদ অফিসের প্রধান ফটকটি ছিল সড়ক সংলগ্ন। তাই জিপে উঠতে গেলে রাস্তায় পাঁচ-ছয়জন একত্রে জমায়েত হতে হবেই। পাকিস্তানি বাহিনীর বীর পুঙ্গবরা এসে আমাদের ওপর চড়াও হলো– কেন আমরা কারফিউ ভঙ্গ করে রাস্তায় জমায়েত হয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো লাঠি দিয়ে পেটানো। আমি তাদের বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম, আমাদের কারফিউ পাস আছে, আমরা গাড়িতে করে বাসায় চলে যাচ্ছি। কিন্তু কে শোনে কার কথা। তাদের টার্গেট আমরা। লাঠির একটি জোরালো চোট পড়ল আমার কণ্ঠার হাড়ের ওপর। যা হোক, শেষ পর্যন্ত জিপ নিয়ে আমরা বাসার উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম। সিদ্ধান্ত ছিল পথে মদনমোহন বসাক রোডের ওদিকে সন্তোষ গুপ্তের বাড়িতে খোঁজখবর নিয়ে যেতে হবে। সন্তোষ বাবুর মা বাড়িতে ছিলেন। খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেল বাড়িতে কেউ নেই। দরজা বন্ধ। এলাকায় বেশ কয়েকটি বাড়িতে লুটপাট ও তছনছ হওয়ার আলামত।

মোনেম-সবুর তথা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এই পরিকল্পিত দাঙ্গা তথা হত্যা-লুটপাটের বিরুদ্ধে প্রতিরোধও গড়ে উঠল। দাঙ্গা

> মোনেমচক্র বঙ্গবন্ধু ও দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির নেতাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও হত্যাচেষ্টার মামলা ঠুকে দেয়। এই মামলায় সাক্ষী করা হয় সংবাদপত্রের বার্তা সম্পাদক ও রিপোর্টারদের। আমাকেও সাক্ষী করা হলো। আমি বললাম, আমি সাক্ষী দিতে যাব না

প্রতিরোধের সংগ্রামে এগিয়ে আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। গড়ে উঠল প্রতিরোধ কমিটি। হিন্দুদের বাড়িঘরের ওপর হামলা প্রতিরোধ করতে গিয়ে বিহারিদের হাতে জীবন দিলেন আবুল হোসেন।

দাঙ্গা প্রতিরোধের অন্যতম কর্মপন্থা তথা কর্মসূচি হিসেবে ঢাকার চারটি প্রধান দৈনিক সংবাদপত্রে একযোগে একই শিরোনামে (হেডলাইনে) একটি আবেদনমূলক প্রতিবেদন প্রকাশের সিদ্ধান্তে বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য নেতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সংবাদপত্রের সম্পাদকরা মতৈক্যে পৌঁছান। শুনেছি এই প্রতিবেদনের প্রাথমিক খসড়া তৈরি করেছিলেন শহিদ সিরাজুদ্দীন হোসেন ও আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী। ঢাকার চারটি দৈনিক সংবাদপত্র ইত্তেফাক, সংবাদ, আজাদ ও অবজারভারে একযোগে প্রথম পৃষ্ঠায় ব্যানারে হেডলাইনে 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' ছাপা হয়। পাকিস্তানজুড়ে একটা তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হলো। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকরা সংবাদপত্র এবং দাঙ্গা প্রতিরোধের নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা দিতে আরম্ভ করে। এই সময় বঙ্গবন্ধুর উক্তি বলে কথিত একটি বাক্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু নাকি বলেছিলেন, গভর্নর হাউসে ষড়যন্ত্রের ঘুঘুর বাসা না ভাঙলে দাঙ্গা বন্ধ হবে না। এরপর আরেক ঘটনা। কে বা কারা গভর্নর মোনেম খানের গাড়িবহরের দিকে লিফলেটের একটি গোল্লা ছুড়ে মারে।

আর যায় কোথায়! মোনেমচক্র বঙ্গবন্ধু ও দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির নেতাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও হত্যাচেষ্টার মামলা ঠুকে দেয়। এই মামলায় সাক্ষী করা হয় সংবাদপত্রের বার্তা সম্পাদক ও রিপোর্টারদের। আমাকেও সাক্ষী করা হলো। আমি বললাম, আমি সাক্ষী দিতে যাব না। বলা হলো, তাহলে সমন জারি করে প্রয়োজনে গ্রেফতার করে আদালতে হাজির করা হবে। আমি অবশ্য জানিয়ে দিয়েছিলাম, আমিও আমার মতো করে মোনেম চক্রের জারিজুরির কথা বলব। এরপর আর কেউ ঘাঁটাঘাঁটি করেনি। মামলাটিও সম্ভবত বুড়িগঙ্গায় তলিয়ে যায়। এ সময়ে একদিন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা হয়েছিল। আমি অবশ্য তখন সংবাদের চাকরি ছেড়ে দিয়ে দৈনিক পাকিস্তানে যোগ দিয়েছি।

তারপর আরেকটি অকেশনে তাঁর সঙ্গে দেখা হলো। সেটা হলো পহেলা মার্চের পর। যখন অসহযোগ আন্দোলনে পুরো দেশ অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ চলছে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে, দৈনিক পাকিস্তান ওই সময়ই বস্তুত দৈনিক বাংলা হয়ে যায়। তখন সব খবরই বিশেষ আঙ্গিকে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে ছাপা হয়েছিল। বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ ছাড়াও বাস্তব কিছু বাধ্যবাধকতা ছিল। তখন ঢাকার বাইরে পত্রিকা পাঠানো যেত না। কারণ বাস বন্ধ, ট্রেন বন্ধ, বিমানও বন্ধ। ঢাকার বইরে দেশজুড়ে চলছে অসহযোগ আন্দোলন। পত্রিকা পাঠানোর কোনো স্কোপ ছিল না। তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম ঢাকা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার মধ্যেই পত্রিকার সার্কুলেশনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। পত্রিকার আয়ের প্রধান উৎস তখন সার্কুলেশন। বিজ্ঞাপন বিশেষ কিছুই থাকে না। তাই পত্রিকা বিক্রি অর্থাৎ সার্কুলেশন হয়ে দাঁড়িয়েছে আয়ের প্রধান অবলম্বন। পত্রিকার মেকআপ-গেটআপ একেবারে ঢেলে সাজিয়ে কার্যত মুক্তি আন্দোলনের মুখপত্র হয়ে দাঁড়াল আমাদের পত্রিকা। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ, অসহযোগ আন্দোলনে দিনের কর্মসূচি, অফিস-আদালতের কর্মীদের প্রতি নির্দেশ– এসবই প্রতিদিন পত্রিকায় থাকত সচিত্র আকারে। যেমন– বঙ্গবন্ধুর নির্দেশের সঙ্গে থাকত তাঁর উত্থিত তর্জনী ইত্যাদি। সময়ের প্রেক্ষাপটে পত্রিকার সার্কুলেশন ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় লাখের সীমা ছাড়িয়ে গেল। অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলোয় নানা কারণে বঙ্গবন্ধু ও অন্য নেতাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ থাকত।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় আমরা রাওয়ালপিন্ডি থেকে আমাদের সংবাদকর্মীদের কাছ থেকে স্পেশাল নোট পেতাম। রাওয়ালপিন্ডিতে কী হচ্ছে? আমাদের বন্ধুরা বলেছিলেন, আপনি যে খবরগুলো পাবেন, সেটা উপরের দিকে জানিয়ে দেবেন। অর্থাৎ আন্দোলনের নেতৃত্বে যারা আছেন, তাদেরকে জানানো। আমি সেটা জানিয়ে দিতাম।

প্রধানমন্ত্রীর ওখানে অর্থাৎ গণভবনে আমি যোগ দিয়েছি ১৯৭৩ সালে। ১৯৭৩-এর মে মাসে। এর আগে কিছু ঘটনা আছে। ১৯৭৩ সালের পহেলা জানুয়ারিতে বিক্ষোভ হয়। বিক্ষোভটা ছিল মার্কিনবিরোধী। ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিয়ে। মার্কিন তথ্যকেন্দ্র ছিল প্রেস ক্লাবের উল্টো দিকে। ওইখানে বিক্ষোভ করে ছাত্ররা। গুলি চলে। সেখানে একজন ছাত্র মারা যায়। এটা পত্রিকায় ছাপা হয়। পরের দিন হরতাল হয়। এটা নিয়ে দৈনিক বাংলা তখন একটা টেলিগ্রাম বের করে। বঙ্গবন্ধু এ সময়ে নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত। তিনি ছিলেন ঢাকার বাইরে। সরকার এটা ভালো চোখে দেখেনি। আমিও এই টেলিগ্রামের পক্ষে ছিলাম না। টেলিগ্রাম বের করার একটাই কারণ, জনরোষের ভয়। যদি পত্রিকাটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়। দৈনিক পাকিস্তান একবার পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাহলে এই পত্রিকায় যে লোকগুলো কাজ করে, তাদের ভবিষ্যৎ কী হবে। আমি বলেছিলাম, ছাপানোর পর টেলিগ্রামটা আটকে রেখে দেন। যদি কেউ বলে টেলিগ্রাম ছেপেছেন কি না, তখন দেখিয়ে দেবেন। আমার কথা শোনা হয়নি।

রাতে ডাকা হলো আমাকে। তখন কেবিনেট মিটিং হচ্ছিল। সেখানেই ডাকা হলো আমাকে। তারপর দৈনিক বাংলা থেকে চাকরি গেল আমার। হাসান হাফিজুর রহমান, তারও চাকরি গেল। আমাকে ওইসময় করা হলো ইনফরমেশন মিনিস্ট্রিতে ওএসডি। আমার চাকরি চলে যেতে পারে, সেটা তো সরকারের হাতে। কিন্তু আমাকে ওএসডি করা হলো। সেখানে আমি জয়েন করব কি না, সেটা আমার বিষয়। সেটায় সরকার কিছু করতে পারে বলে আমি মনে করি না। আমি পদত্যাগ করলাম। দুই সপ্তাহ পরে আমি লিখিতভাবে পদত্যাগপত্র দিলাম। তখন তথ্যমন্ত্রী ছিলেন মিজানুর রহমান চৌধুরী। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, 'দেখুন আমি তো আপনার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে পারব না। কারণ আমি পদচ্যুত করিনি, আপনাকে পদত্যাগও করতে বলিনি। আপনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন।' আমি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'দেখো, এখন নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত আছি। আমি যদি নির্বাচনে বেশ ভালোভাবে জিতে আসি, তাহলে আমি প্রধানমন্ত্রী থাকব। আর আমি যদি মারজিন্যাল মেজরিটি পাই, তাহলে আমি জাতির পিতা হিসেবে থাকব। তখন তুমি তোমার মতো করে কাজ করো। আমি প্রধানমন্ত্রী হলে তোমাকে আমার কাছে আসতে হবে। আমার কিছু কাজ আছে, সেগুলো তোমাকে করে দিতে হবে। আমি কী করব? এই এপিসোডটা খুব একটা সুখকর কিছু নয়। তারপর নির্বাচন হয়ে গেল। বঙ্গবন্ধু ২৯৩ আসনে জিতলেন। তখন নানান লোক আমাকে নানা প্রস্তাব দিচ্ছে। এমনকি বিদেশি দূতাবাসে কাজ করার জন্যও প্রস্তাব দিচ্ছে। আমি ভাবলাম একটা শীর্ষস্থানীয় পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে কাজ করে দূতাবাসে কাজ করার প্রস্তাব? এ ধরনের প্রস্তাব গ্রহণ করলে একটা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে জাতির সম্মান লুটিয়ে দেওয়া হবে। আমি যাইনি। একদিন দুপুরে আমার মেয়েদেরকে স্কুল থেকে নিয়ে বাসায় ফিরেছি। তখন আমার স্ত্রী বললেন, গণভবন থেকে দুইবার টেলিফোন করেছিল। তোমাকে এক্ষুনি যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। আমি যোগাযোগ করলাম। আমাকে যেতে বলা হলো। তখন দুপুর ২টা কিংবা আড়াইটা বাজে। আমি গণভবনে গেলাম। আমি থাকতাম খিলগাঁও চৌধুরীপাড়ায়। দেখলাম তোফায়েল সাহেব আছেন, রাজ্জাক সাহেবও আছেন।

রফিকউল্লাহ চৌধুরী তখন সচিব, তিনিও ছিলেন। তারা আমাকে ধরে বললেন, কোথায় ছিলেন আপনি? আপনাকে সারা দিন খুঁজে বেড়াচ্ছি। চলুন উপরে। আমি বললাম কোথায়? ধরে নিয়ে গেলেন। বঙ্গবন্ধু তখন সবেমাত্র লাঞ্চ শেষ করেছেন।

তিনি বললেন, 'কোথায় ছিলে তুমি? ইলেকশন হয়ে গেছে। এখন তো তোমাকে যোগ দিতে হবে। আমার কাজ করতে হবে। এই কাজগুলো তোমাকে করতে হবে। কাজগুলো কী, সেটা আমি পরে জেনেছি। বললেন, এক্ষুনি রফিকউল্লাহর কাছে গিয়ে যে কাগজপত্রগুলো সাইন করা দরকার, ওটা সাইন করো তারপরে আসো। আমি কাজে যোগ দিলাম মে মাসে। তারপর থেকে আমাকে বঙ্গবন্ধু বললেন তিনি একটা আত্মজীবনী লিখবেন। দুনিয়ার সব বড়ো রাজনৈতিক নেতা আত্মজীবনী লেখেন, ডিকটেশন দিয়ে এটি তৈরি করা হয়। পরে এগুলো যথাযথভাবে এডিটিং এবং পরিচ্ছন্ন করা হয়। দুনিয়ার সর্বত্রই এই রীতি।

বঙ্গবন্ধু প্রথমত ডেকেছিলেন এজন্যই। আমি তো সেখানে যোগ দিলাম। সেক্রেটারি রফিকউল্লাহ চৌধুরী ছাড়াও প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন নুরুল ইসলাম অণু। পরবর্তী সময়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। আরও একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন– মাহে আলম। তিনি পরবর্তীকালে সচিব হয়েছিলেন। আর পিআরও (জনসংযোগ অফিসার) ছিলেন আবুল হাসেম। একসময় বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বিএসএস) এমডি ছিলেন। এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করা প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধুর অফিসে প্রেস উইং প্রধানের নাম ছিল জনসংযোগ অফিসার (পিআরও)। পদটি যুগ্মসচিবের পদমর্যাদার এবং প্রেস সেক্রেটারি পদটি ডেপুটি সেক্রেটারির পদমর্যাদার। প্রেস সেক্রেটারির পদে ছিলেন মাহবুবুল আলম। পরে মাহবুবুল আলম বিদেশে কাজ করেছেন। ইনডিপেনডেন্ট পত্রিকায় এডিটরও ছিলেন। আর অ্যাসিসট্যান্ট প্রেস সেক্রেটারি ছিলেন আমিনুল হক বাদশা। হাসেম সাহেব সন্ধ্যার পর খুব একটা অফিসে থাকতেন না। বঙ্গবন্ধু আমাকে বলতেন– তুই যদি আগে আসতি, তাহলে আমার অনেক কাজ বেঁচে যেত। ঝামেলা থেকে বেঁচে যেতাম। তোকে এখানে নিয়ে আসার আগে যে ঘটনাগুলো ঘটল, সেটাও ঘটত না।

বঙ্গবন্ধু আমাকে বলতেন– তুই যদি আগে আসতি, তাহলে আমার অনেক কাজ বেঁচে যেত। ঝামেলা থেকে বেঁচে যেতাম। তোকে এখানে নিয়ে আসার আগে যে ঘটনাগুলো ঘটল, সেটাও ঘটত না

একপর্যায়ে আমার ঘাড়ে এসে পড়ল প্রেস উইংসের দায়িত্ব। হাসেম সাহেব বিদেশে চাকরি নিয়ে চলে যাওয়ার সুযোগ খুঁজছিলেন। একদিন বঙ্গবন্ধু সিঁড়ি বেয়ে নামছিলেন। তখন উনি তাঁকে বললেন, 'স্যার, আমার পদের কী হলো।' বঙ্গবন্ধু বললেন, 'রিপ্লেসমেন্ট দাও।' হাসেম সাহেব জানালেন, 'তোয়াব খান এসে গেছে।'

তার দুই-তিনদিন পর হাসেম সাহেব চলে গেলেন। একদিন দুপুরে বসছি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আত্মজীবনী নিয়ে। তখন আমার মনে হলো, আত্মজীবনীর কাজের প্রতি সুবিচার করা হচ্ছে না। একদিকে প্রেসের দায়িত্ব এবং এটা প্রায় সার্বক্ষণিক কাজ। আবার দুপুরবেলা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আত্মজীবনী নিয়ে বসা। এটা নিয়ে কোনোভাবেই জাস্টিফাই করা যাচ্ছে না। আমি তখন বললাম, 'আমি তো আছিই, বিশ্বস্ত কোনো সাংবাদিক এনে কাজটা করা যেতে পারে।' আমি আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর নাম প্রস্তাব করলাম। তখন তিনি বললেন, 'তুমি নিয়ে আসো তাহলে।' গাফ্ফার চৌধুরীকে সেদিন নিয়ে এলাম। আমরা কাজ করতাম বঙ্গবন্ধু যখন দুপুরের কাজ শেষ করে লাঞ্চের পর বিশ্রামে যান, তখন কাজ করা হতো। বঙ্গবন্ধুর রেস্ট তো হতো না। কোনো না কোনো লোক আসত। তখন এটা বন্ধ করে দিয়ে সেই কাজটা শেষ করা হতো। বঙ্গবন্ধু বলে যেতেন। টেপ করতাম আমরা। সঙ্গে সঙ্গে লংহ্যান্ডে নোটও করা হতো। টেপে বাণীবদ্ধ বঙ্গবন্ধুর ডিকটেশনগুলো ট্রান্সক্রাইব করে টাইপ করা শুরু হতো। এটা বেশ কিছু পরে। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর। একসময় এটির দায়িত্ব দেওয়া হয় মাহ-বুব তালুকদারকে। তিনি বর্তমানে নির্বাচন কমিশনার। তখন ছিলেন ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি। কাজটা অনেক দূর এগিয়েছিল। প্রশ্ন উঠতে পারে বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীর এগুলো কোথায় গেল। পরবর্তীকালে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কোনো হদিস মেলেনি। এগুলো ছিল গণভবনে। কিন্তু আমি বা আমরা তো গণভবনে ঢুকতে পারিনি।

১৫ আগস্টের পরে তো আমাদের ঢুকতে দিত না সেখানে। আমরা নিষিদ্ধ ছিলাম। পরে গণভবনের কন্ট্রোলার আবুল খায়েরকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম টেপ ও কাগজপত্রগুলোর খবর কী? তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনিও খুব উদ্‌গ্রীব ছিলেন টেপটা খুঁজে বের করার জন্য। কিন্তু তিনিও খুঁজে পাননি। এটা আমার রুমেই ছিল। একসময় মাহবুব তালুকদারকে দিয়েছিলাম। তখন তিনি আমার ডেপুটি। মাহবুব তালুকদারের কাছে ছিল। তিনিও সেটা পাননি। সম্ভবত ঘাতকরাই সেটা সরিয়েছে। লিখিত ছিল না। ট্রান্সক্রাইব করে টাইপ করা ছিল।

বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কাজ করাটা যে গৌরবের বিষয়, এটা উল্লেখের কোনো প্রয়োজন হয় না। তবুও বলতে হচ্ছে। কারণ একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে আমাকে গণভবনে যোগ দিতে হয়েছিল। এ কথাটি মনে রেখেই বলতে হয়, বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমান শুধু সরকারের প্রধান কার্যনির্বাহী প্রধানমন্ত্রীই নন, জাতির পিতা, রাষ্ট্রের স্থপতি, স্বাধীনতাসংগ্রামের প্রধান কাণ্ডারি এবং দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতায় পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ। ব্যক্তি শেখ মুজিবও অত্যন্ত সংবেদনশীল। তাই যে অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা থেকে আসি না কেন, সম্পর্কের নৈকট্য স্থাপনে কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হয়নি। কর্মক্ষেত্রে প্রথম দিন থেকেই বঙ্গবন্ধুই ব্যবধানটা ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন।

সরকারি দফতরে কাজের ক্ষেত্রে আমাদের মতো বহিরাগত অর্থাৎ যারা সরকারি চাকুরে বা সার্ভিসের লোক নন, তাদের জন্য পরিবেশটা বৈরী না হলেও অনুকূল থাকে না। সাধারণভাবে এটাই সত্য। গণভবনে আমার জন্য পরিবেশটা প্রথম থেকেই অস্বস্তিকর হয়নি। কারণ দ্বিবিধ। এখানকার কর্মকর্তাদের অনেকেই আমার পূর্বপরিচিত। অন্যদিকে তারাও আমার বিষয়ে আগে থেকেই অবহিত ছিলেন। আমি কোথা থেকে কী অবস্থায় এ কাজে এসেছি, এটা তারা জানতেন। প্রধানমন্ত্রীর দফতরের মুখ্যসচিব ছিলেন রুহুল কুদ্দুস। তথাকথিত আগরতলা মামলার 'আসামি'। সচিব রফিকউল্লাহ চৌধুরী। দুজনেই আমার পূর্বপরিচিত। রুহুল কুদ্দুস সাতক্ষীরার লোক। মুজিবনগর সরকারেরও মুখ্যসচিব ছিলেন। তাই জানাশোনা আগে থেকেই। রফিকউল্লাহ চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় অদ্ভুত পরিস্থিতিতে এক রাষ্ট্রীয় নৈশভোজ অনুষ্ঠানে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফরে এসেছিলেন। অনেক রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতা ও রাষ্ট্রাচারের মধ্যে তাঁর সম্মানে দেওয়া নৈশভোজ ছিল অন্যতম। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার জন্য দুদেশের মধ্যে আলোচনাও চলছিল। দৈনিক বাংলার সম্পাদক হিসেবে আমিও এই নৈশভোজে আমন্ত্রিত। নৈশভোজের জন্য আমিও বঙ্গভবনে গিয়ে হাজির হলাম। আমাকে দেখেই বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন তথ্য দপ্তরের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা (পিআইও) এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের চরমপত্রখ্যাত বিশিষ্ট সাংবাদিক এমআর আখতার মুকুল প্রায় পাকড়াও করে এক রুমে নিয়ে গেলেন। সেখানে সরকারের কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি তাদের উদ্দেশ করে বললেন, 'লোক পাওয়া গেছে। চুক্তি বাংলা করার লোক পাওয়া গেছে।' সেখানে উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব রুহুল কুদ্দুস, সচিব রফিকউল্লাহ চৌধুরী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অন্যতম সচিব এএসএম কিবরিয়া। এঁদের পরিচয় আমি পরে জেনেছি। ওইদিনের সন্ধ্যায় রফিকউল্লাহ চৌধুরীর সঙ্গে প্রথম পরিচয় সরকারের অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর সচিব হিসেবে। আগে অবশ্য ছাত্রলীগের নেতা হিসেবে তাকে জেনেছি। ইন্দিরা গান্ধীর সম্মানে দেওয়া নৈশভোজে যোগ দেওয়া তো প্রায় মাথায় উঠল। বসতে হলো ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার ঐতিহাসিক ২৫ বছর মেয়াদি চুক্তির বাংলা তরজমা তথা বাংলা ভাষ্য তৈরি করার জন্য। সত্যি কথা বলতে কী, যত ঐতিহাসিক হোক একটি চুক্তির বাংলা ভাষ্য তৈরির কাজটি আমার কাছে সম্পাদক হিসেবে খুব একটা সম্মানজনক মনে হয়নি। আমার দ্বিধান্বিত অবস্থাটা দেখে রুহুল কুদ্দুস সাহেব ও রফিকউল্লাহ চৌধুরী এগিয়ে এলেন আমাকে বোঝাতে। আমার স্বাধীন বাংলা বেতারের কাজ ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করে বললেন, চুক্তিটি একদিকে যেমন ঐতিহাসিক, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে গোপনীয়। এসব বিবেচনা করেই তারা আমার শরণাপন্ন হয়েছেন। তদুপরি এটাই হবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রথম দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, যা ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায়ও স্বাক্ষর হবে। তাই চুক্তির বাংলা ভাষ্যের গুণগতমান, তাৎপর্য ও গোপনীয়তা– এসবই তাদের বিবেচনায় উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। এভাবেই ইন্দিরা গান্ধীর সম্মানে নৈশভোজের আগে রফিকউল্লাহ চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয়।

গণভবনে কাজ শুরুর কয়েক দিনের মধ্যেই এলো জুলিও কুরি শান্তিপদক প্রদান অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের জন্য বঙ্গবন্ধুর ভাষণ তৈরির দায়িত্ব পড়ল আমার ওপর। এ ধরনের ভাষণের প্রথম খসড়া আসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে। সেটাই রীতি। তার ভিত্তিতেই মূল ভাষণ তৈরি করা হয়। যথারীতি ভাষণটি তৈরি করে অনুমোদনের জন্য বঙ্গবন্ধুর কাছে পাঠিয়েছিলাম। নিয়ে গিয়েছিলেন আমিনুল হক বাদশা। বাদশা তখন ডেপুটি সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কাজ করে অভিজ্ঞ। বঙ্গবন্ধুর স্নেহভাজনও। যা হোক, কিছুক্ষণের মধ্যেই বাদশা গণভবনের দোতলা থেকে নেমে এসে আমাকে জানালেন, বঙ্গবন্ধু আপনাকেই যেতে বলেছেন। বঙ্গবন্ধুর কক্ষে পৌঁছানোর পর তিনি বললেন, দেখ, বক্তৃতা হোক বা অন্য কাগজপত্র হোক, সরাসরি তুমি নিয়ে চলে আসবে। সেদিন বিশ্ব শান্তি আন্দোলনের গুরুত্ব, জুলিও কুরি পুরস্কার ইত্যাদি আনুষঙ্গিক বিষয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর অগ্রগামী চিন্তাভাবনা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় জানিয়ে দিলেন। এরপর থেকেই কাজ বা ব্যক্তিপর্যায়ের সম্পর্কের আড়ষ্টতা দূর হয়ে গেল।

অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিপর্যায়ে প্রত্যেক কর্মী, যারা তাঁর সঙ্গে কাজে জড়িত, তাদের ব্যক্তিগত খবরাখবর নেওয়া ছিল তাঁর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। কোনো কারণে কাজের ক্ষেত্রে কিছুক্ষণ দেরি হলেই, উদ্বিগ্ন বঙ্গবন্ধু খোঁজ নিয়েছেন। জানতে চেয়েছেন, কেউ অসুস্থ কি না। চিকিৎসার জন্য ইমিডিয়েটলি ডাক্তারকে ডাকতে হবে কি না। এভাবেই ব্যক্তিপর্যায়ের খোঁজখবর নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রম দেখা যায়নি।

অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যারা কাজ করতেন, তাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অনেক ক্ষেত্রেই যথাযথ ব্যবস্থা তিনি নিতেন। গণভবন যখন শেরেবাংলা নগরের নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হলো, তখনকার একটি ঘটনা– নতুন গণভবনের পাশের একটি লাল বাড়ি আমার জন্য বরাদ্দ হলো। এ সময় আমি খিলগাঁও চৌধুরীপাড়ায় একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস করতাম। বরাদ্দের খবরটি শুনে বঙ্গবন্ধু বললেন, তোয়াবের জন্য একটি বাড়ি বরাদ্দ হলো। এটা ভালো খবর। কিন্তু খিলগাঁও ছেড়ে গণভবন এলাকায় চলে যাওয়ায় তোয়াবের কাছ থেকে বাইরের যে খবরগুলো পেতাম, ওটা আর পাব না। এমন ধারণা বঙ্গবন্ধুর মনে সৃষ্টি হওয়ার একটা প্রেক্ষাপট আছে।

প্রধানমন্ত্রী তো দূরের কথা, পলিটিশিয়ানদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কাজ করার কোনো অভিজ্ঞতাই আমার ছিল না। খুব স্বাভাবিক, আমার সংকোচ ছিল। দ্বিধা ছিল। বঙ্গবন্ধু নিজেই ডেকে এগুলো দূর করে দিয়েছিলেন। যে মুহূর্তে যেটা প্রয়োজন হবে, যে তথ্য পাওয়া যাবে তাঁকে সরাসরি বলা। কোনো দ্বিধা-সংকোচের কিছু নেই।

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের একটি ঘটনা। ২১ ফেব্রুয়ারির সকালে শহিদ মিনারের বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ইত্যাদি শেষ করে বঙ্গবন্ধু গণভবনে ফিরেছেন। ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের লাহোর বৈঠকে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ প্রশ্নে জোর কূটনৈতিক তৎপরতা চলছে। আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বুমেদিন তার বিমানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বুতেফলিকার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তারা ঢাকার পথে লাহোর ত্যাগ করছেন। লাহোরে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের প্রশ্নে বাংলাদেশের অবস্থান খুবই স্পষ্ট। যে দেশ বাংলাদেশকে এখন পর্যন্ত স্বীকৃতি দেয়নি, সেখানে যোগদানের প্রশ্ন ওঠে না। পাকিস্তান বলছে, পাকিস্তানে গেলে তারা স্বীকৃতি দেবে। কিন্তু বাংলাদেশ নিজের অবস্থানে অনড়। ইসলামী দেশগুলোর সংস্থা ওআইসির সেক্রেটারি জেনারেল হাসান আল তাহমি ইতোমধ্যেই এসে অনুরোধ জানিয়ে গেছেন। কিন্তু বাংলাদেশ নিজের অবস্থানের

কোনো পরিবর্তন করেনি। গণভবনে বঙ্গবন্ধুসহ প্রায় সবাই কিছুটা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় আছেন।

এমন একটি পরিস্থিতিতে বাসা থেকে টেলিফোনে আমার স্ত্রী জানালেন, কিছুক্ষণ আগে লবণের কেজি ১০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। এখন এসে বলছে ১৫ টাকা। তার ১০ মিনিট পর বলছে ২০ টাকা। আমি তখন খিলগাঁও থাকি। আমার মনে পড়ে গেল, ১৯৫২ সালে নুরুল আমিনের আমলে ২০ টাকা সেরদরে লবণ বিক্রি নিয়ে কী তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছিল। আমি তক্ষুনি বঙ্গবন্ধুকে পরিস্থিতি জানালাম। বঙ্গবন্ধু সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিলেন। পুলিশ পাঠানো হলো বাজারে। এজন্য নির্দেশ দিলেন এসপি মাহবুবকে। শিল্প সচিবকে বললেন, লবণের এই আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধির দ্রুত তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে।

১৯৭৫ সালের মার্চের একটি ঘটনা। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন। গণভবনের আশপাশের এলাকায় যারা থাকেন, তাদের সন্তানরা এসেছে গণভবনে ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুকে ফুল দিয়ে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে। আমি জানিও না। আমি কাজ করছি। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'তোয়াবকে ডেকে নিয়ে আসো।' আমি ছুটে গেলাম। আমাকে বললেন, 'দেখো ও বলছে আমাকে ও চেনে। ও চিনল কী করে? বললাম, তুমি কে? ও বলছে, আপনি আমার বাবাকে চেনেন, আমাকেও চেনেন।' আমি বললাম, কে তোমার বাবা? বলতে চায়নি। দুই-তিনবার বলার পর বলেছে।

দেখলাম আমার ছোটো মেয়ে এষা অন্যদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছে। স্লোগান দিয়েছে, বঙ্গবন্ধুর শুভ জন্মদিন জয় হোক। এবার আমাকে বঙ্গবন্ধু বললেন, তুমি এখানে আসোনি কেন? আমি বললাম, 'ওরা এসেছে ওদের মতো। আমি তো আমার মতো কাজ করছি।' ছোটো ছেলেমেয়েদের জন্য বঙ্গবন্ধুর স্নেহ-মমতা ছিল সবার ওপরে।

বঙ্গবন্ধুর অগ্রগামী চিন্তাচেতনার প্রতিফলন শুধু প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়েছে এমন নয়। বিদেশে বিশেষ করে শীর্ষপর্যায়ের সম্মেলন এবং আলাপ-আলোচনায় অনুপম দক্ষতা লক্ষ করা যায়। কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভের পর বঙ্গবন্ধু কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৭৩ সালে এই সম্মেলনে যাওয়ার সময়ও তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থনদানকারী বন্ধুদের কথা ভুলেননি। তাই অটোয়া যাওয়ার পথে বেলগ্রেডে প্রেসিডেন্ট টিটোর সাক্ষাতের জন্য যুগোস্লাভ সরকারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্ট টিটো শুধু যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রপতিই নন, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি। নেহেরু, নাসের, সুকর্নোর সঙ্গে তাঁর নামও সমস্বরে উচ্চারিত। সোভিয়েত ইউনিয়নের এককালের নেতা স্তালিনের সঙ্গে আদর্শগত বিরোধের পর সামরিক জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে তুলতে তিনি ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু, মিসরের রাষ্ট্রপতি জামাল আবদুল নাসেরের সঙ্গে একযোগে নিরলস ভূমিকা রাখেন। নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতিতে বিশ্বাসী। মুক্তিযুদ্ধকালে প্রেসিডেন্ট টিটো তথা যুগোস্লাভ সরকারের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বঙ্গবন্ধু নীতিনিষ্ঠার অপরিহার্য অংশ হিসেবে নিয়েছিলেন।

১৯৭৩ সালে যুগোস্লাভিয়া রাষ্ট্রটি ফেডারেল রিপাবলিক হিসেবে সাতটি রাজ্য নিয়ে গঠিত একটি রাষ্ট্র ছিল। ফেডারেল রাষ্ট্রের সাতটি রাজ্য– স্লোভেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া, হারজেগোভেনিয়া, সার্বিয়া, মন্টেনিগ্রো ও মেসিডোনিয়া। বর্তমানে এই রাজ্যগুলোর প্রত্যেকটিই একেকটি স্বাধীন রাষ্ট্র।

প্রেসিডেন্ট টিটো অসাধারণ সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুকে। রাজধানী বেলগ্রেডে আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা, নৈশভোজ ও আলোচনার নেতৃত্বে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী জামাল বিয়েদিচ। প্রেসিডেন্ট টিটো অবস্থান করছিলেন তার গ্রীষ্মকালীন আবাসস্থল ব্রিওনি দ্বীপে। ক্রোয়েশিয়ার এই দ্বীপটি আড্রিয়াটিক সাগরে অবস্থিত। এটা প্রায় একটি উন্মুক্ত চিড়িয়াখানার মতো। এখানে বাঘ, ভাল্লুক, ময়ূর– এসব প্রায় উন্মুক্ত বিচরণ করত। ক্রোয়েশিয়ার মূল ভূখণ্ড থেকে স্পিডবোট বা লঞ্চে যেতে হয়।

বঙ্গবন্ধুর অগ্রগামী চিন্তাচেতনার প্রতিফলন শুধু প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়েছে এমন নয়। বিদেশে বিশেষ করে শীর্ষপর্যায়ের সম্মেলন এবং আলাপ-আলোচনায় অনুপম দক্ষতা লক্ষ করা যায়

বিদেশি অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে প্রেসিডেন্ট টিটো সাধারণত ঘাটে আসতেন না। তিনজনের ক্ষেত্রে শুধু ইতঃপূর্বে ব্যতিক্রম ঘটেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরু, মিসরের প্রেসিডেন্ট নাসের ও সোভিয়েত কমিউনিস্ট নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ। নেহেরু-নাসের তো জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সহযোদ্ধা। আর কমিউনিস্ট জোট থেকে বহিষ্কৃত যুগোস্লাভ কমিউনিস্ট লীগের নেতা টিটোর সঙ্গে বিভেদ ভুলে নতুন করে সম্পর্ক স্থাপন করতে এসেছিলেন নিকিতা ক্রুশ্চেভ। এই তিন নেতাকে অভ্যর্থনা জানাতে টিটো ব্যক্তিগতভাবে ঘাটে হাজির ছিলেন। এবারও তিনি ব্যতিক্রম ঘটালেন। ত্রিশ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে অভ্যর্থনা জানাতে সশরীরে ঘাটে উপস্থিত হলেন।

বঙ্গবন্ধুর যুগোস্লাভিয়া সফরের কূটনৈতিক সাফল্য এতটাই ছিল যে, বঙ্গবন্ধুকে নৃশংস হত্যার পর টিটোর সরকার দীর্ঘদিন খুনিদের স্বীকৃতিদান বন্ধ রাখে।

যুগোস্লাভিয়া সফর শেষে বঙ্গবন্ধু গেলেন অটোয়া কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে। তখন কানাডার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন পিয়েরে ট্রুডো, এখনকার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর বাবা। ট্রুডো ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন। কমনওয়েলথ সংস্থায় বাংলাদেশের সদস্যপদ নিয়ে অনেক গোলমাল করার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান। যদিও পাকিস্তান কমনওয়েলথের সদস্য নয়। বেরিয়ে গিয়েছিল তারা। তবু তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে গোলমাল করার চেষ্টা করে। কমনওয়েলথের রীতি হচ্ছে যদি কোনো সদস্যরাষ্ট্র আপত্তি করে, তাহলে পদপ্রার্থী সদস্যপদ পাবে না। আফ্রিকান কয়েকটি দেশকে দিয়ে পাকিস্তান চেষ্টা করেছিল বাংলাদেশ যাতে সদস্যপদ না পায়। কিন্তু ওটা আর কাজে আসেনি। কারণ কমনওয়েলথ সেক্রেটারি জেনারেল আরনল্ড স্মিথ ছিলেন বাংলাদেশের পক্ষে। কমনওয়েলথ সম্মেলনের একটা রীতি আছে। শীর্ষ সম্মেলন শুরুর আগের দিন সন্ধ্যায় সেক্রেটারি জেনারেল মিডিয়ার জন্য একটি রিসিপশনের আয়োজন করেন। হেড অব দ্য গভর্নমেন্ট বা রাষ্ট্রপ্রধানরা এই রিসি-পশনে আসেন। সবাই ওখানে যান, কথাবার্তা বলেন। ব্যক্তিপর্যায়ে মতের আদানপ্রদান ঘটে। বঙ্গবন্ধুও ওখানে গেছেন। নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়াকুবু গাওয়ান বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তার একপর্যায়ে বললেন, আপনার তো নামডাক শুনেছি। যখন পাকিস্তান ঐক্যবদ্ধ ছিল; অর্থাৎ দুটো অংশ একত্রে ছিল, তখন পাকিস্তান তো আরও শক্তিশালী ছিল– তাই না? বঙ্গবন্ধু একটু চুপ থেকে বললেন, 'দুই পাকিস্তান একসঙ্গে থাকলে তো ভালোই হতো। একসঙ্গে থাকলে তো দেশ বেশ শক্তিশালী হয়। এই যেমন ভারত যদি ভাগ না হয়ে একসঙ্গে থাকত, তাহলে আরও শক্তিশালী হতো– তাই না। তারপর ধরুন, এশিয়ার সব দেশ যদি একসঙ্গে থাকত, তাহলে আরও শক্তিশালী হতো।' এরপর গাওয়ান বললেন, 'তুমি খুবই শার্প ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি।' শেষ পর্যায়ে তিনি বললেন, ঠিক আছে তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হলো। এর নিদর্শন হিসেবে তুমি আমাকে কী দেবে। বঙ্গবন্ধু বললেন, আমরা তো গরিব দেশ। কী তোমাকে দিই। বঙ্গবন্ধুর কাঁধে ছিল পশমি শাল। বঙ্গবন্ধু সেটা গাওয়ানকে পরিয়ে দিলেন। এটা হচ্ছে ব্যক্তিপর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর কূটনীতি। তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব একটা বড়ো বিষয়। ওইখানে আরেকটা ঘটনা ঘটেছিল। শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমাভো বন্দরনায়েক সংবর্ধনায় ছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁকে বললেন, আমাদের উভয় দেশ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অংশীদার। আপনার প্রয়াত স্বামী সুলেমান বন্দরনায়েক এই আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এজন্য তাঁকে জীবনও দিতে হয়েছে। আর আপনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আসতে দিলেন কলম্বো বিমানবন্দর ব্যবহার করে। আমাদের দেশের লাখ লাখ লোককে তারা হত্যা করেছে। শ্রীমাভো বন্দরনায়েক বললেন, তখন আমাদের দেশে একটা জরুরি অবস্থা চলছিল। দেশে বিদ্রোহ ছিল। পাকিস্তানিরা আমাদের সাহায্য করছিল। বঙ্গবন্ধু তখন বললেন, বাংলাদেশের সঙ্গে শ্রীলঙ্কার সম্পর্ক একদিনের নয়, শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে আসছে এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের নৈকট্য। তিনি একটি কবিতা বললেন, 'বাঙালির ছেলে বিজয় সিংহ হেলায় লঙ্কা করিল জয়...।' কবিতাই বলছে আমাদের হিরো আপনাদেরও হিরো। শ্রীমাভোর সঙ্গে তার এক মেয়ে ছিলেন। পরবর্তী সময়ে জেনেছি তিনি তাঁর মেয়ে। সম্ভবত চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা। উনি বললেন, তুমি কী বলতে চাচ্ছ? বিজয় সিংয়ের মতো তুমি শ্রীলঙ্কা দখল করবে? বঙ্গবন্ধু কয়েক সেকেন্ড নীরব থাকলেন। তারপর বললেন, অবশ্যই চাই। তবে সেটা অস্ত্র বা সৈন্য দিয়ে নয়। তোমাদের হৃদয় জয় করতে চাই আমরা। এটা বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক দক্ষতার গভীরতার আরও একটি প্রমাণ।

কমনওয়েলথ সম্মেলনের পর স্বাধীন বাংলাদেশের জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষার সম্মুখীন হয় জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর আলজিয়ার্স শীর্ষ সম্মেলনে। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য হওয়া বাংলাদেশের জন্য খুবই স্বাভাবিক। কারণ বাংলাদেশের ঘোষিত নীতিই জোটনিরপেক্ষতা এবং সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব। কিন্তু সেখানেও কোনো কোনো আরব দেশ বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের বিরোধিতা করে বলছে, বাংলাদেশ পাকিস্তানকে পরাজিত করেছে। তবে ফিলিস্তিনের নেতা ইয়াসির আরাফাত ওইসব দেশের বিরুদ্ধে বড়ো ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, শেখ মুজিবুর রহমান আমার ভাই এবং ফিলিস্তিনিদের ভাইয়ের মতো। আমাদের সংগ্রামের অংশীদার।

আলজিয়ার্সের জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের সাফল্যের সঙ্গে অংশগ্রহণ নানা দিক থেকে শীর্ষপর্যায়ের রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর পারস্পরিক মতবিনিময় প্রধান কূটনৈতিক সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন ৭৫ দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান ছাড়াও মুক্তিসংগ্রামের নেতারা। ছিলেন কম্বোডিয়ার নেতা প্রিন্স নরোদম সিহানুক। ছিলেন অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, নামিবিয়ায় মুক্তিসংগ্রামরত নেতারা। তাঁরা সবাই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন।

আলজেরিয়াও মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে ফ্রান্সের দখলমুক্ত একটি দেশ। মুক্তিযুদ্ধের নেতা, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রনায়ক এবং সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিষ্পেশনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত নেতারা আলজেরিয়ার জনগণ তথা যুবসমাজের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত।

আলজিয়ার্স পৌঁছেই একটা সমস্যার মুখে পড়তে হয়। শীর্ষ সম্মেলনের খবরাখবর সংগ্রহের জন্য আসা মিডিয়ার লোকজনের পাস অর্থাৎ অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড তখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। মূল কারণ, আলজিয়ার্সের বাংলাদেশ দূতাবাস ওই সময়ে ছিল একেবারেই ছোটো। লোকবলের অভাবে সম্মেলনের পাস সংগ্রহ সম্ভব হয়ে উঠেনি। তবে জানানো হয়, সম্মেলন শুরু হলে পাস এনে দেওয়া হবে। আর মিডিয়ার লোকজন সম্মেলন কেন্দ্রেই পাস পাবেন। বঙ্গবন্ধুর সফরসঙ্গী হিসেবে মিডিয়া দলে ছিলেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার সিনিয়র রিপোর্টার জওয়াদুর রহমান, ইস্টার্ন নিউজ এজেন্সির রিপোর্টার হাসান সাঈদ, বিটিভি ও ডিএফপির দুজন ক্যামেরাম্যান, পিআইডির ফটোগ্রাফার আলম এবং রেডিও বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন স্বয়ং ডিরেক্টর জেনারেল (ডিজি) এমআর আখতার মুকুল। এ ছাড়াও দুজন সম্পাদক বাংলাদেশ অবজারভারের ওবায়েদ-উল-হক ও জনপদের আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী। বঙ্গবন্ধুর অফিসের পক্ষ থেকে ছিলেন সচিব রফিকউল্লাহ চৌধুরী, সহকারী একান্ত সচিব মোহাম্মদ হানিফ ও নিরাপত্তা অফিসার মহিউদ্দিন। প্রেস অফিসার হিসেবে আমি তো ছিলামই। বঙ্গবন্ধুর অফিসের একমাত্র রফিকউল্লাহ চৌধুরী ছাড়া আমাদের কোনো পাসের ব্যবস্থা করা হয়নি। এজন্য অবশ্য রাষ্ট্রদূত আরশাদুজ্জামান সাহেবকে মৃদু ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়। ওবায়েদ-উল-হক ও গাফ্‌ফার চৌধুরী, এমআর আখতার মুকুল, অন্যান্য সাংবাদিক এবং আলোকচিত্রীরা ছিলেন হোটেলে। আমরা ছিলাম ভিলায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে। ভূমধ্যসাগরতীরের এই ভিলাগুলো ছিল ফরাসি উপনিবেশের কর্তাদের তৈরি। একই ধরনের এই পঁচাত্তরটি ভিলা ৭৫ জন রাষ্ট্রনায়কের জন্য বরাদ্দ। প্রত্যেক রাষ্ট্রনায়কের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয় একজন একান্ত সচিব এবং একজন সামরিক সচিব।

সবই মোটামুটি নিখুঁতভাবে চলছিল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল আমাদের অর্থাৎ যাদের পাস নেই, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাঁদের সম্মেলন কেন্দ্রে প্রবেশ নিয়ে। মুশকিল আসান করে দিলেন বঙ্গবন্ধু নিজেই।

বললেন, তিনি যখন সম্মেলন কেন্দ্রে প্রবেশ করবেন, আমরা সবাই যেন একসঙ্গে হেঁটে গিয়ে সম্মেলন কেন্দ্রে ঢুকে যাই। আমরা সবাই ভিলা থেকে সম্মেলন কেন্দ্র প্যালেস দ্য নেশনে যাব। নির্দেশ অনুযায়ী আমরা সবাই ভিলা থেকে প্যালেস দ্য নেশনে পৌঁছে গেলাম। ওবায়েদ-উল-হক ও গাফ্ফার চৌধুরীও এই দলে ছিলেন। সবাই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে জোরকদমে চলে সম্মেলন কেন্দ্রে ঢুকে যাই। বাদ পড়ে যান ওবায়েদ-উল-হক সাহেব। বয়সের ভারে সম্ভবত তাঁর পক্ষে জোরকদমে তাল মেলানো সম্ভব হয়নি। তাই পেছনে পড়ে যান। সিকিউরিটির দায়িত্বে নিয়োজিত ভয়াল বাহিনী তাঁকে আটকে দেয়। ওবায়েদ-উল-হক সাহেব প্রবেশ করতে না পারায় বঙ্গবন্ধু খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁকে খুঁজে বের করতে তাৎক্ষণিক নির্দেশ দেন। জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনের স্থান প্যালেস দ্য নেশন বিশাল একটি ভবন। এটি তৈরি করা হয় ১৯৬৫ সালের দিকে। ওই সময়ে আলজিয়ার্সে শীর্ষ সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট বেন বোল্লাকে পদচ্যুত করে আলজেরীয় মুক্তি বাহিনীর প্রধান এবং আদর্শগতভাবে কঠোরপন্থি হিসেবে বিবেচিত কর্নেল হুয়ারি বুমেদিন ক্ষমতা দখল করায় শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত হয়ে যায়। সম্মেলন কেন্দ্রের লবিতে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের বসার জন্য একেকটি কর্নার ছিল। বঙ্গবন্ধু প্রথমেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নেতাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন। মিলিত হন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এবং যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট টিটোর সঙ্গে। পরে একে একে অন্যদের সঙ্গে। কম্বোডিয়ার নির্বাসিত নেতা ও প্রবাসী সরকারের প্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুক, মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এবং ফিলিস্তিনের নেতা ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে সাক্ষাৎকারটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ইয়াসির আরাফাত তো সব সময়ই বঙ্গবন্ধুকে তার ভাই হিসেবে উল্লেখ করতেন। জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের সদস্যপদ নিয়ে পাকিস্তানের প্ররোচনায় গুটিকয়েক আরব দেশ বিশেষ করে জর্ডান ঘোঁট পাকানোর চেষ্টা করলে ইয়াসির আরাফাত তাদের কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, এ ধরনের কাজ করলে ফিলিস্তিনিদের বিক্ষোভের মাধ্যমে জর্ডানের বাদশাহর সিংহাসন উড়িয়ে দেওয়া হবে।

সৌদি বাদশাহ ফয়সালের সঙ্গে সাক্ষাৎকারটি বঙ্গবন্ধুর সৌজন্যবোধ এবং নীতিগত প্রশ্নে দৃঢ়তার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। বঙ্গবন্ধু সাক্ষাৎকালে বললেন, আমি তোমাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি। আমাদের দুদেশের মধ্যে কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। তোমরা আমাদের স্বীকৃতি দাওনি। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের নাগরিকদের হজ করার অধিকার দিয়েছ। এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্র। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংস হামলা আর নির্বিচার ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যেও বাংলাদেশের মানুষ হজ ও ওমরা তাঁদের ইমানের অঙ্গ বলেই মনে করেন। মুক্তিযুদ্ধ ও ধ্বংসযজ্ঞের কথা শুনেই বাদশাহ ফয়সাল বলে উঠলেন, আমাদের এখন সাহায্য করার মতো অবস্থা নেই। আমাদের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। বঙ্গবন্ধু কিছুক্ষণ চুপ থেকে জানালেন, আমি তো আপনাদের কাছে সাহায্য চাইতে আসিনি। আমি তো এসেছি মুসলমানের কাছে পবিত্র মক্কার মসজিদুল হারাম কাবাশরিফ আর মদিনার মসজিদে নববি– এই দুই মসজিদের আপনি মোতাওয়াল্লি; আমি এজন্যই আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি। তবে এটিও পরিতাপের বিষয়, বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তর মুসলিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের পবিত্র ভূমির দেশ সৌদি আরব এখনো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি।

বাদশাহ ফয়সাল জবাবে জানান, সৌদি আরবের স্বীকৃতি পেতে হলে দুটি কাজ করতে হবে। বাংলাদেশের নাম ইসলামিক রিপাবলিকান অব বাংলাদেশ রাখতে হবে। আর পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে হবে।

বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, সৌদি আরবের নাম তো ইসলামিক রিপাবলিক নয়। কিংডম অব সৌদি অ্যারাবিয়া। আর পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের বিরোধ দ্বিপাক্ষিক। আমাদের দেশে অবস্থানকারী কয়েক লাখ পাকিস্তানি নাগরিককে ফেরত নেওয়ার দাবি আমরা জানাচ্ছি। আমরা চাইছি, পাকিস্তানের সম্পদের ভাগবাঁটোয়ারা, সাবেক যুক্ত পাকিস্তানের সম্পদের ভাগ। কারণ আন্তর্জাতিক দায়দেনার দায়িত্বও আমাদের ঘাড়ে চেপেছে। তাই আগেরকার– পাকিস্তানের সম্পদের আমরা অংশীদার।

নিজের মতো অবিচল থেকে জাতিসত্তার প্রশ্নে কোনো ধরনের আপস না করা এবং প্রতিপক্ষকে আঘাত না করা বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক শিষ্টাচারের অংশ

বাদশাহ ফয়সাল বলেছিলেন, পাকিস্তান আর আমরা এক, তাই আগে পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধ মেটাতে হবে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর এককালের নেতা মওলানা ভাসানীর উচ্চারিত একটি আরবি কথা পুনরুক্তি করলেন, 'লাকুম দিনুকুম ওয়ালিয়াদিন।' এবং কোলাকুলি করে চলে এলেন। নিজের মতো অবিচল থেকে জাতিসত্তার প্রশ্নে কোনো ধরনের আপস না করা এবং প্রতিপক্ষকে আঘাত না করা বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক শিষ্টাচারের অংশ। আলজিয়ার্স শীর্ষ সম্মেলন বৈশ্বিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বড়ো চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছিল বাংলাদেশ। এজন্য সংসদ সদস্য ও পরবর্তীকালে মন্ত্রী শামসুল হক এবং প্রখ্যাত আইনজ্ঞ ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের নেতৃত্বে একটি অগ্রগামী প্রতিনিধিদল আলজিয়ার্স পাঠিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।

ওই সময়ের তরুণ আরব ও আফ্রিকার নেতাদের সঙ্গে ব্যারিস্টার আমীরের ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিশেষ করে লিবিয়ার কোনো এক নেতার সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতার খবরটি একসময় বেশ সরব ছিল। লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফির সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর বৈঠক যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনায় গাদ্দাফি মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং বাংলাদেশের স্বীকৃতির বিষয়টি বেশ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার আশ্বাস দেন। শুধু তা-ই নয়। বাংলাদেশের মঙ্গল কামনায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলকে নিয়ে দুই রাকাত নামাজও আদায় করেন।

শুধু গাদ্দাফির সঙ্গে বৈঠকই নয়, আরব ও আফ্রিকার একাধিক রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু বৈঠকে মিলিত হন। সিরিয়ার হাফিজ আল আসাদ, ইরাকের হাসান আল বাকের, তাঞ্জেনিয়ার জুলিয়াস নায়ারেরিসহ কুয়েত, ইয়েমেন, মরক্কোর নেতাদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিপর্যায়ে বৈঠক ও আলাপ-আলোচনার ফলে একদিনে প্রায় ১৬টি আরব ও আফ্রিকান দেশ স্বীকৃতি দেয় বাংলাদেশকে। রাষ্ট্রদূত আসাদুজ্জামানের মতে, বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্বে কুয়েতের আমির এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি বঙ্গবন্ধুকে তার বাবার সমতুল্য মনে করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট হুয়ারি বুমেদিনের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর গড়ে উঠেছিল গভীর নৈকট্য।

আলজিয়ার্স শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করতে আসা নেতাদের মধ্যে দুজন ভিলায় এসে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎ এবং আলোচনায় মিলিত হন কম্বোডিয়ার প্রিন্স নরোদম সিহানুক ও কিউবার নেতা ফিদেল কাস্ত্রো। নরোদম সিহানুককে সিআইএ চক্রান্তের মাধ্যমে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে দেশত্যাগে বাধ্য করে। তিনি একটি প্রবাসী সরকার গঠন করেন।

কাস্ত্রো ও সিহানুক উভয়েই বঙ্গবন্ধুর অগ্রগামী নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কাস্ত্রোর হিমালয়ের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর তুলনা তো এখন প্রবাদে পরিণত হয়েছে, 'আমি হিমালয় দেখেনি, আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি।' আর প্রিন্স নরোদম সিহানুকের প্রবাসী সরকারের স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্ত বঙ্গবন্ধু আলজিয়ার্সেই গ্রহণ করেন। বিপ্লবের সন্তান ফিদেল কাস্ত্রো বারবার বঙ্গবন্ধুকে তাঁর নিরাপত্তার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এমনকি বিদায়কালে আবারও নিরাপত্তার কথা বলে যান।

আলজিয়ার্সের জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন বিশ্বে বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তির সত্যিকার অর্থে একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে। সম্মেলনে নেতারা নানা বিষয়ে আলোচনায় প্রাধান্য দেন। ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, নামিবিয়ার জনগণের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সমর্থন, দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যের অবসান, ফিলিস্তিনি জনগণের মাতৃভূমির অধিকার দাবিকে সুস্পষ্ট ভাষায় সক্রিয় সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন। দুনিয়ার গরিব-দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্মেলনের সংহতি ঘোষণা এবং বিশ্ব অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্যের অবসান দাবি করে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়।

সম্মেলনে সব নেতাই যে এক সুরে সব সময় কথা বলেছেন, তেমনটি নয়। কিউবা, মিসর, আলজেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া, ভারত, ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ সাম্রাজ্যবাদ ঔপনিবেশিক শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রায় স্পষ্টই কথা বলে। ইসরাইল তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তেজোদীপ্ত ভাষণ দেন ফিলিস্তিনের নেতা ইয়াসির আরাফাত। অন্যদিকে তিউনেসিয়ার প্রেসিডেন্ট হাবিব বুরগুইবা বিশ্বের সব বিশৃঙ্খলা, শোষণ-নির্যাতনের জন্য বামপন্থি তথা কমিউনিস্টদের দায়ী করেন। বিশেষ করে কিউবার নেতা ফিদেল কাস্ত্রোকে এসব ঘটনার জন্য দায়ী করেন। প্রতিবাদে ফিদেল কাস্ত্রোও অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বুরগুইবার নিন্দা করে তাকে সাম্রাজ্যবাদের পা চাটা কুত্তা বলে অভিহিত করেন। প্রতিবাদে বুরগুইবা সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে যান। তিনি যখন ওয়াকআউট করে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাকে উদ্দেশ করে ফিদেল কাস্ত্রোকে 'রানিং ডগস অব ইম্পেরিয়ালিস্ট আর রানিং আউট' বলতে শোনা যায়। সম্মেলনে হাস্যরোলের সৃষ্টি করেন উগান্ডার ক্ষমতা দখলকারী ইদি আমিন। উগান্ডার সেনাবাহিনীর এই সার্জেন্ট ক্ষমতা দখল করে নিজেকে ফিল্ড মার্শাল ঘোষণা করেন। তিনি পরবর্তী জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন উগান্ডায় অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেন। বলেন, থাকা-খাওয়ার সব ব্যবস্থা তার সরকারই করবে।

আলজিয়ার্স শীর্ষ সম্মেলনের প্রাক্কালে দুনিয়াটাকে নানা ভাগে অভিহিত করার প্রবণতা লক্ষণীয় ছিল। বিশ্বের ধনী দেশ তথা পশ্চিমা বিশ্ব এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর জোট মোটামুটি এভাবেই বিভক্তি রেখা টেনে দেখা হতো। পাশ্চাত্য জোট ও সমাজতান্ত্রিক জোট তথা সামরিক ব্লকের বাইরে থেকে নীতিনির্ধারণ এবং স্বাধীন পথে চলার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু, যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট টিটো, মিসরের প্রেসিডেন্ট নাসের এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্নো জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণের ঘোষণা দেন। দিন দিন জোটনিরপেক্ষ নীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি আন্দোলনে রূপপরিগ্রহ করে। আলোচ্য সময়ে পাকিস্তান, চীন আরও দু-একটি দেশ যারা জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেনি বা সামরিক জোট বর্জনের আন্দোলনে শরিক হয়নি, তারা একটি নতুন ফর্মুলা বের করে। তারা বলতে থাকে, দুনিয়া অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দিক থেকে তিন ভাগে বিভক্ত। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলো প্রথম বিশ্ব। সমাজতান্ত্রিক জোটের দেশ দ্বিতীয় বিশ্ব। আর অন্য গরিব দেশগুলো নিয়ে তৃতীয় বিশ্ব। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো সুকৌশলে আলজিয়ার্স জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে আগে তৃতীয় বিশ্বের ধারণাটি নিয়ে আসেন এবং জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে সদস্যপদের দাবি জানাতে থাকেন। তবে তার দেশ যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সিটো সেন্টো প্রভৃতি সামরিক জোটে আবদ্ধ, এ কথা একবারও মুখে আনেননি। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আদর্শগত বিরোধের ফলে চীন সমাজতান্ত্রিক জোটের বিরুদ্ধে একধরনের বৈরী আচরণে লিপ্ত। এজন্য তাদেরও জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে অবস্থান গ্রহণ জরুরি। ফলত চীনও তৃতীয় বিশ্বের ধারণা নিয়ে ছিল সোচ্চার। আলজিয়ার্স সম্মেলনের সামনেও তৃতীয় বিশ্বের তত্ত্বটি কারও কারও মধ্যে বেশ চমকের সৃষ্টি করে।

আলজিয়ার্স শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে এ ধরনের ভাগাভাগির ধারেকাছেও যাননি। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, আমরা মনে করি, দুনিয়াটা দুই ভাগে বিভক্ত। একদিকে শোষক, অন্যদিকে শোষিত। আমরা শোষিতের দলে। এভাবে তিনি ওই সময়ের চলমান বিতর্ক পরিহার করে নিজেদের সম্পদ একত্রিত করে দেশের উন্নয়ন, তথা গরিব মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সত্যি কথা বলতে কী, আলোচ্য সময়ে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে এমন অনেক দেশ ছিল যাদের সম্পদ গরিব দেশগুলোর উন্নয়নে বিনিয়োগ করলে সব মানুষই উপকৃত হতো। ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে ইয়ামকাপুরের সময়ে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর আরবরা যেভাবে একজোট হয়ে তাদের সম্পদ পেট্রোলিয়ামকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে সমরাস্ত্রের চেয়ে অধিক কার্যকর প্রমাণ করেন। বঙ্গবন্ধু মাত্র এক মাস আগে আলজিয়ার্সে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, নিজেদের সম্পদ একযোগে ব্যবহারের। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নীতি এখানেও প্রমাণিত।

আলজিয়ার্সের প্যালেস দ্য নেশনে অনেক যুবক-যুবতী স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। সম্মেলনে যোগদানকারী নেতারা যখন সম্মেলন কক্ষ থেকে বেরিয়ে করিডর দিয়ে যেতেন,

তখন সারিবদ্ধ হয়ে তারা নেতাদের অভিনন্দিত করতেন। এদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তি হিসেবে দেখা গেছে চারজনকে– ফিদেল কাস্ত্রো, ইয়াসির আরাফাত, গাদ্দাফি আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই নেতারা যখন সম্মেলন কেন্দ্রে প্রবেশ করতেন বা সম্মেলন থেকে বেরিয়ে যেতেন, ওইসব যুবক-যুবতী একযোগে করতালি দিয়ে তাদের অভিনন্দিত করত। আর বঙ্গবন্ধু, কাস্ত্রো, আরাফাত, গাদ্দাফি যখন একসঙ্গে বের হতেন, এদের উচ্ছ্বাস হয়ে উঠত বাঁধভাঙার মতো।

আলজিয়ার্স থেকে ফিরে আসার পর অক্টোবরেই শুরু হয়ে যায় আরব-ইসরাইল যুদ্ধের ঘনঘটা। আলামত নানাভাবে প্রকাশও পাচ্ছিল। মিসর নীরবে সুয়েজ খাল এলাকা থেকে ইসরাইলি দখলদার বাহিনী অপসারণের চেষ্টায় আন্তর্জাতিক নানা কূটনৈতিক তৎপরতা চালাচ্ছিল। কিন্তু কোনো কিছুতেই বিশেষ কোনো ফল পাওয়া যায়নি। অক্টোবরে মিসর সুয়েজ খালের এলাকা থেকে ইসরাইলি দখলদার বাহিনী অপসারণের জন্য খুবই সন্তর্পণে সামরিক অভিযান শুরু করে এবং সিনাই এলাকায় বিশাল ভূখণ্ড ইসরাইলি দখলমুক্ত হয়। দিনটি ছিল ইসরাইলের ধর্মীয় উৎসবের দিন ইয়ামকাপুর। এজন্য পাশ্চত্য শক্তি সর্বদা এটিকে ইয়ামকাপুরের যুদ্ধ বলে অভিহিত করে থাকে। ভাবখানা এমন, ধর্মীয় উৎসবের দিনে আক্রমণ করে মিসর মহা অন্যায় করে ফেলেছে। ১৯৬৭ থেকে '৭৪ সাল পর্যন্ত ইসরাইল সুয়েজ এলাকায় বিশাল মিসরীয় ভূখণ্ড দখল করে রেখে আন্তর্জাতিক আইনকানুন, জাতিসংঘের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে চললেও সেটা কোনো অপরাধ নয়! মার্কিন সহায়তায় ইসরাইল পরে অবশ্য এই বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠে।

বঙ্গবন্ধু এ সময়ে মিসরের পাশে দাঁড়ানোর নীতি গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি সত্ত্বেও বিশেষ বিমানে মিসরে বিপুল পরিমাণ চা পাঠান। মিসর কোনো দিনই বঙ্গবন্ধুর উদার ভ্রাতৃত্বের নীতি বিস্মৃত হয়নি। পরবর্তীকালের অনেক ঘটনাই তার সাক্ষ্য বহন করে।

আলজিয়ার্স জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ ভূমিকা এবং ইসরাইলি জবরদখলের বিরুদ্ধে মিসরের সামরিক অভিযানে বঙ্গবন্ধুর অকুণ্ঠ সমর্থন আরব নেতাদের মধ্যে বিশেষ করে প্রগতিশীল আরব দেশগুলোয় একধরনের সৌভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে। তারা চাইছিলেন বাংলাদেশ ইসলামী দেশগুলোর সংস্থা ওআইসিতে যোগদান করুক। ইসলামী দেশগুলোর ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আসন্ন লাহোর শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করুক। ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ওআইসির (অর্গানাইজেশন অব ইসলামী কান্ট্রিস) মহাসচিব হাসান আল তাহমি কয়েকবারই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে দেনদরবার করেছেন। বাংলাদেশ নীতি হিসেবে জানিয়ে দিয়েছে, যে দেশ এখনো বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়নি, সেখানে কোনো সম্মেলনে যোগদান বাংলাদেশের পক্ষে অসম্ভব। বলা হয়েছিল, সম্ভবত পাকিস্তানের ওকালতিতে, লাহোরের মাটিতে বঙ্গবন্ধু পা রাখা মাত্রই পাকিস্তান স্বীকৃতি দেবে বাংলাদেশকে। বাংলাদেশ আবারও সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, পাকিস্তানের কোনো স্থানের মাটি বা আকাশে বাংলাদেশ বিনা স্বীকৃতিতে পা রাখতে রাজি নয়।

এমন একসময়ে ১৯৭৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে শহিদ মিনারে শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে বঙ্গবন্ধু গণভবনে ফিরেছেন। সকাল প্রায় ১০টা। ওআইসি মহাসচিবের কাছ থেকে একটি বার্তা এলো বঙ্গবন্ধুর জন্য। আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়ারি বুমেদিন তার বিশেষ বিমান পাঠিয়েছেন বঙ্গবন্ধুকে লাহোরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বিমানে আলজেরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বুতেফলিকার নেতৃত্বে আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের একটি দল রয়েছেন। দলে কুয়েতের আমিরের বিশেষ দূত হিসেবে আছেন কুয়েতি পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁরা বঙ্গবন্ধুকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চান।

ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের প্রতিনিধিদল ঢাকা এলো ২২ ফেব্রুয়ারি। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনায় তারাও জানালেন, রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ছাড়া বাংলাদেশের পক্ষে লাহোর সম্মেলনে যোগদান সম্ভব নয়। আলাপ-আলোচনার পর প্রতিনিধি দলটি বাংলাদেশের সঙ্গে ঐকমত্যে উপনীত হলো যে, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান একই সময়ে একযোগে পারস্পরিক স্বীকৃতি দেবে এবং লাহোর ও ঢাকা থেকে এ ঘোষণা একসঙ্গে প্রচার করা হবে– এটাও সিদ্ধান্ত হলো। ২৩ ফেব্রুয়ারি ওআইসি সম্মেলনে যোগ দিতে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল লাহোর যাবে। প্রেসিডেন্ট বুমেদিনের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলা হলো, বাংলাদেশ বিমানেরই বিশেষ ফ্লাইটে প্রতিনিধিদল লাহোর যাবে। ওইদিন সন্ধ্যায় ওআইসির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের প্রতিনিধিদলটি লাহোর ফিরে যায়।

সন্ধ্যায় গণভবনে মন্ত্রিপরিষদের বিশেষ বৈঠক বসে লাহোরে ওআইসি শীর্ষ সম্মেলন নিয়ে। সম্মেলনে যোগদানের সিদ্ধান্ত বিশেষ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় অনুমোদন করা হয়। ইতোমধ্যে লাহোর গমনের জন্য অতি উৎসাহী কিছু পাকিস্তানপ্রেমীও

> সর্বাধিক কৌতুককর বিষয় হলো, বাংলাদেশে গণহত্যার অগ্রনায়ক হিসেবে পরিচিত জেনারেল টিক্কা খানের গার্ড অব অনার দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে ফৌজি সালাম জানানো। ইতিহাসের মার কী বিচিত্র!

গণভবনে দেনদরবার করতে শুরু করেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন ছাড়াও ছিলেন বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদ, তথ্যপ্রতিমন্ত্রী তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, প্রধানমন্ত্রীর সচিব আবদুর রহিম, এনএসআইয়ের মহাপরিচালক মেসবাহউদ্দিন আহমদ প্রমুখ।

বাংলাদেশ বিমানের বিশেষ ফ্লাইটটি লাহোর বিমানবন্দরে অবতরণের পর এক অভূতপূর্ব অবস্থার সৃষ্টি হয়। পত পত করে উড়ছে বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা। বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনা জানাতে উপস্থিত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট চৌধুরী ফজলে এলাহী, প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যসহ সব ধরনের গণ্যমান্য ব্যক্তি। সর্বাধিক কৌতুককর বিষয় হলো, বাংলাদেশে গণহত্যার অগ্রনায়ক হিসেবে পরিচিত জেনারেল টিক্কা খানের গার্ড অব অনার দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে ফৌজি সালাম জানানো।

বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণ শেষ করেন ইসলামী বিশ্বের নেতাদের চলমান বিশ্ব বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আলজিয়ার্সের জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনেও একই বিষয়ের প্রতি বঙ্গবন্ধু জোর দিয়েছিলেন

ইতিহাসের মার কী বিচিত্র! একদিন এই টিক্কা খানই বঙ্গবন্ধুকে ধরে নিয়ে জেলে পুরেছে। পারলে ওই সময়ই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করত। আর আজ লাহোরে তার নিজের দেশে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুকে গার্ড অব অনার দিতে হচ্ছে, বাংলাদেশের পতাকাকে অভিবাদন জানিয়ে।

লাহোর বিমানবন্দরে যখন সংবর্ধনা ও গার্ড অব অনার চলছে, দর্শকদের মধ্যে টারম্যাকে উপস্থিত ছিলেন আমার পূর্বপরিচিত সিনিয়র সাংবাদিক এবং সাংবাদিক ইউনিয়নের বিশিষ্ট নেতারা। এককালে পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট আসরার আহমদ, পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ মালিক, পাকিস্তান টাইমস পত্রিকার সম্পাদক এটি চৌধুরী এবং এককালের প্রগতিশীল সাংবাদিক আইএসপিআরের কর্মকর্তা কমান্ডার সিদ্দিকী। আবদুল্লাহ মালিক সব সময়ই রসিক ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত। তিনি আমাকে কৌতুকছলে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি জানো টিক্কা এখন কী চিন্তা করছে? কোনো জবাব না দিয়ে আমি তার বক্তব্যের অপেক্ষায় আছি। আবদুল্লাহ মালিকের জবাব, টিক্কা ভাবছে, পিআইএর সব বিমান আমরা নিয়ে এসেছি। অথবা রেঙ্গুনে চালান করে দিয়েছিলাম সারেন্ডারের আগে। এখন বাংলাদেশ এই বোয়িংটি কোথায় পেল। ঘাতকের মন ঘুরেফিরে একই দিকে প্রবাহিত হয়।

বিমানবন্দর থেকে লাহোর সিটি, সংবর্ধনা আর গার্ড অব অনার পর্ব শেষে নগরীর অভিমুখে ছুটল বঙ্গবন্ধুর গাড়িবহর, সঙ্গে পুরো প্রতিনিধিদল। পথের দুই পাশে বিস্ময়কর দৃশ্য। হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে আছে বঙ্গবন্ধুকে দেখার জন্য। জিন্দাবাদ ধ্বনিতে স্লোগান দিচ্ছে। পুরো পথে একই দৃশ্য।

বঙ্গবন্ধুকে ভিআইপি সড়কের একটি ভিলায় নিয়ে তোলা হলো। শুনেছি এই সড়কের দুই ধারে যত বাড়ি ছিল, সবই শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানকারী রাষ্ট্রপ্রধানদের জন্য রিকুইজিশন করা হয়। বাড়ির মালিকদের অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর ভিলায় বঙ্গবন্ধু ছাড়াও ছিলেন তোফায়েল আহমেদ ও তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ও নিরাপত্তারক্ষীরা।

বঙ্গবন্ধু লাহোরে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন কেন্দ্রে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে সম্মেলনের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর ঘোষণায় সম্মেলনে ঘটে অভিনব দৃশ্যের অবতারণা। উপস্থিত প্রতিনিধি ও অতিথিরা দাঁড়িয়ে একযোগে করতালিতে মুখরিত করে তোলেন।

লাহোরে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে ভাষণে বঙ্গবন্ধু প্রথমেই সন্তোষ প্রকাশ করেন, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সংগ্রামের স্বীকৃতির জন্য স্বাধীন-সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে আমরা এখন আমাদের এই উপমহাদেশ ও বিশ্বে নতুন অধ্যায় সৃষ্টির ভিত্তি রচনায় সক্ষম হব। বঙ্গবন্ধু বলেন, আমাদের এই পৃথিবী তথা মানবসভ্যতা এখন এক বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখে। একদিকে ধ্বংসের অপরিমিত ক্ষমতা, অন্যদিকে সৃজনশীল উন্নত জীবনমানের অপার সম্ভাবনা। বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব ও মর্যাদাবোধের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, মানবসমাজ বিষয়ে মহানবীর এই শিক্ষাই আমাদের সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে পারে। এই মূল্যবোধের ভিত্তিতেই আমরা শান্তি ও ন্যায়ের নতুন এক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারব। আরব ভাইদের সংগ্রামের প্রতি সমর্থনে ঐক্য সুদৃঢ় করাই শুধু নয়, দুনিয়ার নির্যাতিত মানুষের উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবৈষম্য তথা সব ধরনের আধিপত্য ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের সমর্থন থাকতে হবে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণ শেষ করেন ইসলামী বিশ্বের নেতাদের চলমান বিশ্ব বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আলজিয়ার্সের জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনেও একই বিষয়ের প্রতি বঙ্গবন্ধু জোর দিয়েছিলেন। লাহোরেও বঙ্গবন্ধু একই বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ভাষণ শেষ করেন। তিনি বলেন, আল্লাহর রহমতে আজ ইসলামী দেশগুলো যে পরিমাণ সম্পদ ও সামরিক শক্তির অধিকারী, একে সুসংহত করে কাজে লাগাতে পারলে সাফল্য আমাদের নিশ্চিত।

ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের নেতারা এ সময়ের ইসরাইল অধিকৃত আরব ভূমি পুনরুদ্ধার তথা ফিলিস্তিনিদের জন্মগত অধিকার আদায়ের জন্য ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামতে কতটা প্রস্তুত ছিলেন, এটা বিবেচনার বিষয়। অন্যদিকে তাদের অনেকেই যুদ্ধাপর-

াধী হিসেবে আটক ১৯৫ পাকিস্তানি সেনাকে ছাড়িয়ে নিতে তথা মুক্ত করতে ছিলেন মরিয়া। মিসর-ইয়ামকাপুর যুদ্ধ তথা রামাদান যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় ক্ষুব্ধ মিসরের নেতা আনোয়ার সাদাত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা ইসরাইলের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের কার্যকর নেতৃত্বে বাথ পার্টি ক্ষমতাসীন। ইরাক অবশ্য লাহোরে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে পর্যবেক্ষক হিসেবে যোগদান করে।

লাহোরের শালিমার গার্ডেনে ওআইসির শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানকারী নেতাদের সম্মানে নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। ৩০০ বছর আগে মোগল বাদশাহ শাজাহান শালিমারবাগ (শালিমার গার্ডেন) তৈরি করেন। বঙ্গবন্ধু, ভুট্টো, গাদ্দাফি, ইয়াসির একসঙ্গে প্রবেশ করলে হাজার হাজার অতিথির মধ্যে বস্তুত এক উন্মাদনার সৃষ্টি হয়। সবাই বঙ্গবন্ধু ও ভুট্টোকে ইসলামী ঐতিহ্য অনুযায়ী মিলনের প্রতীক হিসেবে কোলাকুলির জন্য অনুরোধ জানাতে থাকেন। বলাবাহুল্য, তারা এ অনুরোধ রক্ষা করেন।

সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সাল আরব আমিরাতের শেখ জায়েদ বিন আল নাহিয়ান, কুয়েতের আমিরসহ আরব নেতারা ১৯৫ যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তানি সেনাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাতে থাকেন। এজন্য তারা বাংলাদেশকে সর্বোপায়ে ও সর্বতোভাবে সাহায্য করার ওয়াদা করেন। শুনেছি আলজিয়ার্সে বাদশাহ ফয়সালের যে রূপ দেখা গেছে, লাহোরে এসে সেটা একেবারে বদলে যায়। এখানে তিনি ছিলেন একেবারে বিনয়ের অবতার। এটা সম্ভবত পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের মুক্ত করার চেষ্টার অংশ হিসেবে।

আরব নেতাদের মধ্যে সত্যিকার অর্থে ১৯৭৩-৭৪ সালের ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের দিনগুলোয় ইরাক ছাড়াও কুয়েত ও আরব আমিরাত পাশে দাঁড়িয়েছিল বাংলাদেশের। কুয়েত বিরাট অঙ্কের অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দেয় বৈদেশিক মুদ্রা হিসেবে ব্যবহারের জন্য। ইরাকও বিরাট অঙ্কের অর্থসহায়তা ঘোষণা করে। আমিরাতের সুলতান নাহিয়ান কম দামে বাকিতে প্রয়োজন অনুযায়ী পেট্রোলিয়াম সরবরাহের নির্দেশ দেন।

এদিকে কয়েকজন আরব নেতা যখন ১৯৫ পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর কাছে তদবির করছেন, অন্যদিকে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আজিজ আহম্মদ সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে বিষয়টি তুলে ধরার জন্য মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যান। ড. কামাল হোসেন তার বাংলাদেশ পয়েট অব ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস বইয়ে বলেছেন, পাকিস্তানের অনুরূপ চেষ্টা পুরো বিষয়টি বানচাল করে দিতে পারত। যা হোক, শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারের মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধীদের মার্জনা ভিক্ষার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ১৯৫ যুদ্ধাপরাধীকে মার্জনা ভিক্ষা দেয় এবং এটা সব পক্ষ স্বীকার করে নেয়।

আলজিয়ার্সের জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন বা লাহোরের ইসলামিক সামিটে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী সিদ্ধান্তগুলো আজও সমান গুরুত্ব বহন করে।

আলজিয়ার্সের শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করতে আসা কম্বোডিয়ার প্রিন্স নরোদম সিহানুক ও কিউবার ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকালে উভয় নেতাই বঙ্গবন্ধুর অগ্রগামী নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কাস্ত্রোর হিমালয়ের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর তুলনা তো এখন প্রবাদে পরিণত হয়েছে। আর প্রিন্স সিহানুকের প্রবাসী সরকারের স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত বঙ্গবন্ধু এখানেই গ্রহণ করেন।

আরও দুটো ঘটনা থেকে বঙ্গবন্ধুর অগ্রগামী নেতৃত্বের দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইসরাইলের বিরুদ্ধে সুয়েজ যুদ্ধ মিসর যখন ইসরাইলের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করার তুমুল লড়াইয়ে নিয়োজিত, সেই সময়ে বঙ্গবন্ধু বিমানে করে বিপুল পরিমাণ চা শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। মিসর এ শুভেচ্ছার কথা বিস্মৃত হয়নি। বঙ্গবন্ধুর মিসর সফর তার বড়ো প্রমাণ।

চিলির নির্বাচিত প্রগতিশীল প্রেসিডেন্ট আলেন্দেকে হত্যার পর বঙ্গবন্ধু অবিলম্বে নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি এ কথাও বলেছিলেন, একে একে আমাদের সবাইকে এভাবেই শেষ করা হবে। এবার টার্গেট করা হবে আমাকে। কী আশ্চর্য সেই ভবিষ্যদ্বাণী!

**লেখক: উপদেষ্টা সম্পাদক, দৈনিক জনকণ্ঠ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি থাকাকালে) প্রেস সচিব**

**গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য**
**পিআইবি'র প্রকাশনা**

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
**প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)**
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

# একষট্টিতেই বাঙালির স্বাধীনতার কথা বলেছেন বঙ্গবন্ধু

## —আমির হোসেন আমু

আমির হোসেন আমু; বাংলাদেশের রাজনীতির এক মহিরুহ। ভক্তদের কাছে রাজনীতির শুদ্ধপুরুষ তিনি। তার রাজনীতির হাতেখড়ি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাহচর্যে। রাজনীতিতে পরিপূর্ণ এই নেতা মনে করেন, বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্য তার জীবনের এক অনন্য অধ্যায়। সম্প্রতি নিরীক্ষা'য় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার স্মৃতিময় সেসব ঘটনা তুলে ধরেন। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন– বনশ্রী ডলি

**প্রশ্নঃ** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে প্রথম দেখা, পরিচয় ও বিশেষ স্মৃতি...

**আমির হোসেন আমুঃ** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রথম দেখি কলকাতায়। তিনি তখন কলকাতায় পড়ালেখা করেন। আমি মায়ের সঙ্গে কলকাতায় বেড়াতে গেছি। আমার নানা (একসময় এমএলএ) চৌধুরী সামসুদ্দিন আহমদের কলকাতায় একটি হোটেল ছিল। বঙ্গবন্ধুর মামা (তারু নামেই ডাকতেন সবাই) আমার তারু নানাও তখন কলকাতায়। তারু নানার সঙ্গে সেই হোটেলে গিয়েছিলাম। সকালের নাশতা খাচ্ছি, কিছুক্ষণ পর বঙ্গবন্ধু কয়েকজনকে নিয়ে হোটেলে

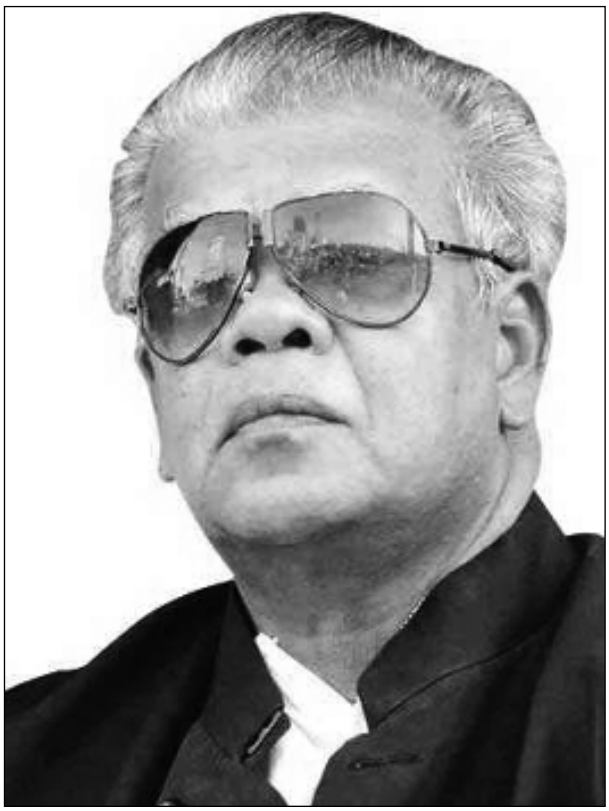

আসেন। তিনি আমাদের কাছের টেবিলটায় বসেন। আমাকে দেখে জানতে চাইলেন, ছেলেটি কে? আমার মায়ের নাম আকলিমা হোসেন বুড়ি। তারু নানা বললেন, ও তোমার বুড়ি আপার ছেলে আমু। বঙ্গবন্ধু আমাকে কোলে তুলে আদর করলেন। তারু নানা আমায় বললেন, উনি তোমার খোকা মামা।

পরেরবার তাঁকে দেখেছি ১৯৫৩ সালে। এর আগেও তিনি বরিশাল গেছেন; কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, ১৯৪৯ সালে বরিশাল আওয়ামী লীগের প্রথম কমিটি গঠনের সভাটি হয় আমাদের বাসায়। সেই কমিটির প্রধান হন আমার মামা মালেক খান।

১৯৫৩ সালে মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু বরিশালে যান, তখন আমি ক্লাস সেভেনে বা এইটে পড়ি। ভাষা আন্দোলনের নেতা কাজী গোলাম মাহবুব হককে প্রধান করে বরিশাল আওয়ামী লীগের কমিটি হবে। এ নিয়ে দলের মধ্যে কিছুটা গোলমাল বাধে। দুপুরে বঙ্গবন্ধু আমাদের বাসায় যান, মালেক খানের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বিকাল ৪টায় টাউন হলের সভায় যোগ দেন। মনে আছে স্পষ্ট– বঙ্গবন্ধু বক্তৃতায় বলছেন, 'ভাষা আন্দোলনের নেতা কাজী গোলাম মাহবুব তোমাদের ছেলে, নেতা হিসেবে দিতে চাই, তোমরা তারে নিতে চাও না।' কর্মীরা বলে উঠল, আমরা তারে চিনি না, আমাদের দেশের ছেলে, তা-ও জানি না। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'জানার তো দরকার নাই, ভাষা আন্দোলনের নেতা, তার নামের ওপরেই বরিশালবাসী চইলা যাবা।' কাজী গোলাম মাহবুবকে সভাপতি করে কমিটি হয়।

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, ১৯৫৪ সাল। আমার মামা ও খালা মনোনয়ন চেয়ে পাননি। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের কারণে কাজী গোলাম মাহবুব প্রার্থী হতে পারেননি।

এরপর পঞ্চান্নতে শেখ মুজিব বরিশাল গেলেন। আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম সর্বক্ষণ। সেদিন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলেন খান আবদুল গাফ্ফার, আবদুল মজিদ সিডনি, গফুর বেলুচ, আবদুল সাত্তার খান ছাড়াও কয়েকজন। সভা শেষে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে হেঁটে ফিরছি। বললেন, আমার ফরেস্ট অফিসার বন্ধুর বিয়ে আজ। এজন্য মিটিংয়ের তারিখটা আজকেই ফেললাম। বন্ধুর শ্বশুরের নাম ধরে তার বাড়িটা কোনদিকে জানতে চাইলেন। সেই বাড়িতে নিয়েও গেলাম তাঁকে।

ওইদিনেরই ছোট্ট ঘটনা, যা আমার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে। হেঁটে আসছি। উনি আমার হাত ধরে আছেন। পথে একটা ছেলে আমাকে আদাব দেয়। আমি বিরক্ত হয়ে বলে ফেলি, তোরে তো আমি চিনি না। এটা শুনে বঙ্গবন্ধু আমার হাতে এত জোরে চাপ দিলেন যে, মনে হলো হাতটা ভেঙে যাবে। বললেন, 'ছেলেটাকে ডাক দে। বল, আমি খেয়াল করি নাই, কেমন আছো, তোমার মা-বাবা কেমন আছেন।' তাঁর কথামতো তা-ই করলাম। পরে বললেন, 'ছাত্ররাজনীতি করবা, এগুলোর প্রয়োজন আছে। চিনি না বললে তোরে কোনো দিন সম্মান করবে না, কাছেও আসবে না। আর এই যে এখন কাছে ডেকে বললি কেমন আছ, এটা হয়তো সে তার মা-বাবার কাছে গিয়ে বলবে। এগুলা খুব ইফেকটিভ হয়।'

সেদিনই বিকালে বরিশাল ছাত্রলীগ অফিস উদ্বোধন করে সবার সঙ্গে কথা বলছেন বঙ্গবন্ধু। কর্মীরা অভিযোগ করেন, আমু তো ছাত্রলীগ করে না। শুনে বললেন, 'আমু তুই ছাত্রলীগ করিস না? ছাত্রলীগ তো আমার দল!' বললাম, না ছাত্রলীগ করি না। তাহলে কী করিস? বলে উঠি, আওয়ামী লীগ করি। আমার কথা শুনে সবাই জোরে হেসে উঠল। বঙ্গবন্ধু তখন বললেন, ঠিক আছে এখন থেকে আমু ছাত্রলীগ করবে।

১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ ভেঙে ন্যাপ গঠন হলো। রাজনৈতিক দলগুলোয় তখন ভাঙাগড়া চলছে। এর মধ্যে মামা কাজী গোলাম মাহবুব (আমার মামার শ্যালক) এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে কয়েকবার ঢাকায় এসেছি। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে, পিঠে বা মাথায় হাত রেখে কুশলবিনিময়– এ পর্যন্তই। তবে তাঁর সবকিছুই খেয়াল করেছি নীরবে। তাঁর প্রতি একধরনের আকর্ষণ কাজ করত। মানুষকে আকৃষ্ট করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। তাঁর কাছাকাছি থাকতে ইচ্ছে হতো। তিনিও আমাকে স্নেহ করতেন। বরিশাল গেলে বেশির ভাগ সময় দেখেছি দুপুরে খেতেন আমাদের বাসায়। তাঁর বোনজামাই আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায়ও যেতেন।

১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর মুসলিম লীগের কর্তৃত্বে থাকা পূর্ব বাংলার পৌরসভাগুলো ভেঙে দিয়ে আওয়ামী লীগের দায়িত্বে নিয়ে আসার দাবি শেখ মুজিব সমর্থন করলেও আতাউর রহমান খান ফাইল অনুমোদন করেননি। এটা নিয়ে শেখ মুজিব ও আতাউর রহমান খানের মধ্যে ভালোই মনোমালিন্য হয় তখন। কিছুদিন পর আতাউর রহমান খান বরিশালে গেলে এ নিয়ে উত্তেজনা দেখা দেয়। আমি তখন বরিশাল কলেজে মারদাঙ্গা গোছের হয়ে উঠেছি। আতাউর রহমান সাহেব আমাকে খেয়াল করেছেন এবং অধ্যক্ষকে বলেছেন তিনি আমার বাসায় যাবেন। আতাউর রহমান ছিলেন আমার বাবার বন্ধু। বাবার সঙ্গে দেখা করতে আমাদের বাসায় গেছেন। এদিকে আমিও তখন বাসায় হাজির। দেখি বাবার সঙ্গে গল্প করছেন। আমাকে দেখে জানতে চাইলেন, এই ছেলে কে? বাবা বললেন, আমার ছেলে। আতাউর রহমান আমাকে কাছে ডাকলেন, ভালো ভালো, বাসায় যেও। খেতে বসে বাবাকে বললেন, এই ছেলে ভালো রাজনীতি করবে। আমার কাছে পাঠিয়ে দিস। বাবা তার কাছে যেতে বললেন। কিন্তু আমি তো মনে মনে ঠিক করেছি যাব না। কারণ, আমার নেতা শেখ মুজিব।

আরেক দিনের ঘটনা। বরিশালে বাবা ও মামার (আমাদের যৌথ পরিবার ছিল) ওষুধ কোম্পানি ছিল, পরে এটা অপসোনিন নামে পরিচিত হয়। ১৯৫৬ সালে বঙ্গবন্ধু তখন শিল্পমন্ত্রী। বরিশালে যাওয়ার পর ওষুধ কোম্পানির কাজকর্ম দেখতে চাইলেন। আমি সব তাঁকে

দেখাই, দেখেশুনে বললেন, ওইটুকু দিয়ে কী হবে! ভালো করে কোম্পানিটা করতে হবে, যা প্রয়োজন ব্যবস্থা করে দেব। এটার প্রসপেক্ট আছে।

এরপর ১৯৫৭ সালের শেষদিকে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলন ঢাকার নওয়াবপুরের মাহবুব আলী ইনস্টিটিউটে। তখন পর্যন্ত পদপদবি ছাড়াই ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের কাজ করি। বরিশালের নেতা নুরুল ইসলাম মঞ্জু আমাকে চিরকুট লেখেন, আমার পছন্দমতো প্রতিনিধি নিয়ে যেন সম্মেলনে আসি। বুঝে নিলাম কী বলতে চেয়েছেন। দল ও দলের বাইরে আমার বিশ্বস্ত কয়েকজনকে নিয়ে সম্মেলনে আসি।

বরিশালের প্রতিনিধিরা ছিলাম ঢাকার আগামসি লেনের জমিদার বাড়িতে। তখন বরিশাল থেকে লঞ্চ এসে থামত নারায়ণগঞ্জ ঘাটে।

আমরা প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মঞ্জুর পক্ষে। আরেকজন প্রার্থী জনপ্রিয় ছাত্রনেতা আবু আওয়াল। হলের ভেতরে গিয়ে দেখি ক্যাম্পেইন চলছে, আবু আওয়ালের আবেগময় বক্তৃতা শুনে হাউস তার পক্ষে চলে যেতে পারে, তাই তাকে বক্তৃতা করতে দেওয়া যাবে না। কিন্তু আবু আওয়াল বক্তৃতা শুরু করেন, সঙ্গে সঙ্গে শোরগোল করে অধিকাংশ প্রতিনিধি বেরিয়ে যায়। আমিও বাইরে এসে মফস্বল প্রতিনিধিদের উদ্দেশে বক্তৃতা শুরু করি। হঠাৎ টের পাই পেছন থেকে আমার কাঁধে কে যেন হাত রেখেছে। দেখি কাজী গোলাম মাহবুব। বললেন, নেমে আয়, চল। গাড়িতে উঠিয়ে সোজা গেলেন বঙ্গবন্ধুর বাসায়। মনে মনে বললাম, এখানে নিয়ে এলেন কেন! বঙ্গবন্ধুকে কাজী গোলাম মাহবুব বললেন, এই যে শ্রীমান বক্তৃতা দিচ্ছিল, ধরে নিয়ে এসেছি। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'ওর দোষ কী, ওরে আগে কিছু জানাস নাই তোরা।'

বঙ্গবন্ধুর সামনেই গোলাম মাহবুব আমাকে জানান, প্রেসিডেন্ট হিসেবে রফিকুল্লাহ এবং জেনারেল সেক্রেটারি আজাহার আলী বঙ্গবন্ধুর অনুমোদিত প্রার্থী, মঞ্জু বা আবু আওয়াল নয়। কিছু না বুঝে তাকিয়েই থাকি। বঙ্গবন্ধু আমাকে বললেন, যা কাজ কর, পরে কথা হবে। সেই সম্মেলনে আমাকে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে সরাসরি যুক্ত করে নেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু বললেন, এটা ঠিক আছে।

এর পরপরই মার্শাল ল' শুরু। এরই মধ্যে ১৯৫৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এলো। দিবসটি পালনে দায়িত্ব নেওয়ার মতো বরিশালে তখন কোনো রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। সব নেতা গ্রেফতার ও পলাতক। দায়িত্ব পড়ে আমার ওপর। মার্শাল ল' না ভেঙে ওই বছর ২১ ফেব্রুয়ারি পালন করতে হয়েছে। মিছিল ও স্লোগান নয়। কেবল গান গেয়ে প্রভাতফেরি করে কলেজের শহিদ মিনারে ফুল দিয়েছি।

**প্রশ্নঃ** বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করেন কবে থেকে?

**আমির হোসেন আমুঃ** বঙ্গবন্ধু যখন গফুর বেলুচ, খান আবদুল গাফ্ফারসহ বরিশালে সভা করতে গেলেন। মূলত তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে রাজনীতিতে সক্রিয় হই। ১৯৬১ সালের কথা মনে আছে। বরিশাল ছিল স্টিমার জংশন। বঙ্গবন্ধু ঢাকা থেকে বরিশালে নেমে সারা দিন থেকে খুলনা মেইলে উঠতেন টুঙ্গিপাড়ার উদ্দেশে। সেদিন আমাদের বাসায় দুপুরে খেয়ে তাঁর বোনের বাসায় যান আমাকে নিয়ে। সাড়ে ৪টার দিকে রিকশায় লঞ্চঘাটে যাচ্ছি দুজন। যেতে যেতে বলছেন, 'দেখো পাকিস্তানিদের সঙ্গে আর থাকা যাবে না। এবারের আন্দোলন ফাইনাল। সেইভাবে গোছগাছ করো, আমি খবর দেব।'

কিছুদিন পর শেখ মনি চিঠি পাঠান, মামা দেখা করতে বলেছেন। ঢাকায় আসার পর শেখ মনি তার আরামবাগের বাসায় নিয়ে যান আমাকে। খাওয়ার টেবিলে অনেক কথাই হয়েছে। বললেন, আমি সব বলব না, কাল তাঁর (বঙ্গবন্ধু) কাছ থেকে শুনবে সব। পরদিন সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মতিঝিলে আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির অফিসে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করি। বললেন, আগেই বলেছিলাম ভালো মতো আন্দোলন করতে হবে। এর সময় হয়েছে, আন্দোলন করতে হবে সবাই মিলে। ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে মারামারি করেছ শুনেছি, এটা মিটিয়ে ফেলতে হবে। ফরহাদকে (কমরেড ফরহাদ) বলেছি, সে তার কর্মীদের বলে দেবে। ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে মিটমাট করে সবাই মিলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে। এই কমিটি ঢাকায় হয়েছে, সারা দেশেই হবে। বরিশালেও কমিটি করে আন্দোলন করতে হবে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশ– গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু কর, এটাই হবে আন্দোলনের স্লোগান।

বরিশাল ফিরে আমার নেতৃত্বে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কমিটি গঠন করি। কয়েক দিন পর আবারও খবর পাঠালেন দেখা করার জন্য। তড়িঘড়ি ঢাকায় আসি। বললেন, সোহরাওয়ার্দী সাহেব অ্যারেস্ট হয়ে যেতে পারেন। এবারে স্লোগান হবে, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ রাজবন্দিদের মুক্তি চাই, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু কর– এটাই হবে আন্দোলনের বিষয়। এদিকে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া স্বাধীনতার পক্ষে ধারাবাহিকভাবে লিখবেন, সেসব পেপার কাটিং দিয়ে মোটিভেট করবে সবাইকে। মানুষকে স্বাধীনতার পক্ষে মোটিভেট করবে, ছাত্রদের বোঝাবে আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য।

এটা উল্লেখযোগ্য, ১৯৬১ সালেই বাঙালির স্বাধীনতার কথা বলেছেন শেখ মুজিব। সেদিন শেখ মনি বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্টের লিফলেটও (বিএলএফ) দেন মনে পড়ছে। লিফলেট নিয়ে বরিশালে ফিরি।

কয়েকদিন পর সোহরাওয়ার্দী অ্যারেস্ট হন। শহর থমথমে। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার। আন্দোলনের দায়িত্ব দেওয়ার সময় বঙ্গবন্ধু আমাকে বলেছিলেন, বরিশালের এসপি ও ডিআইওর সঙ্গে যেন যোগাযোগ রাখি, তারা আমাদের লাইনের লোক, অর্থ এবং সবরকম সহায়তা করবে। কিন্তু বাপ-দাদার কাছে শুনেছি পুলিশকে বিশ্বাস করতে নেই। মাথায় সেটাই রয়ে গেছে। তাই তাদের সঙ্গে দেখা করিনি। এদিকে সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতার হওয়ার দিনই পুলিশের দুই কর্মকর্তা আমাকে এসকর্ট করে ফেলে আনঅফিসিয়ালি। যেখানেই যাই, ওরা সঙ্গে যায়। উপায় না দেখে ছাত্র ইউনিয়নের দুই নারী কর্মী কৌশলে আমাকে বের করে নিয়ে যায়। ছাত্র ইউনিয়নের সদস্যদের সঙ্গে নৌকায় বসে শুরু হয় গোপন সভা। আন্দোলনের কৌশল কী হবে? সেখান থেকে বের হয়ে রাতেই খবর পাঠাই– পরদিন সকালে মিছিল নিয়ে কলেজের দিকে আসতে হবে সবাইকে। পরদিন সকালে কলেজ থেকে বের হয়ে যত দোকানে আইয়ুব খান ও কায়েদে আজম জিন্নাহর ছবি পেয়েছি, আমি একাই সব ছবি ভাঙতে ভাঙতে এসেছি। অশ্বিনী কুমার টাউন হলে টানানো তাদের ছবিও ভেঙে ফেলি। বাটার দোকানে ভাঙার সময় ম্যানেজার অনুরোধ করে আমু ভাই, এটা করবেন না। আমি বলি, এই ব্যক্তিই মূল। ম্যানেজার তাকিয়ে থাকে। কারণ, আমাকে তো স্বাধীনতার আন্দোলনের বার্তা দিতে হবে জনগণকে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ, মাথায় তো সেটাই রয়েছে। আন্দোলন তো শুরু করেছি। এদিকে এসপির সঙ্গে যোগাযোগ রাখিনি।

বঙ্গবন্ধুর ভাই আবু নাসের তখন বরিশালে ছিলেন। এসপি আমার কর্মকাণ্ড সব বলেছেন তাঁকে। নাসের মামা বাড়িতে আমাকে না পেয়ে রেগে আগুন। কিছুক্ষণ পর জিপ গাড়িতে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুর বাড়িতে। ওখানে নেমেই শুরু করলেন, 'অই তোরে মুজিব ভাই বলে নাই এসপি সাহেবের সঙ্গে দেখা

করতে?' বললাম, সময় পাই নাই। এসেই তো ঝামেলায় পড়েছি, তাই দেখা করিনি। এখন করব। কয়েক মিনিট পর এসপি এলেন। আমাকে বলছেন, আমরা যতটা সম্মান করি নেতা শেখ মুজিবকে, আপনারা তা করেন না। আমরা তাঁর কথা মেনে চলি, আপনারা মানেন না। তিনি খবর পাঠিয়েছেন আপনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন, আপনাকে সবরকম সাহায্য করব, গাইড করব; কিন্তু আপনি তো কোনো যোগাযোগই করেননি। আন্দোলন শুরু করে দিলেন। দেশের কোথাও কি আন্দোলন হচ্ছে? আপনি শুধু শুধু আন্দোলন করে মারা যাবেন কেন? এসব আপাতত বন্ধ করেন। যতটা হয়েছে সামাল দেওয়া যাবে। কাল থেকে যদি আন্দোলন করেন, তাহলে গ্রেফতার হয়ে যাবেন, তা না করলে আমার চাকরি যাবে। মেনে নিলাম। চলে আসার সময় হাতে একটা প্যাকেট দিলেন ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের স্ত্রী। বুঝলাম আন্দোলনের জন্য অর্থ সাহায্য দিলেন। আন্দোলন স্থগিত করতে হয়েছে দুদিন পর। বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন বরিশালেই প্রথম এভাবে শুরু করেছিলাম। এর সাতদিন পর ঢাকাসহ সারাদেশে শুরু হয়।

**প্রশ্ন:** ততদিনে তো আপনি নেতা, ১৯৬৬'র ছয় দফার আন্দোলন নিয়ে বঙ্গবন্ধুর কী নির্দেশ ছিল?

**আমির হোসেন আমু:** ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলনের আগের কথা বলছি, আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে এনডিএফ বা ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট গঠন হয়। নয়জন নেতার বিবৃতি নিয়ে ইস্ট পাকিস্তানে গঠন হলো এনডিএফ। এনডিএফের প্রধান হন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সেসময়টায় এই নয় নেতা সারাদেশ সফর করেছেন। বরিশালে সব নেতা সফর করলেও প্রচার চালিয়েছি বঙ্গবন্ধুর নামেই। সেইবার সভা শেষে যখন তাদের বিদায় দিই, বঙ্গবন্ধু আমার হাতে কিছু টাকা দিতে চাইলেন। বললাম, আমার হাতে দিয়েন না। দলের কর্মী বারেককে দেখিয়ে বললাম, ওর হাতে দেন। তিনি বললেন, তুই টাকাটা দে। তাঁকে বলি, না আপনি নিজের হাতে দেন। বারেকের হাতে টাকাটা দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। বললেন, তুই অনেক বড়ো হবি। তুই পারবি!

আমার বুঝটা ছিল, আমি তো আছিই। অন্যরা যেন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। নেতা হিসেবে তাঁকে আপন মনে করে, কাছে পায়।

কিছুদিন পর বৃহত্তর বরিশালে এনডিএফের সর্বদলীয় কমিটি গঠনের সভা চলছে। প্রথমে আমার প্রস্তাব মতো কমিটি করার সিদ্ধান্ত হয়। সেদিনই বঙ্গবন্ধুর পরামর্শ নিয়ে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া গিয়েছিলেন বরিশালে। পরে তার প্রস্তাব মতো কমিটি হলো। প্রচারের দায়িত্ব পড়ে আমার ওপর।

এরপর এলো ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচন। আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্টকে কনভেনর করে নির্বাচনের জন্য জাতীয় কমিটি করি। আমার ওপর পড়ে প্রচারের দায়িত্ব। ফাতেমা জিন্নাহর সঙ্গে বরিশালে গিয়েছিলেন আজাদ কাশ্মীরের জেনারেল খুরশিদ আলম, পূর্ব বাংলার গভর্নর ছিলেন আজম খান এবং কোরায়শীসহ আরও কয়েকজন। সেদিনের বিকালের সভায় বঙ্গবন্ধুও ছিলেন।

সন্ধ্যার পর ডিসির স্পিডবোটে আজাদ কাশ্মীরের জেনারেল খুরশীদ আলম খান, আজম খান ও আমি নদীতে ঘুরছি। খুরশিদ আলম খান জানতে চাইলেন এখানে ফাতেমা জিন্নাহর রেজাল্ট কেমন হতে পারে। বললাম, ফিফটি-ফিফটি। তাদের ধারণা যে, চুয়ান্নর নির্বাচনে যেমন মুসলিম লীগের পতন হয়ে একচেটিয়া ভোট পেয়েছে যুক্তফ্রন্ট, এবারও তেমনই হবে। কিন্তু ফাতেমা জিন্নাহ তো পাকিস্তানের জিন্নাহর বোন। তিনি তো পাকিস্তান থেকে ভোট পাবেন। এই বাংলায় তো তিনি পাবেন না। এতে ওদের মন ভেঙে যেতে শুরু হলো। নির্বাচনের পর আজম খান আমাকে অভিনন্দন জানান, আমু তোমার প্রেডিকশন ঠিক ছিল।

যে কোনো কর্মসূচি বা প্রচারে বাঙালি জাতীয়তাবোধকে প্রাধান্য দিতে হবে– এটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর গাইডলাইন। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে শেরেবাংলার যে প্রস্তাব ছিল, এই বাংলা আলাদা স্টেট হবে। অর্থাৎ যে কোনো ইস্যুতে সেন্টিমেন্টকে ওইদিকে ধাবিত করা। যেমন– ছাত্র ইউনিয়ন যে কোনো ইস্যুতে ভিয়েতনামের উদাহরণ দিত। যে কোনো আন্দোলন-সংগ্রাম আর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে পূর্ব বাংলার মানুষ যে নির্যাতিত, শোষিত ও বঞ্চিত হচ্ছে, তা হাইলাইট করা, যাতে পাকিস্তানিদের ওপর সাধারণ মানুষের বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়– এটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা। সেই নির্দেশ মতোই কাজ করেছি। ফলে ছয় দফার দাবি মানুষের বুঝতে সুবিধা হয়েছে। আন্দোলন এত তাড়াতাড়ি দানা বেঁধেছে।

যে কোনো কর্মসূচি বা প্রচারে বাঙালি জাতীয়তাবোধকে প্রাধান্য দিতে হবে– এটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর গাইডলাইন। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে শেরেবাংলার যে প্রস্তাব ছিল, এই বাংলা আলাদা স্টেট হবে

আরেকটা কথা মনে পড়ছে। চুয়ান্নর নির্বাচনে যখন যুক্তফ্রন্টের বিজয় হয়, ৯২-এর (ক) ধারায় শেরেবাংলার মন্ত্রিসভা ভেঙে দিলেন, তখন শেরেবাংলাকে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'নানা আপনি বাঙালিদের ডাক দেন, আমি আছি আপনার পেছনে। এদের সঙ্গে থাকা যাবে না।' এই কথাটাই শেরেবাংলা আমাদের কয়েকজনকে বলেছিলেন ১৯৬১ সালে। শেরেবাংলা তখন খুব অসুস্থ। সাইফুর রহমান (বিএনপি নেতা), আমি এবং আরও কয়েকজন অসুস্থ শেরেবাংলাকে দেখতে যাই। শেরেবাংলা বললেন, 'আমি বাঁচব কি না সন্দেহ। দুইটা কথা বলে যাই, তোমরা দেখবে, আমার নাতি শেখ মুজিব আমার ওপর তাঁর খুব রাগ। গালাগালিও করে। কিন্তু তাঁর মাধ্যমেই এই দেশ স্বাধীন

হবে। আমাকে বলেছিল, আমি সাহস করি নাই। ও পারবে, যা আমি পারি নাই। আর আমার কবরে কখনো ফুল শুকাবে না।'

বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গে শেরেবাংলার কথাগুলো সত্যি হয়েছে, যা আজ ইতিহাস। অনেক আগে থেকেই নেতৃস্থানীয়দের বক্তব্যেই স্বীকৃত যে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা অর্জনের রাজনীতি করেছেন, সেই চেতনা ধারণ করেছেন। এ বিষয়ে প্রথম থেকেই তিনি সবার সঙ্গে আলোচনা করতেন এবং করণীয় ঠিক করতেন। প্রথমে সোহরাওয়ার্দীর আওয়ামী লীগ হলেও আওয়ামী লীগ বলতে শেখ মুজিব বা বঙ্গবন্ধু বলবে সবাই। সোহরাওয়ার্দীর ইমেজ আর শেখ মুজিবের সাংগঠনিক ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তিনি ইচ্ছে করলেই অল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি পূর্ব বাংলার সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন। দল সাজিয়েছেন স্বাধীনতায় বিশ্বাসীদের নিয়ে। সোহরাওয়ার্দী ১৩ মাস প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ১৩ জন আওয়ামী লীগের সদস্য নিয়ে। বঙ্গবন্ধুকে অফার দেওয়ার পরও তিনি মন্ত্রী হননি। শেখ মুজিব পাকিস্তানের কাদা গায়ে লাগাতে চাননি বলেই পাকিস্তানের মন্ত্রী হতে চাননি। বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক চরিত্রটাকে স্বচ্ছ রাখতে চেয়েছেন। কোনো প্রলোভনেই তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের পথ থেকে সরে আসেননি।

আগে যা বলছিলাম, ১৯৬৬ সালে ছয় দফা দেওয়ার পটভূমি আছে। বিষয়টা এমন– সোহরাওয়ার্দী মারা যাওয়ার পর এনডিএফ ভেঙে গেল। ইউনাইটেড ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট তো থাকল না। অন্য পার্টি রিভাইভ হতে থাকে। আওয়ামী লীগও রিভাইভ হওয়ার প্রসঙ্গ আসে।

১৯৬৪ সালের কথা, তখন ইস্ট পাকিস্তান আওয়ামী লীগ করার প্রস্তাবে আতাউর রহমানরা বাধা দেন। কারণ, আতাউর রহমান খানরা মনে করলেন, আওয়ামী লীগ গঠন হলে তো শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দল হবে আর এনডিএফ থাকলে তিনি নেতা থাকেন। অন্যরা বলল, সোহরাওয়ার্দী সাহেবের শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী দল হোক। শেখ মুজিব বললেন, এনডিএফ তো ছিল, সব দল মিলে এখন তো যে যার মতো দল গুছিয়েছে। আমি একলা কী করব। তখন মওলানা তর্কবাগীশ সভাপতি, বঙ্গবন্ধু সাধারণ সম্পাদক হয়ে এনডিএফে থাকলেন। কিছুদিন পর তারা পিডিএম করলেন। সেসময়টায় পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট পিডিএম হয়েছিল একটা। আমরা পিডিএম আওয়ামী লীগ নামেই কর্মসূচি পালন করেছি। কারণ, বঙ্গবন্ধুর তো চিন্তা একটাই– এনডিএফ থাকলে নিজস্ব পথে স্বাধীনতার দিকে এগোতে পারবেন না। তাই ওই পথেই পার্টি রিভাইভ করলেন।

১৯৬৫ সালে যেদিন পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়, সেদিন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে ছাত্রলীগের কাউন্সিল চলছে। হঠাৎ ব্ল্যাকআউট হয়ে গেল সব। তড়িঘড়ি কাউন্সিল শেষ করা হয়। মাজহারুল বাকী প্রেসিডেন্ট, আবদুর রাজ্জাককে সাধারণ সম্পাদক করে কমিটি হলো। ঠিক হলো পরের দিন সায়েন্স এনেক্সে জমায়েত হব। সেখান থেকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে নতুন কমিটি দেখা করতে যাব। সেখানে গিয়ে শুনি এনএসএফ ও ছাত্র ইউনিয়নের বেশ কজন মিলে ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুকে যা-তা গালাগাল করছে। ভারতের দালাল, পাক-ভারতের যুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করছে না দলটি, ইত্তেফাক কোনো লেখালেখি করছে না– এমন বিভিন্ন অভিযোগ করছে। আমি সেখানে যাওয়ার পর একটু যেন থামল। কারণ সেখানে যে এনএসএফ মূল নেতা ছিল, সে বরিশালের, আমার ভক্ত। তাকে নিয়ে বের হয়ে আসি। পরে বঙ্গবন্ধুর কাছে গেলাম। নতুন কমিটিকে অভিনন্দন জানান তিনি। আলোচনার একপর্যায়ে প্রতিবাদের বিষয়টি উত্থাপন করি আমরা, আওয়ামী লীগের বিবৃতি দেওয়া উচিত ভারতের বিরুদ্ধে। না হলে এই পরিস্থিতিতে আমরা তো বেকায়দায় পড়েছি। বঙ্গবন্ধু বললেন, নো। আমরা তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করি। তখন তিনি বলেন, এই যুদ্ধের পর এমন জিনিস দেব, তখন তোমরা ফুলের মালা পাবা। বাংলাদেশ তোমাদের লুফে নেবে। আমরা বললাম, ততদিন পর্যন্ত তো টিকে থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হবে। ছাত্রলীগ করতে হবে। এসব কথা যখন চলছে হঠাৎ করে বললেন, ঠিক আছে একজন পাকিস্তানিকে আওয়ামী লীগে জয়েন করিয়েছি। তাকে দিয়ে একটা স্টেটমেন্ট দেওয়াব। সেসময়টাতে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সংসদের ডেপুটি লিডার ছিলেন শাহ আজিজ। তখনই তিনি শাহ আজিজকে ফোন করেন এবং একটা স্টেটমেন্ট দিতে বলেন। বললেন, যাও তোমাদের কাজ করে দিলাম।

তিনি স্টেটমেন্ট দেওয়ালেন, বাট হি ডিড নট, মাইন্ড ইট। কারণ এই যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তিনি তাঁর ছয় দফা দিলেন, যা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

এরপর বললাম, তাহলে ইত্তেফাকের ভূমিকা? বলেন, এটা আমি জানি না। ওইটা মানিক ভাইয়ের ব্যাপার, মানিক ভাই-ই বলবে।

সবাই গেলাম ইত্তেফাক অফিসে। ওখানে এক ঘণ্টা মানিক ভাইয়ের সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধ। মানিক ভাইয়ের এককথা, পত্রিকা চালাচ্ছে মুজিব ভাই। ইত্তেফাক কেবল মুখপত্র। উনি যেভাবে বলবেন, সেভাবেই চালাতে হবে। উনি লিখতে বললে লিখব। বললাম, উনিই তো পাঠিয়েছেন। মানিক ভাইয়ের কথা, পাঠালে ও বললে হবে না, বঙ্গবন্ধুর লিখিত দিতে হবে। অনেক বলার পর মানিক ভাই ফোন দিলেন বঙ্গবন্ধুকে। ওদিক থেকে কী বললেন জানি না। মানিক ভাই বললেন, আপনারা যান আমি দেখছি।

পরদিন ইত্তেফাকের পাতায় বাঁ পাশে ছোট্ট নিউজ ছাপা হয়। তখন ইত্তেফাককে বঙ্গবন্ধু তাঁর লাইনে পরিচালনা করছেন। পাক-ভারত যুদ্ধের সময় এসব চলছিল আমাদের। এখন যেটা বঙ্গভবন, সেসময় সেটা গভর্নর হাউস। সেখানে মোনায়েম খান সব দলের মিটিং ডাকলেন। সভায় যখন ভারতের বিরুদ্ধে রেজুলেশন দেওয়া হলো, বঙ্গবন্ধু বললেন, এটা দুই নম্বর রেজুলেশন। কারণ, ভারত যদি আমাদের বর্ডার আক্রমণ করে, তাহলে পূর্ব বাংলা তো খালি হাতে প্রতিহত করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে প্রথমেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কনডেম করতে হবে যুদ্ধের সময় পূর্ব বাংলাকে নিরাপত্তাহীনতায় রাখার কারণে। এটা প্রথম রেজুলেশন হতে পারে। পরে হবে ভারতের বিরুদ্ধে রেজুলেশন।

এই যুদ্ধের সময় তাসখন্দ চুক্তি নামে একটা চুক্তি হয়েছিল। এর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের একটা সেন্টিমেন্ট ছিল। এই সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে অল পাকিস্তানের সব বিরোধী দল আন্দোলন করে আইয়ুব খানকে সরিয়ে ক্ষমতা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে। প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে লাহোরের পিন্ডিতে পাকিস্তানের সর্বদলীয় সম্মেলন ডাকা হয়। সেই সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বললেন, হ্যাঁ, আপত্তি নেই। ক্ষমতা না হয় পেলাম; কিন্তু আফটার দ্যাট? এরপর কী হবে। আমাদের দেশের পরিচয় কী হবে, একটা পরিচয় তো দিতে হবে! এক্ষেত্রে আমাদের স্বায়ত্তশাসন এবং ছয় দফা দাবি আছে। তা মানতে হবে। সেই ছয় দফা উত্থাপন করলেন। ছয় দফা উত্থাপন করে তিনি আরও বললেন, পাখতুন, বেলুচিস্তান, সিন্ধু স্বায়ত্তশাসন দাবি করে। তারাও ইচ্ছে করলে এ প্রস্তাব বা দাবিগুলো গ্রহণ করতে পারে। ইট নট ফর অনলি বাংলাদেশ। এটা সমন্বিত হতে পারে। তবে এই ছয় দফা তখন বেলুচিস্তান, পাখতুন ও সিন্ধু পাকিস্তানের কেউই সমর্থন করেনি। এমনকি বাংলাদেশ থেকে যে নয়জন নেতা সম্মেলনে গিয়েছিলেন, তাঁরাও বেশির ভাগই সমর্থন করেনি। নয় নেতার মধ্যে ছিলেন মাহমুদ

আলী, আতাউর রহমান খান, আমীরুল হক চৌধুরী, নান্না মিয়া, সম্ভবত শাহ আজিজুর রহমান, আরও কয়েকজন। তখন বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলার মতো কে আছেন, তা ভবিষ্যতে প্রমাণ করতে হবে। কারণ যে নেতারা এখান থেকে গিয়েছিলেন, তাদের কোনো সংগঠিত দল ছিল না, লোকবলও ছিল না। বিবৃতিসর্বস্ব নেতা ছিলেন তারা। সেখান থেকে ফিরে এলেন। এই ছয় দফা আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে পাস হলো। সেবার আওয়ামী লীগের কমিটির সভাপতি হন বঙ্গবন্ধু, সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন তাজউদ্দীন আহমদ। এরপরই বঙ্গবন্ধু ছয় দফা নিয়ে সারাদেশে ঝটিকা সফর শুরু করলেন। যেখানেই ছয় দফা নিয়ে বক্তৃতা করতেন, সেখানেই তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হতো। অন্যদিকে ছয় দফার দাবিতে আন্দোলনকে অস্ত্রের ভাষায় মোকাবিলা করার হুমকি দিলেন আইয়ুব খান। বামপন্থিদের একাংশ দাবিগুলোকে সিআইএ'র দলিল বলে আখ্যা দিল। তা সত্ত্বেও সারাদেশেই ছয় দফার পক্ষে জনমত গড়ে উঠছিল।

**প্রশ্ন:** ছয় দফা প্রচারে আপনার প্রতি বঙ্গবন্ধুর বিশেষ কোনো নির্দেশনা ছিল কি?

**আমির হোসেন আমু:** আমি ১৯৬৫ সালে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক হই। তখন থেকেই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা অনুযায়ী বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনার উন্মেষ ঘটানোর উদ্দেশ্যে বিশেষ কিছু কর্মসূচি হাতে নিই। যেমন ২১ ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে পাক্ষিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে ছাত্রলীগ ঢাকা নগরীর দোকান, অফিস ও প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ডগুলো বাংলায় লেখা, গাড়ি থামিয়ে নম্বর প্লেট বাংলা সংখ্যায় লেখার ক্যাম্পেইন শুরু করি। এসবই ছিল ছয় দফা দাবির পক্ষে জনমত গঠনের ক্ষেত্র তৈরির কাজ। এছাড়া লিফলেট, পোস্টার, আলোচনা ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ তো চলছিলই। এর কিছুদিন পরই ছয় দফা দাবি নিয়ে জোর প্রচারের কাজ শুরু করি। খুব কম সময়ের মধ্যেই ছয় দফা বাংলার মুক্তিসনদ বা বাংলার মেঘনা কার্টা নামে প্রতিষ্ঠিত হলো। এসবই তো এখন ইতিহাস, যে ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার জীবনে বঙ্গবন্ধুর আদেশ-নির্দেশের টুকরো টুকরো স্মৃতি। যখন যা বলেছেন, সেটাই ছিল করণীয়। সময়টাই এমন ছিল যে অন্যকিছু ভাবা, অন্যদিকে তাকানোর কথা মাথায় আসেনি।

তখন বঙ্গবন্ধুকে 'বঙ্গশার্দূল' নামে ডাকা হতো। উনি তো ১৯৬১ সালেই আমাকে বরিশালে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনের নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, এবার থেকে একটা বিষয় মাথায় নিয়ে আন্দোলন এগিয়ে নিতে হবে, তা হলো স্বাধীনতার আন্দোলন।

১৯৬৬ সালের ৬ মে নারায়ণগঞ্জে সভা শেষে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। টানা দুই বছর কারাগারে রাখার পর '৬৮ সালে তাঁকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ক্যান্টনমেন্ট কারাগারে নিয়ে যায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হিসেবে। এরই মধ্যে ছয় দফা এমনভাবে মানুষের মনে জায়গা করেছিল যে, ছয় দফার বিপক্ষে আতাউর রহমান খানরা যখন পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট করেন, তখন সেই আট দফার মধ্যে ছয় দফাকে যুক্ত করতে বাধ্য হয়। ১১ দফার মধ্যেও ছয় দফা ছিল। সেসময় যে কোনো বক্তৃতা, বিবৃতি ও আলোচনাসভা-সমাবেশে যা কিছু বলুক, ছয় দফার কথা বলতেই হতো। তা না হলে জনগণ মানতে চাইত না। ছয় দফার পক্ষে, শেখ মুজিবের পক্ষে জনমত গড়ে ওঠে। আইয়ুব খান প্রথমে শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি দিতে চাইলেন। তাতে আওয়ামী লীগ রাজিও হলো; কিন্তু বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী ফজিলাতুননেছা মুজিব বললেন, না, প্যারোলে নয়। সব রাজবন্দিকে সসম্মানে মুক্তি দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত তা-ই হলো। উনসত্তরে মুক্তি পাওয়ার পরই নির্বাচনের তোড়জোড়, সত্তরের নির্বাচনের কথা বলছি।

**প্রশ্ন:** ১৯৭০ এর নির্বাচনের আগে আপনার প্রতি বঙ্গবন্ধুর পরামর্শ কী ছিল?

**আমির হোসেন আমু:** আমি কখনই ভাবিনি নির্বাচন করব, এমপি হব। এই নির্বাচন আমার জীবনে বিশেষ ঘটনা। ১৯৬৯-এ বঙ্গবন্ধু কারাগার থেকে বের হয়ে বললেন, বরিশালে ওয়ার্ড কমিটিগুলো ভালো করে গঠন কর। তোকে নমিনেশন দেব, নির্বাচন করতে হবে। শুনে আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম মনে মনে। ভয়ে অস্থির, কীভাবে নির্বাচন করব। কেবল পাস করে বেরিয়েছি, বরিশাল বার-এ জয়েন করেছি। তখনও ছাত্রলীগ নেতার ভাবসাব যায়নি। তারপর ডিরেকশন দিলেন, একটা বড়ো চেম্বার নাও, বিশাল সাইনবোর্ড থাকবে। বড়ো সেক্রেটারিয়েট টেবিল থাকবে, আলমারি থাকবে। সেখানে বই বোঝাই থাকবে। তোমার যারা চ্যালাপ্যালা আছে, চ্যালাপ্যালা শব্দটাই বললেন, তারা এখন থেকে তোকে তরুণ আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট আমির হোসেন আমু বলে ডাকবে। ছাত্রলীগ নেতা নয়, স্লোগানটা হবে তরুণ আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট আমির হোসেন আমু। চেম্বার করার জন্য থোক টাকাও দিলেন। আমি তাঁর কথামতো চেম্বার সাজালাম। পোলাপানকে জানালাম এখন থেকে আইনজীবী আমির হোসন আমু বলতে হবে। সেভাবেই প্রস্তুত হই। নমিনেশন দিলেন, নির্বাচিত হলাম। সেই নির্বাচনে ৩০০ আসনের ১৬৭টি আসন পেয়ে আওয়ামী লীগের বিজয় হলো।

১৯৬৯-এ বঙ্গবন্ধু কারাগার থেকে বের হয়ে বললেন, বরিশালে ওয়ার্ড কমিটিগুলো ভালো করে গঠন কর। তোকে নমিনেশন দেব, নির্বাচন করতে হবে। শুনে আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম মনে মনে। ভয়ে অস্থির, কীভাবে নির্বাচন করব

১৯৭০-এর নির্বাচনের আগে অন্য রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন বয়কট করার স্লোগান দিয়েছে। কোনো দল বলেছে লিগ্যাল ফ্রেমের আন্ডারে নির্বাচন করা যায় না। ভাসানী ন্যাপের স্লোগান ছিল, 'ভোটের আগে ভাত চাই, ভোটের বাক্সে লাথি মারো।' অ্যান্টি নির্বাচন ক্যাম্পেইন ছিল। কারণ, ভাসানী কাগমারী সম্মেলনে আওয়ামী লীগ ভেঙে ন্যাপ করলেন।

তবে এটা সত্যি, দুই দলের দুই নেতা হলেও বঙ্গবন্ধু আর ভাসানীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্ক ছিল গভীর। ভাসানী নিজের ছেলেদের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন, গুরুত্ব দিতেন বঙ্গবন্ধুকে। বঙ্গবন্ধুও মওলানা ভাসানীকে শ্রদ্ধা করতেন এবং নেতা হিসেবে মেনেছেন।

নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজয় পাওয়ার পর রেফারেন্ডাম হিসেবে বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দাবির কথা বললেন। আরও বললেন, বাংলার মানুষের পক্ষে কথা বলার অধিকার কার আছে, তা নির্বাচনে প্রমাণিত। তাই ছয় দফার দাবি অনুযায়ী আমাদের কাছে ক্ষমতা দিতে হবে। ৩ মার্চ ১৯৭১ ঢাকায় সংসদ বসার কথা। পাকিস্তান থেকে ৩৫ জন এমএলএ ঢাকায় এসেছিলেন সংসদে যোগ দিতে। কিন্তু হঠাৎ ১ মার্চ সংসদ অধিবেশন বন্ধ ঘোষণা দেন জেনারেল ইয়াহিয়া। সংসদ অধিবেশন বন্ধ ঘোষণা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকাসহ দেশের সব শহরের রাস্তায় পাকিস্তান পতাকা পোড়ানো শুরু হয়। 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর; তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব; জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠে ঢাকা শহর, মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। বঙ্গবন্ধু আমাদের তৈরি করেছেন আর আমরা এতদিন যে মানুষকে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার পক্ষে তৈরি করেছিলাম, এর সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ আবারও পাওয়া গেল জনতার এই রুদ্ররোষে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনতার রাস্তায় নেমে আসা, বাংলাদেশের পক্ষে স্লোগান– সবই ছিল এতদিনের রাজনৈতিক কর্মসূচির ফসল। পহেলা মার্চেই বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দেন হরতাল চলবে, ৩ মার্চ পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করব। ৭ মার্চে তো বঙ্গবন্ধু মূল কর্মসূচি ঘোষণা করলেন। সেদিনের ১৭ মিনিট ৩০ সেকেন্ডের ভাষণে তিনটা ভাগ/পার্ট ছিল। প্রথম বললেন, 'আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি...।' দ্বিতীয় পার্ট হচ্ছে– ২৩ বছরের পাকিস্তান শাসন-শোষণের চিত্র, বাঙালির দুঃখ-দুর্দশার ইতিহাস, একাত্তরের ১ মার্চ থেকে ৭ মার্চ পূর্ব বাংলায় বিভিন্ন জায়গায় গোলাগুলি ও নির্যাতনের চিত্র। এরপর তিনি করণীয় সম্পর্কে বলেছেন, 'প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল। এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব– এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দিলেন, যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

**প্রশ্ন:** ৭ মার্চের ভাষণের পর মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন?

**আমির হোসেন আমু:** ৭ মার্চের ভাষণ ছিল প্রকাশ্যে জনসাধারণকে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার আদেশ। আর আমরা যারা দলীয় কর্মী ছিলাম, তারা জানতাম এমন আদেশ আসতে পারে। কখন দিবে, সে অপেক্ষায় ছিলাম। আমাদের প্রস্তুতিও শুরু হয়। ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারির পর থেকেই সশস্ত্রযুদ্ধের জন্য তৈরি হতে থাকি। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ছয় দফা কেবল আওয়ামী লীগের নয়। এ নির্বাচনের ফল প্রমাণ করে তা জনগণের ম্যান্ডেট। তাই যেভাবেই হোক দেশকে স্বাধীন করতেই হবে, তা বাস্তবায়ন করতে হবে। ঢাকায় ২১ ফেব্রুয়ারি পালনের পরপরই বরিশালে এসে আনসার ও অ্যাডজুট্যান্ট বাহিনী, কলেজগুলোয় ইউটিসি ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছাত্রদের জড়ো করতে থাকি। অন্যদের গোপন প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করি। এমনইভাবে সারাদেশেই মুক্তিযোদ্ধা, গেরিলাযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ চলছিল। তা না হলে এত তাড়াতাড়ি এমন বাহিনী তৈরি করা সম্ভব হতো না। সেসময়টায় অসহযোগ আন্দোলনে বাঙালিকে আরও একাট্টা করলেন বঙ্গবন্ধু। ৩ মার্চ থেকে মূলত বঙ্গবন্ধুর নিয়ন্ত্রণেই চলছিল বাংলাদেশ। পাকিস্তান থেকে যারা এসেছিলেন, তারা একটা কথাই বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবের শাসন চলছে। এমএলআর অর্থাৎ মার্শাল ল'র রেজুলেশনে নয়, সবকিছু চলছে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর থেকে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া এএলআর বা আওয়ামী লীগ রেজুলেশন অনুযায়ী। ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া কোথাও পাকিস্তানের পতাকা উড়ছে না।

২৫ মার্চে বরিশাল ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এক মাস বরিশালকে শত্রুমুক্ত বা স্বাধীন রাখতে পেরেছিলাম। মে মাসে সীমান্ত পার হয়ে কলকাতায় যাই। সেই ২১ নম্বর বাড়ি– সানি ভিলায়। যেখানে মুজিব বাহিনীর হেডকোয়ার্টার ছিল। কয়েকদিন পর আমার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর দুই পুত্র শেখ কামাল ও শেখ জামাল ছিল। কিছুদিন পর শেখ কামাল আর্মি ট্রেনিংয়ে চলে গেল। জামাল মুজিব বাহিনীর কাজে সম্পৃক্ত ছিল। কলকাতায় থেকেই বরিশালের পাঁচটি জেলার ছেলেদের মুক্তিযুদ্ধে যুক্ত করা এবং ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করার কাজ করেছি। মাঝেমধ্যে ট্রেনিং ক্যাম্প ও সীমান্তে যেতাম। একদিকে মামা, অন্যদিকে নেতা– আমার ছিল দুই ধরনের অনুভূতি। এর চেয়েও বড়ো ছিল তাঁর আদেশে মুক্তিযুদ্ধ করা। দেশ স্বাধীন করতে হবে, মরি আর বাঁচি। খেয়ে না খেয়ে দিন ও মাস গেছে টের পাইনি। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে একদিনও দুই বেলা ঠিকঠাক খেয়েছি, এমনটা নেই। যখনই হিলি সীমান্ত বা অন্য সীমান্তে এসেছি, দেশের মাটি স্পর্শ করে মাথায় ঠেকাতাম, চুমু খেতাম। তবে এত তাড়াতাড়ি দেশ স্বাধীন হবে ভাবিনি। সব কষ্ট শেষ হলো ১৬ ডিসেম্বর দেশটা স্বাধীন হয়েছে শুনে। দেশের বিভিন্ন জায়গা মুক্ত হয়েছে। রংপুর, সাতক্ষীরা গেছি, সেখানের সভাগুলোয় ছিলাম। ১০ তারিখে যশোর মুক্ত হয়। সেখানে কারাগারে আমার ১১০ জন ছেলে মুক্তিযোদ্ধা বন্দি ছিল। তাদের মুক্ত করে অস্ত্রসহ ট্রাকে করে পাঠিয়ে কলকাতায় ফিরে যাই। সে এক এমন অনুভূতি, তা বলা অসম্ভব। মামা ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বেঁচে ফিরবেন তো, কবে ফিরবেন। আমাদের কী হবে, দেশটার কী হবে– এমন ভাবনা নিয়ে ২০ ডিসেম্বর দেশে ফিরে আসি।

**প্রশ্ন:** দেশ স্বাধীন, পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করছে– এই খবর শোনার পর অনুভূতির স্মৃতি আজ ৫০ বছর পর মনে পড়ে?

**আমির হোসেন আমু:** বাংলাদেশ এত তাড়াতাড়ি স্বাধীন হওয়ার কথা ছিল না। ধরেই নেওয়া হয়েছিল, দুই বছর যুদ্ধটা চলবে। যে কোনো কারণেই হোক সিদ্ধান্ত হয় এই যুদ্ধ এভাবে চলতে দেওয়া যায় না। এটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। এরপর ৩ ডিসেম্বর প্রথম ব্ল্যাকআউট হয়। এরপর ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বক্তৃতা দিলেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেন। বুঝতে পারছিলাম বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পথে। ১৬ ডিসেম্বর সারেন্ডার অনুষ্ঠানের খবর কলকাতায় বসেই পাচ্ছিলাম। সব জায়গার সঙ্গেই আমাদের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ছিল। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম খবর পেতাম। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলি, তোফায়েল আহমেদ ও সিরাজুল আলম খান বেঁচে আছেন, এটা তাদের স্মরণ আছে কি-না,

জানি না। আমরা তখন খুবই উদ্বেগের মধ্যে আছি। মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিংয়ের প্রধান ভারতের জেনারেল মি. উবানের এক আধ্যাত্মিক সাধু (পাহাড়ে বসে ধ্যান করতেন) ছিলেন। সেই সাধু বলেছিলেন, বঙ্গবন্ধু বেঁচে আছেন। তিনি জীবিত অবস্থায় ফিরবেন এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিন বছর দায়িত্ব পালন করে পরে মারা যাবেন।

বঙ্গবন্ধু জীবিত ফিরে এলেন, প্রধানমন্ত্রীও হলেন। আমি ভাবলাম যে বেঁচে গেলেন, এবার আর কোনো ভয় নেই। ওই সাধু বেটার কথার কে পাত্তা দেয়। কিন্তু ওই যে! ঘুরেফিরে কিন্তু সাড়ে তিন বছর পর রাষ্ট্রপ্রধান থাকা অবস্থায়ই নিহত হলেন জাতির পিতা। সাধুর কথা সত্যি হয়ে গেল!

যাক সেকথা– ২০ ডিসেম্বর ফিরে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বরিশালের জেলাগুলো ঘুরে সব দেখলাম। ২৬ ডিসেম্বর ঢাকায় এসে তাঁর পরিবারের সঙ্গে মানে মামির সঙ্গে দেখা করি। তখনও তাঁরা ৩২ নম্বরের বাড়িতে উঠেননি। অন্য একটা বাড়িতে ছিলেন। আমি তখন খালার বাসায় আগামসি লেনে থাকি। স্বাধীনতার আনন্দ যতখানি ছিল, বঙ্গবন্ধুর জন্য অস্থিরতা আর দুশ্চিন্তা ছিল এর চেয়ে বেশি।

মনে আছে, বাহাত্তরের ৮ জানুয়ারি নওয়াবপুরে চাইনিজ রেস্টুরেন্ট চৌচিংয়ে বসে আড্ডা দিচ্ছি, খাচ্ছি। তখন রেডিওতে শুনলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন, প্লেনে রওয়ানা দিয়েছেন। শুনে তো আরও অস্থিরতার মধ্যে পড়লাম। খাওয়া ফেলে মামির সঙ্গে (বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব) দেখা করতে যাই। ততক্ষণে সেই বাসায় আওয়ামী লীগের অনেক নেতা এসেছেন। তারপর শুনলাম তিনি লন্ডনে আসছেন। আমাদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ছিল সেসময়। নেতৃস্থানীয় দু-একজনের মত ছিল তিনি যেন সরাসরি দেশে আসেন। ভারতে অবস্থান করা ঠিক হবে না। কিন্তু আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, এ বিষয়টি বঙ্গবন্ধুর ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত, তিনি যা ভালো মনে করবেন, তা-ই হবে। তখন কেবিনেট মেম্বারদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এএইচএম কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনুসর আলী ও খন্দকার মোশতাক।

১০ জানুয়ারি বিমানবন্দরে জনসমাগমে আমিও ছিলাম। সেখানে কোনো কথা হয়নি। কথা হয়েছে বাসায় আসার পর। দেখা হওয়ার পর সবাই কেমন আছে জানলেন। আমার মামা জাহিদ হোসেন জাহাঙ্গীর জীবিত আছেন কি না, জানতে চাইলেন বিশেষ করে।

**প্রশ্ন:** মুক্তিযুদ্ধের আগের নেতা বঙ্গবন্ধু এবং রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু– এ দুই সময়টাতে তাঁকে কেমন দেখেছেন...

**আমির হোসেন আমু:** মুক্তিযুদ্ধের আগের নেতা বঙ্গবন্ধু যেমন ছিলেন, রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার পরও এর খুব একটা পরিবর্তন দেখিনি। কর্মী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে আগে যেমন কথা বলতেন, ব্যবহার করতেন, কথা শুনতেন; রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার পরও সেই বঙ্গবন্ধুই থেকেছেন। তিনি রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে যেভাবে গোছানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তা ছিল অসাধারণ। পৃথিবীর যেসব দেশ যুদ্ধ, বিপ্লবের পরে পুনর্গঠিত হয়েছে, সেসব দেশের তুলনায় বাংলাদেশ গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর সফলতার পরিচয় পাওয়া যায় বেশি। হ্যাঁ, সেজন্যই বাংলাদেশ এমন একটা সংবিধান এত তাড়াতাড়ি পেয়েছে। সংবিধানের চার মূলনীতিও তিনি প্রণয়ন করেছেন তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ও ধারা অনুযায়ীই। তিনি গণতন্ত্রের জন্য প্রথম থেকে লড়েছেন। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা চাইতেন। ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী ছিলেন আজীবন। জাতীয়তাবাদের চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে বাঙালিকে জাগিয়ে তুলেছেন। তাঁর এ সবই তিনি সংবিধানের মৌলিক বিষয় করেছেন। তিনি সারাজীবন বাঙালি ও এদেশের মাটির জন্য যা উপযুক্ত মনে করেছেন, তা-ই তিনি করেছেন। অন্য কোনো দেশের বা শক্তির প্রভাব বা সুবিধা চিন্তা করেননি। তাঁর মতো সাহসী ও নির্লোভ নেতার পক্ষে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়েছে, যা ইতিহাসে বিরল।

মুক্তিযুদ্ধের আগের নেতা বঙ্গবন্ধু যেমন ছিলেন, রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার পরও এর খুব একটা পরিবর্তন দেখিনি। কর্মী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে আগে যেমন কথা বলতেন, ব্যবহার করতেন, কথা শুনতেন; রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার পরও সেই বঙ্গবন্ধুই থেকেছেন

**প্রশ্ন:** এই নীতিগুলোকে বাস্তবায়ন করার জন্যই কি বাকশাল?

**আমির হোসেন আমু:** নাহ, সেজন্য তিনি বাকশাল করেননি। বাকশাল ছিল জাতীয় ঐক্য, একটা প্ল্যাটফরম। এটা কোনো দল ছিল না। বাকশাল তো ঠিকভাবে প্রকাশ পায়নি। সেজন্য বাকশালকে গালি দেওয়া সহজ, এটাকে ভূতও বানানো যায়। এটা ভালোভাবে প্রকাশ হলে বিচারবিশ্লেষণ করা যেত। তবে দু-একটা ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন বঙ্গবন্ধু বলতেন, শোষিতের গণতন্ত্র চাই। বাকশালের মাধ্যমে শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তিনি। একটা উদাহরণ দিই– একটা নির্বাচন হবে, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভাইস প্রেসিডেন্ট হলেন। তার সিট খালি হয়ে গেল। মঞ্জুর হোসেনের সিটও খালি হলো। এখানে আওয়ামী লীগ থাকলে মনোনয়ন দেওয়া হতো আওয়ামী লীগের প্রার্থী সৈয়দ নজরুল ইসলামের ভাইকে, মার্কা হতো নৌকা আর জয়ীও হতেন তিনি। কিন্তু বাকশালের নিয়ম অনুযায়ী সেখানে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ পান পাঁচজন। তাদের মধ্যে সমাজকর্মী, চিকিৎসক, স্কুলশিক্ষক ও ন্যাপ নেতা ছিলেন এবং সৈয়দ নজরুল

ইসলামের ভাই প্রার্থী ছিলেন। সেই নির্বাচনে সৈয়দ নজরুল ইসলামের ভাই পরজিত হলেন। এর অর্থ দাঁড়ায়, সাধারণ মানুষ পছন্দমতো তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারার সুযোগ রাখা। এটাই রিয়েল ডেমোক্রেসি বা সত্যিকার গণতন্ত্র। বাকশাল করার পর চিহ্নিত মার্কাগুলো উঠিয়ে দেওয়া হয়। যেমন দাঁড়িপাল্লা, নৌকা– এসব ছিল না। এটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর বাকশাল গণতান্ত্রিক সিস্টেম। এই সিস্টেমটাই ওয়ান-ইলেভেনের বা এক-এগারোর পরে ২০০৮ সালে যখন নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আমরা বসলাম, তখন শামসুল হুদা, এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছিলেন, দ্যাট ওয়াজ দ্য বেস্ট সিস্টেম। যে সিস্টেমে একটা প্ল্যাটফরমে সব প্রার্থী এসে কথা বলবেন। নির্বাচন কমিশন একটা পোস্টার বা লিফলেটে সবার নাম-পরিচয় দিবেন। আলাদা ক্যাম্পেইন করবে না, আলাদা লিফলেট, পোস্টার করতে হবে না, অর্থ খরচের ঝামেলা থাকবে না। নির্বাচন কমিশন আয়োজিত সম্মিলিত সভায় প্রার্থীরা যে যার কথা বলবেন, ভোট চাইবেন। কিন্তু এটা তো করা গেল না। এটাই বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন বাকশালের মাধ্যমে। আরেকটা হলো, তিনি গ্রামভিত্তিক সমবায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সাধারণত দেখা যায়, একটা গ্রামে কারও বাড়ি আছে, তার বাড়ির পাশে একটু জমি খালি পড়ে আছে, সঙ্গে একটা পুকুর, মসজিদ, কবরস্থান, ডোবা, নালা। এমন একশ বাড়ি আছে। এতে অনেক জমি নষ্ট হয়। ফসল ফলানো হয় না। তিনি তো এদেশের মানুষের মনোভাব সেন্টিমেন্ট জানতেন যে, একটা গাছের ডাল নিয়ে খুনোখুনি হয়ে যায়। সেজন্য বক্তৃতায় বললেন, আমি কারও জমি নেব না। জমির মালিকের জমি থাকবে। সরকার জমিগুলোর আইল তুলে দিয়ে একসঙ্গে করে চাষবাস করবে। ফসলের এক ভাগ পাবে জমির মালিক, এক ভাগ পাবে সরকার, বাকি এক ভাগ পাবে চাষি। বড়ো রাস্তা এখন যে হাইওয়ে, এর দুই পাশে থাকবে বাড়িগুলো। ছোটো পুকুর ভেঙে বড়ো বড়ো পুকুর থাকবে, যেখানে সবাই মাছচাষ করবে, পানি ব্যবহার করবে। এমন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তুলবে সরকার, যার সুফল ভোগ করবে সবাই। এই ব্যবস্থাটা প্রতিষ্ঠিত হলে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাসের লাইন দিতে এখনো যে ঝামেলা ও অর্থ খরচ হয়, তা হতো না। কিন্তু ইট ওয়াজ নট এক্সপোজ। এটা তো করা যায়নি।

**প্রশ্ন:** একটা কথা বলা হয়– বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পেছনে বাকশাল সৃষ্টিও একটা কারণ?

**আমির হোসেন আমু:** এটা ঠিক না। আমি এটা বিশ্বাস করি না। একাত্তরের পরাজিত শক্তি এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে এটা একটা বড়ো ধরনের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ মনে হয়। একটা লক্ষণীয় বিষয়, মুক্তিযুদ্ধের সময় এই অঞ্চলের তিন দেশের তিন নেতা যারা সক্রিয় ছিলেন– বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু, ভারতের ইন্দিরা গান্ধী, ওদিকে পাকিস্তানের ভুট্টো– তিনজনই কয়েক বছরের মধ্যে হত্যার শিকার হয়েছেন। আর কার কাছে কী মনে হয় জানি না; কিন্তু এটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

**প্রশ্ন:** বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর দলের নেতাকর্মী বা কাছের জনরাই প্রতিবাদে এগিয়ে আসেনি। এই দুঃখ বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনারও আছে? আওয়ামী লীগ নেতা হিসেবে আপনার কী মনে হয়?

**আমির হোসেন আমু:** ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পর আমি গ্রেফতার হয়ে যাই। কারাগারে ছিলাম তিন বছর। '৭৮-এ বের হই কারাগার থেকে। এই হত্যাকাণ্ডের পর কাছের মানুষ বা দলের মানুষ তেমন কিছু করেনি, যা দুঃখজনক।

একটা বিষয় হয়তো এমন হতে পারে, বিরোধী দলে থাকার সময় আমরা বুঝতাম কীভাবে আন্দোলন করতে হয়, প্রতিবাদ করতে হয়। কে ডাক দিল আর না দিল, কর্মী ও নেতা সেদিকে চেয়ে থাকেনি। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর বিষয়টা হয়ে যায় এককেন্দ্রিক, নির্ভরশীলতা এসে যায়। এ করবে তো উনি করবেন, স্বকীয়তা থাকে না– এই একটা ব্যাপার আছে। অন্যদিকে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিও একটা বড়ো বিষয়। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর দল ও কাছের জনদের যা করা দরকার ছিল, তা করেনি খুব সত্যি, তাদের সাহসের অভাব ছিল। বৈরী পরিস্থিতিতে এগিয়ে আসা, সংগঠিত হওয়া ও প্রতিবাদ জানানোর সাহস করেনি বা করতে পারেনি। কেন করেনি, তা তাদের ব্যাপার। তবে অনেকের অনেক কিছু করার ছিল। করেনি, এটাই বাস্তবতা।

**প্রশ্ন:** বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর আদর্শ বাস্তবায়ন ও উপস্থাপনের অনেক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এ সময়ে এসে আপনি কি মনে করেন বাকশাল পদ্ধতি পুনরায় প্রবর্তন করা দরকার বা সম্ভব?

**আমির হোসেন আমু:** বাংলাদেশে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেখানে দাঁড়িয়েছে, তাতে সব দল ভেঙে দেওয়া যাবে না। বাকশালের মতো একটা প্ল্যাটফরম তো করা সম্ভব নয়।

**প্রশ্ন:** আপনার রাজনীতির হাতেখড়ি বঙ্গবন্ধুর কাছে। আজকের অবস্থান কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

**আমির হোসেন আমু:** ঠিক তাই। শৈশবে মামা হিসেবে দেখেছি; কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বই আমাকে আকৃষ্ট করেছে সব সময়। তাঁর কাছাকাছি থাকার ইচ্ছা হতো যে কোনো ছুতোয়। কথা না বলে দাঁড়িয়ে থেকেছি। রাজনীতিতে এসেছি সরাসরি শেখ মুজিবুরের আদেশ ও নির্দেশে। কোনো ভায়া বা মিডিয়া ছিল না। হাঁটাচলা ও খাওয়ার সময় কথা বলতেন, পরামর্শ দিতেন, ভালো করে সংগঠন করতে বলতেন। মানুষের সঙ্গে কীভাবে আচরণ করব, রাজনীতি করলে মানুষকে কাছে ডাকতে হয়, তাদের বন্ধু হতে হয়– সব শিখিয়েছিলেন, যা আমার আজীবনের পাঠ। আমরা অনেক সময় বিরক্ত হয়ে বলি, এখন কথা বলতে পারব না। তিনি কাউকেই অবহেলা করে কথা বলতেন না। বঙ্গবন্ধু হওয়ার আগে ও পরে মামা শেখ মুজিবকে যত না পেয়েছি, তার চেয়ে বেশি পেয়েছি রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিবকে, বঙ্গবন্ধুকে। আমার রাজনীতিতে আসা, রাজনীতি করা বা রাজনীতিক হয়ে ওঠা যতটুকু এবং চাওয়া-পাওয়া সব তাঁর ইচ্ছায়, তাঁর হাত ধরেই।

**প্রশ্ন:** বঙ্গবন্ধুর কোন বিষয়গুলো আপনার রাজনৈতিক ও ব্যক্তিজীবনকে প্রভাবিত করেছে, এমন বিশেষ কিছু...

**আমির হোসেন আমু:** স্কুলজীবন থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন, মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মহৎ চরিত্রের কারণেই তিনি বঙ্গবন্ধু হয়েছেন, জাতির পিতা হয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিশমা, ব্যবহার, আন্তরিকতা এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা, মহানুভবতা– সব মিলেই তিনি শ্রেষ্ঠ বাঙালি, শ্রেষ্ঠ মানব।

তিনি বহু মত ও পথে বিশ্বাসী ছিলেন কি না, তার চেয়ে বলতে পারি– বঙ্গবন্ধু কর্মীদের কথা, সাধারণ মানুষের কথা বেশি শুনতেন। আন্তরিকতার সঙ্গে কথা বলতেন, খোঁজখবর নিতেন, তাদের মূল্যায়ন

করতেন। আমরা তো অনেক সময় বিরক্ত হয়ে বলি, যা এখন শুনব না। কিন্তু তিনি তা কখনোই করতেন না। তিনি বলতেন, সব সময় মাঠের মানুষের কথা ও কর্মীদের কথা শুনবে, তাহলে মাঠের আসল খবর পাবে। ওরা আসল খবরটা তোমাকে দেবে। নেতারা তাদের নেতৃত্ব বজায় থাকে বা নিজের সুবিধা হিসাব করে কথা বলবে, খবর দিবে, সত্যটা না-ও বলতে পারে।

বঙ্গবন্ধু খোলামেলা কথা বলতেন, অহমিকা ছিল না। মানুষকে মূল্যায়ন করতেন। তাঁর এমন অনেক কিছুই আমাকে প্রভাবিত করেছে। কতটুকু ধারণ করেছি, সেটাই বড়ো কথা।

তিনি প্রথম থেকেই তাঁর রাজনৈতিক ভিশন সবাইকে বুঝিয়েছেন যে, হোয়াট ইজ। শেরেবাংলা, মওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী, আমীরুল ইসলাম, আতাউর রহমান খান এবং অন্য নেতারা জীবিত থাকা অবস্থায়ই শেখ মুজিব নেতৃত্বে চলে এসেছেন। মওলানা ভাসানী জীবিত থাকতেই বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন বাঙালির কাছে। তিনিই যে বাঙালির নেতা, একমাত্র আশার জায়গাটা সৃষ্টি করতে পেরেছেন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। এই অবস্থান একদিনে বা একটা আন্দোলনে তৈরি হয়নি। বাঙালির আস্থার জায়গাটা তৈরি করতে পেরেছিলেন।

তিনি আজীবন ছিলেন রাজনীতির মানুষ। মামা হিসেবে খুব কমই পেয়েছি তাঁকে। তাঁর সন্তানরাই তো বাবা হিসেবে তাঁকে কাছে পেয়েছে খুব কম সময়। আমি যতটা পেয়েছি নেতা হিসেবে, সেটাও কম নয়। তবে তাঁর মধ্যে আমার জন্য স্নেহ ছিল। কর্মীদের সঙ্গে যখনই দেখা করতে এসেছি, তখন আলাদা কোনো কিছু দেখাননি। কখনো হয়তো বাসায় যেতে বলেছেন, একসঙ্গে খেয়েছি। এমন করে সবই তো পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। এর চেয়ে বেশি কাছে পাওয়ার সুযোগ ছিল না, মনেও করিনি, দরকারও ছিল না।

**প্রশ্ন:** বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ কেমন আছে?

**আমির হোসেন আমু:** বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে তাঁর আদর্শ, লক্ষ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে হত্যা করতে চেয়েছিল ঘাতকরা। বাংলাদেশকে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই চেতনা আবার পুনর্জীবিত হচ্ছে। যেসব মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে, তা পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে। সংবিধানের মূলনীতি বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ও অনেক বিষয়ই পুনরুদ্ধার করছে শেখ হাসিনা সরকার। যুদ্ধাপরাধীদের কয়েকজনের বিচার হয়েছে এবং তা চলছে। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হয়েছে। বঙ্গবন্ধু তো এদেশে অর্থনৈতিক মুক্তি চেয়েছিলেন। সেই অর্থনৈতিক মুক্তির দিকে এগিয়ে চলছে দেশ। আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বাঙালির প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন, পৃথিবীতে বাংলাদেশকে আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন শেখ হাসিনা। তিনি নিজেও সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছেন। এভাবে বাংলাদেশ আজ অনেক এগিয়েছে তাঁর কন্যার নেতৃত্বে।

**প্রশ্ন:** বঙ্গবন্ধু-চর্চা হচ্ছে? এ প্রজন্ম বা দলীয় কর্মীদের মধ্যে ভবিষ্যৎ রাজনীতিবিদদের কাছে আপনারা কি পৌঁছে দিতে পেরেছেন বলে মনে করেন?

**আমির হোসেন আমু:** বক্তৃতা ও কর্মসূচিতে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কথাই তো বলি। কিন্তু দেশপ্রেম তো শিখিয়ে দেওয়া যায় না, উদ্বুদ্ধ করা যায় মাত্র। দেশপ্রেম নিজের অনুভূতিতে জাগ্রত হতে হবে নিজ থেকে। এটাও ঠিক, এর জন্য চাই পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং শিক্ষা ও সচেতনতামূলক রাজনৈতিক কর্মসূচি। দলীয়ভাবে কর্মী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা সব সময়ই রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষকে সামনে রেখে সরকার বিশেষ কিছু কর্মসূচি নিয়েছে। এটা তো ঠিক, বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থাকে অনেক এগিয়ে নিয়েছে বর্তমান সরকার। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার উদ্যোগ সফল হচ্ছে। যার প্রভাব ও সুফল গ্রামপর্যায়েও দেখা যায়। আন্তর্জাতিকমানের শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় সফল হয়েছেন শেখ হাসিনা। একজন মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমি দেশকে কীভাবে স্বাধীন করেছি, তা বলতে পারি। তা ধারণ ও গ্রহণ করার দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের। পূর্বপুরুষরা কতটা ত্যাগ স্বীকার করে, সংগ্রাম করে এই দেশটাকে স্বাধীন করেছেন, সেই ঘটনাগুলো লেখাপড়া করে ছাত্রদের তা জানতে হবে। রাজনীতি করতে গিয়ে দেশের জন্য, মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধু যে কষ্ট করেছেন, এই ইতিহাস জানা দরকার। এই দেশ কীভাবে অর্জন হলো, যার জন্য এমন একটা জীবন তারা পেয়েছে, সেটা ভেবে দেশের প্রতি তাদের মমত্ববোধ জাগ্রত হওয়া উচিত।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বলতে চাই, এই দেশের জন্মের ইতিহাস জানতে হবে। বঙ্গবন্ধু যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা, বাংলার মাটির সন্তান হিসেবে, দেশের প্রতি মানুষের প্রতি, বাংলার মাটির প্রতি তাঁর যে টান ছিল, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁকে অনুসরণ করে নিজেকে তৈরি করতে হবে। বঙ্গবন্ধু যখনই গ্রেফতার হতেন বা বুঝতেন যে তাঁকে হত্যা করা হতে পারে বা মৃত্যু হতে পারে, বলতেন, আমার মৃত্যু হলে আমাকে কবর দিও বাংলার মাটিতে বা আমার লাশটা বাংলায় ফিরিয়ে দিও। এই যে মাটির টান বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের নিজের মাটির প্রতি– এমন টান থাকা উচিত। বঙ্গবন্ধুর মতো দেশপ্রেম থাকলে তরুণ প্রজন্মকে মাদক গ্রাস করতে পারত না। দেশপ্রেম থাকলে এত দুর্নীতি গ্রাস করতে পারত না। দেশপ্রেমের অভাব বলেই এমনটা হচ্ছে মনে করি।

**প্রশ্ন:** কী করতে পারেননি, বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে হয়তো যা সম্ভব ছিল...

**আমির হোসেন আমু:** অনেক সময় বক্তৃতায় বলি। মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের মূল্যায়ন নিজেরাই করেননি, বোঝেন না। আজ ভাতার জন্য যেভাবে ব্যস্ত হয়, এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। তাঁরা যে কত সম্মানিত ব্যক্তি, তাঁদের সম্মান সমাজে, রাষ্ট্রে; তা তাঁরা ধরে রাখতে পারেননি। মুক্তিযোদ্ধা যারা সম্মুখসমরে যুদ্ধ করেছেন, জীবনবাজি রেখে লড়াই করেছেন; সেই অভিজ্ঞতার কথাগুলো তাঁরা নিজ পরিবারের কাছেই বলেননি। জানাননি কীভাবে এই দেশটাকে শত্রুমুক্ত করতে হয়েছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম জানতেই পারেনি দেশকে ভালোবাসলে সব তুচ্ছ করা যায়। এই কাহিনিগুলো যদি তারা পরিবার, আশপাশের মানুষকে বলতেন, তাহলে দেশের অবস্থা অন্যরকম হতো। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ২১ বছর মুক্তিযুদ্ধ চেতনাবিরোধী শক্তি দেশ শাসন করতে পারত না। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ভেঙে তিন-চার ভাগ হতো না। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে বিভ্রান্ত হতো না মানুষ।

**প্রশ্ন:** আগামী দিনে বঙ্গবন্ধুর চার মূলনীতির সংবিধান ফিরে পাবে বাংলাদেশের মানুষ?

**আমির হোসেন আমু:** অনেক কিছুই তো ফিরে এসেছে, এটাও হবে আশা করি।

# বঙ্গবন্ধু ইতিহাসের স্রষ্টা

## মুহম্মদ শফিকুর রহমান

'সাত কোটি মানুষকে দাবায়া রাখতে পারবা না।'
**–বঙ্গবন্ধু**

আমরা যারা মধ্য ষাটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তখনকার ক্যাম্পাস দেখেছি, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ শুনেছি সরাসরি, ১০-১২ লাখ মানুষের ভিড়েও মঞ্চের অদূরে দাঁড়িয়ে; তখন রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) আকাশে দুটি হেলিকপ্টার গানশিপ উড়ছিল, উদ্যানের চারদিকে ঘুরছিল মোটা মোটা ব্যারেলের কামানবাহী কয়েকটি গান-ক্যারেজ এবং পেছনের রমনা গ্রিন ছিল পাকিস্তানি মিলিটারি সৈন্যে ভরা– এই বৈরী ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশেই রচিত হয়েছিল বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য– 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়া রাখতে পারবা না।' এ মহাকাব্যের কবি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কিছু মানুষ ইতিহাস সৃষ্টি করেন, কিছু মানুষকে ইতিহাস সৃষ্টি করে। বঙ্গবন্ধু ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন।

তিনি যখন ভাষণটি দিচ্ছিলেন, তখন তিনি ছিলেন এক যুগেরও অধিককাল জেল-জুলুম-নির্যাতন সহ্য করে করে নিজেকে খাঁটি সোনারূপে গড়ে তোলা দৃপ্ত যৌবনের প্রতীক। ফরসা চেহারা, গৌরবর্ণ

মেদবিহীন ছয় ফুট লম্বা শরীর, মোটা কালো ফ্রেমের চশমার মাঝে রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের মতো তীক্ষ্ণ দুটি চোখ, ব্যাকব্রাশ করা চুল, মোটা গোঁফ, একেবারেই আলাদা, ঈর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। বঙ্গবন্ধু যখন উচ্চারণ করছিলেন 'দাবায়া রাখতে পারবা না', তখন ভ্রম হচ্ছিল এ কার কণ্ঠ? একি আব্রাহাম লিংকনের, নাকি ভ্লাদিমির ই লেনিনের? না, এ আমাদের একেবারেই আপনজনের কণ্ঠে। সে নাম মা শেখ সায়েরা খাতুন ও বাবা শেখ লুৎফর রহমানের খোকা, হাজার বছরের বাংলা ও বাঙালির কাছে টুঙ্গিপাড়ার শেখের বেটা বা শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কাছে বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান, বাঙালির জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সারাজীবন আপামর বাঙালি জনগোষ্ঠীর রাজনীতি করেছেন, এ প্রশ্নে একবিন্দুও ছাড় দেননি, তাই 'দাবায়া রাখতে পারবা না' কথাটি বলার আগে আরেকটি কথা বলেছেন–

> 'আমি, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।'

এই কথা বলে তিনি হাজার বছরের আপামর বাঙালিকে সঙ্গে নিয়ে নিলেন। লক্ষ করার বিষয় হলো, তিনি যখন 'প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না' বলেছিলেন, তখন জোর দিয়ে তিনি দুইবার 'আমি' শব্দটি ব্যবহার করেন। সঙ্গে সঙ্গে যখন 'মানুষের অধিকার চাই', তখন ব্যবহার করেন 'আমরা' শব্দটি। এই 'আমরা' শব্দ ব্যবহার করে তিনি ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে নিলেন। 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না'– এটি কথার কথা ছিল না। যুক্তফ্রন্টের সময়ও তিনি মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দলের সাধারণ সম্পাদক পদ গ্রহণ করেছিলেন।

বস্তুত, যে রাজনৈতিক কর্মী ভবিষ্যৎ দেখতে পান না, তিনি নেতা হতে পারেন না। বড়জোর ক্যুদেতা বা ক্ষমতা দখলকারী স্বৈরাচার বা মাস্তান হতে পারেন। নেতা হতে হলে তাকে অবশ্যই ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হতে হবে। কেবল তখনই তিনি জনগণের কল্যাণে কাজ করতে পারবেন। বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম বা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দিকনির্দেশনামূলক নেতৃত্ব দিতে পারবেন। যে রাজনৈতিক কর্মী জনগণকে চেনেন না, বোঝেন না, তিনি পেছনে হাঁটেন। আর যে মানুষটি আমরণ মানুষের সামনে হেঁটেছেন, তিনি বঙ্গবন্ধু। এজন্যই মাত্র ৫১ বছর বয়সে একটি জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। মাত্র ৫৫ বছর তাঁকে বাঁচতে দিয়েছে ঘাতকরা। আজ আমাদের গড় আয়ু ৭২ বছর এবং এই বয়সটিও তিনি যদি পেতেন, তাহলে অনুন্নত দেশের গহ্বর থেকে বেরিয়ে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে ওঠে আসতে আমাদের এতদিন লাগত না বা যোগ্য পিতার যোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার জন্য অপেক্ষা করতে হতো না। কতই দেখলাম, ছড়ি ঘোরানো মিলিটারি, ম্যাডাম চেয়ারপারসন দেখলাম, কোনো অবদান তো দেখলাম না।

যে রাজনৈতিক কর্মী জনগণকে চেনেন না, বোঝেন না, তিনি পেছনে হাঁটেন। আর যে মানুষটি আমরণ মানুষের সামনে হেঁটেছেন, তিনি বঙ্গবন্ধু। এজন্যই মাত্র ৫১ বছর বয়সে একটি জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা

বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশ হতো বা হাজার বছরের নিপীড়িত বাঙালি স্বাধীন হতো– এ আমি বিশ্বাস করি না। ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে বেরিয়ে এমন একটি বর্বর পাকিস্তানি সামরিক জান্তার খপ্পরে আমরা বাঙালিরা পড়েছিলাম, যাদের বর্বরতা দেখেছি ১৯৭১ সালের ৯ মাস বা ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর। বর্বররা তাদের দখল কায়েম রাখতে মাত্র ৯ মাসে ৩০ লাখ মানুষকে হত্যা করল এবং ৫ লক্ষাধিক মা-বোনকে ধর্ষণ করল, হত্যা করল। পরন্তু এসব করল পবিত্র ইসলাম ধর্মের নামে এবং তাদের এদেশীয় দোসর গোলাম আযম-নিজামী, মুজাহিদ-সাকা চৌধুরীদের জামায়াত-শিবির, মুসলিম লীগ বাড়ি বাড়ি থেকে নারীদের তুলে নিয়ে পাকিস্তানি বর্বরদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে তুলে দিয়েছিল। কি জঘন্য ছিল পাকিস্তানি স্বৈরাচার গোষ্ঠী এবং তাদের এদেশীয় দোসররা। যারা আজও কোনো এক অর্বাচীন উর্দি পরা মিলিটারিকে ঘোষক বানানোর চেষ্টা করে বা দুর্নীতিবাজ এক পরিবারকে রাজনৈতিক পরিবার বানাতে চায়, তাদের প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে– পাকিস্তানিদের এই বর্বরতার বিরুদ্ধে একটি নিরস্ত্র জাতি সশস্ত্র হয়ে লড়াইয়ে নেমেছিল কার অনুপ্রেরণায়? তা কি বঙ্গবন্ধুর অনুপ্রেরণায় নয়? জানি ওরা জবাব দেবে না, কারণ তারা বিএনপি করুক আর জামায়াত-হেফাজতই করুক কিংবা কেউ যত বামপন্থি কোর্তাই গায়ে জড়াক, তাদের মনোজগতে আজও চাঁদ-তারা পতাকা। তবে এটাও ঠিক বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর থেকে যেভাবে বাংলা ও বাঙালির সঠিক ইতিহাস তুলে ধরছেন। ইতিহাস বিকৃতি সংশোধন করে চলেছেন, তাতে নতুন প্রজন্ম খুব দ্রুত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিজেদের মধ্যে ধারণ করছে। সেদিন আর বেশি দূর নয়, যেদিন চাঁদ-তারা পতাকাওয়ালারা আবার অন্ধকার বিবরে ঢুকে যাবে। নতুন প্রজন্ম তখন খুঁজে খুঁজে বের করে ৩০ লাখ মানুষ হত্যা এবং পাঁচ লক্ষাধিক মা-বোনের নির্যাতন ও হত্যার হিসাব নেবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

আমরা যারা ষাটের দশকের আন্দোলন দেখেছি, অংশ নিয়েছি; বঙ্গবন্ধুর দুনিয়া কাঁপানো অসহযোগ দেখেছি, অংশ নিয়েছে; ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ শুনেছি, সরাসরি যুদ্ধ করেছি এবং দেশ শত্রুমুক্ত করেছি– আমরা নিরাশায় ভুগি না। যারা আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলেই হতাশা ছড়ায়, তারা কি কখনো ভেবেছে এই বাংলাদেশে কোনো অভাব থাকবে না; পদ্মা সেতুর মেগা প্রকল্প সম্পন্ন হবে নিজস্ব অর্থায়নে? মঙ্গা-দুর্ভিক্ষ আজ আর জীবনে নেই, শব্দ দুটি এখন অভিধানে ঢুকে গেছে। বাংলাদেশে আজ ১৩ কোটি মোবাইল সিম ব্যবহৃত হচ্ছে, কারও কারও একাধিক সিম সচল; তাহলে হতাশা ছড়ানো সাহেব-ম্যাডামরা আর কী ছড়াবেন? বস্তুত বঙ্গবন্ধু আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়ে এমন এক শক্তি দিয়েছেন, যার বলে এবং তাঁর মতোই সাহসী মেধাবী ও দূরদর্শী কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা এগিয়ে চলেছি তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণের পথে।

মাত্র ৫৫ বছরের জীবন। এই ছোট্ট জীবনেরও প্রতিটি দিন তিনি ব্যয় করেছেন সাধারণ মানুষের কল্যাণে। '৩০-এর শেষের দিকে গোপালগঞ্জ মিশন হাইস্কুল থেকে যাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু, সেখান থেকে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি নিলেন, ১৯৪৬-৪৭ এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধে সক্রিয়ভাবে অংশ নিলেন; কিন্তু তারপর যে তথাকথিত স্বাধীনতা এলো, তিনি দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখলেন এ স্বাধীনতা বাঙালিদের জন্য নয়। বরং মুহম্মদ আলী জিন্নাহ-জওহরলাল নেহেরু এবং মহাত্মা গান্ধী ও মাউন্ট ব্যাটনরা মিলে ভারতটাকে ভাগাভাগি করে নিয়েছে মাত্র। তখনই বঙ্গবন্ধুও সিদ্ধান্ত নিলেন এবং ঢাকায় ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এলএলবিতে ভর্তি হলেন। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা এত দ্রুত সত্যি হবে, তা তখন অনেকেই বুঝতে পারেনি, পেরেছে যখন খোদ জিন্নাহ ঢাকায় এসে ঘোষণা দিলেন, 'Urdu and urdu shall be the state language of Pakistan.' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় No, No বলে প্রত্যাখ্যান করল জিন্নাহর ঘোষণা, বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হলেন। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হলো, বলা হয়েছিল মুচলেকায় সই করলে ছেড়ে দেওয়া হবে। বঙ্গবন্ধু মুচলেকা দেননি, প্রায় দুই বছর কারাভোগের পর বের হলেন। কিন্তু পেছনে তাকানোর তাঁর সময় কোথায়? মাত্র ৫০ বছর বয়সে তিনি ৭ মার্চের ভাষণে স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণা দিলেন এবং ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বমুহূর্তে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিলেন: 'This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.'

এটিই বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এবং একাত্তরের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে ঘোষণাটি দেওয়ার পরপরই পাকিস্তানি হানদার মিলিটারি বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে (পশ্চিম) নিয়ে যায়।

কিন্তু তারপর যে তথাকথিত স্বাধীনতা এলো, তিনি দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখলেন এ স্বাধীনতা বাঙালিদের জন্য নয়। বরং মুহম্মদ আলী জিন্নাহ-জওহরলাল নেহেরু এবং মহাত্মা গান্ধী ও মাউন্ট ব্যাটনরা মিলে ভারতটাকে ভাগাভাগি করে নিয়েছে মাত্র

মানুষ স্বপ্ন দেখে। কেউ স্বপ্ন দেখে বাড়ি বানানোর, কেউ কোটিপতি হওয়ার– কত কত স্বপ্ন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছেন একটি জাতির স্বাধীনতার, বাঙালি আপন রাষ্ট্র বাংলাদেশের। তিনি অত বড়ো মাপের মানুষ ছিলেন বলেই অত বড়ো স্বপ্ন দেখতে পেরেছিলেন। (অবশ্য তাঁর কন্যা আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বাবার মতোই বড়ো বড়ো সব স্বপ্ন দেখেন, বাস্তবায়ন করে চলেছেন)।

বস্তুত, স্বাধীনতা ঘোষণার একমাত্র সাংবিধানিক নিয়মতান্ত্রিক অধিকার বঙ্গবন্ধুরই ছিল। সত্তরের নির্বাচনে বাংলার জনগণ পাকিস্তানের পার্লামেন্টের নির্বাচনে জনগণ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগকে ১৬৭টি আসনে নির্বাচিত করে, যা ছিল পাকিস্তান পার্লামেন্টে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা।

কেউ কেউ বঙ্গবন্ধুর ভাষণটিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গ ভাষণের (Gettysburg address) সঙ্গে তুলনা করেন। আমি মনে করি, কোনো তুলনাই চলে না। কেননা, আব্রাহাম লিংকন ছিলেন আমেরিকার ১৬তম প্রেসিডেন্ট, তিনি তার ভাষণটি দেন আমেরিকার স্বাধীনতার ৮৭ বছর পরে (Fourscore and seven years ago our fathers brought forth on this continent, a new nation, conceived in liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal), অর্থাৎ তিনি একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতাধর রাষ্ট্রপতি হিসেবে স্বাধীন জাতির বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে গৃহযুদ্ধ (Civil war) দমনের পর রাষ্ট্র পরিচালনার দিকনির্দেশনা দেন।

বঙ্গবন্ধু তখনও কেবল একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের (সত্তরের নির্বাচনে) নেতা এবং তাঁর মাথার উপরে রাষ্ট্রশক্তি, তা-ও আবার ভিন্ন ভাষী ভিন্ন সংস্কৃতির সামরিক জান্তা। বঙ্গবন্ধু যখন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলছেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ, জয় বাংলা' অর্থাৎ বাঙালির জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা, তখন আব্রাহাম লিংকন একটি স্বাধীন জাতির রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ঘোষণা করছেন– 'That this nation, under god, shall have a new birth of freedom and that government of the people by the people for the people shall not perish from the earth.' এই হচ্ছে, একটি দেশের স্বাধীনতার ৮৭ বছর (Fourscore and seven years ago) পরে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কথা। তবে ৮৭ বছর আগে-পরে হলেও একটা জায়গা দুজনের মিল পাওয়া যায়। আব্রাহাম লিংকন বলেছেন, and that this nation under god... shall not perish from the earth আর বঙ্গবন্ধু বলেছেন, '৭ কোটি মানুষকে (বাঙালি) দাবায়ে রাখতে পারবা না, ... আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবায়া রাখতে পারবা না।'

যে শিশু-কিশোর, নারী-পুরুষ তাঁর নাম ইচ্ছে করে ভুলে যেতে চায় বা যারা তাঁর পরিচয় জানে না বা গোপন করার ষড়যন্ত্র করে, তাদের বলব, শোন, সে মানুষ শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ দক্ষিণ বাংলার এক ছায়া-সুনিবিড় গ্রাম টুঙ্গিপাড়ার বনেদি শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা শেখ লুৎফর রহমান ও মা শেখ সায়েরা খাতুন আদর করে ডাকতেন খোকা। তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী সন্তানের হাতে দিন, ঠকবেন না।

**লেখক: সংসদ সদস্য, সদস্য, তথ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি**
**সিনিয়র সাংবাদিক, সাবেক সভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব**

# মৃত্যু-বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান

**মহিউদ্দিন আহমদ**

টেলিফোনটি বাজছে তো বাজছেই। জাকিউদ্দিন সাহেব ধরছেন না; হয়তো ভাবছেন, টেলিফোনটি আমার। আর আমি ভাবছি টেলিফোন কলটি তাঁর; সুতরাং তিনিই উঠে টেলিফোনটি ধরবেন।

১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি, ভোর ৪টা সাড়ে ৪টার কথা। ঘটনার শুরু জাকিউদ্দিন সাহেবের বাসায়। জাকিউদ্দিন সাহেবও একজন বাঙালি এবং আমার ভাড়াটে বাসার মালিক। তিনি উপরের তলায় ছোট্ট দুটো কামরায় তাঁর স্ত্রী এবং এক ছেলে, এক মেয়ে নিয়ে থাকেন; আমি থাকি নিচ তলায় ছোটো দুটো কামরায়; সঙ্গে আমার স্ত্রী এবং আমাদের চার মাসের মেয়ে অরু। বাসাটি দক্ষিণ লন্ডনের বালহামে, রাস্তার নাম বেলামি স্ট্রিট।

টেলিফোনটি উপরতলায় ওঠার সিঁড়ির মাঝামাঝি জায়গায়। আমাদের দুজনের জন্য একই টেলিফোন। আমার টেলিফোন হলে সিঁড়ির এক 'ফ্লাইট' উঠে আমি ধরি, আর জাকিউদ্দিন সাহেবের হলে এক ফ্লাইট নেমে তিনি ধরেন।

জাকিউদ্দিন সাহেব টেলিফোনটি ধরছেন না দেখে শেষ পর্যন্ত আমিই উঠে উপরে গেলাম। টেলিফোনটি ধরতেই ওই প্রান্ত থেকে খুব

পরিচিত কণ্ঠ। এমএম রেজাউল করিম সেই ভোরবেলায় টেলিফোনে আমাকে বলছেন, মহিউদ্দিন, তোমার আশপাশে কেউ আছে কিনা আমি জানি না; কিন্তু যদি কেউ থাকেও আমার সঙ্গে কথা বলার সময়ে কোনো রকমের প্রতিক্রিয়া দেখাবে না। বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ, বঙ্গবন্ধু লন্ডনে এসে পৌঁছেছেন। তিনি হিথ্রো বিমানবন্দর থেকে আমাকে টেলিফোন করেছেন। আমি হিথ্রো বিমানবন্দরের 'আলকক অ্যান্ড ব্রাউন' ভিআইপি সুইটে যাচ্ছি। তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখানে এসো। আমি ছাড়লাম।

এই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করে আছি সেই কতদিন। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ১৬ ডিসেম্বরে, তিন সপ্তাহ আগে। কিন্তু এই মহাকাব্যের মহাকবি কই? মহানায়ক ছাড়া উৎসব-উল্লাস প্রাণ পাচ্ছে না। তাঁর অবর্তমানে বিজয়ের আনন্দ-বেদনা প্রকাশ অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু স্বদেশে ফিরে গিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের দায়িত্ব আবার কাঁধে নেবেন, দেশের প্রতিটি মানুষ তা চাইছে; দুনিয়ার অনেক দেশের রাষ্ট্রনায়ক এবং সাধারণ মানুষও মনে করেন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব এই সময়ে অতি জরুরি প্রয়োজন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর তিনটি মুখ্য উদ্দেশ্যের প্রথমটি ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল বঙ্গবন্ধুর নিরাপদে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। আর তৃতীয়টি ছিল প্রায় এক কোটি শরণার্থীর নিজ বাসভূমিতে নিরাপদ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর তিনটি মুখ্য উদ্দেশ্যের প্রথমটি ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল বঙ্গবন্ধুর নিরাপদে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। আর তৃতীয়টি ছিল প্রায় এক কোটি শরণার্থীর নিজ বাসভূমিতে নিরাপদ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করা। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় লক্ষ্যও সফল হলো। বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এখন তৃতীয় লক্ষ্য অর্জনও সহজ হবে।

রেজাউল করিম সাহেব তো টেলিফোনে এই খবরটি দিয়েই খালাস। কিন্তু আমি আমার রিসিভারটি রেখে দিয়ে কয়েক মুহূর্ত প্রায় অবশ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকি। তারপর আমার হঠাৎ মনে পড়ে, কতদিন এই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছি। আমাকে এখন এয়ারপোর্টে যেতে হবে। তিনি এসে গেছেন, কোনোমতেই দেরি করা যায় না।

বঙ্গবন্ধু লন্ডনেই আসবেন– এমন একটি ধারণা আমাদের কারও কারও ছিল। জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশ বা ভারতে পাঠাবেন না। আর বঙ্গবন্ধু আরব দুনিয়ার কোথাও যেতে চাইবেন না। ভারত-বাংলাদেশ ছাড়া আর কোনো দেশের জন্য তাঁর মতামত চাইলে তিনি লন্ডনের কথাই বলবেন, আমরা মনে মনে ভেবেছিলাম। বঙ্গবন্ধু লন্ডনে কয়েকবার এসেছেন, এই জায়গাতে তাঁর অনেক বন্ধুবান্ধুব, স্বজন আছেন; এই জায়গার সঙ্গে তিনি পরিচিত।

এমন ভাবতে ভাবতে আমি আস্তে আস্তে একটি একটি করে সিঁড়ি ধরে নেমে বেডরুমে ঢুকি। আমাদের চার মাসের মেয়ে অরু গভীর ঘুমে অচেতন; কিন্তু আমার স্ত্রী আগেই টেলিফোনের শব্দে আমার সঙ্গে জেগে গিয়েছিলেন। বেডরুমে ঢোকার পর আমার চোখ-মুখের অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে তিনিও আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

রেজাউল করিম সাহেব বলেছেন, এই খবরটি এখন কাউকে দেওয়া যাবে না। তিনি বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই আমাকে এই পরামর্শটি দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি স্ত্রীকে না বলে এখন বেরুতে গেলে সে অবশ্যই আপত্তি করবে। রাতে ওই সময়ে প্রায় নিস্তব্ধ বালহামের কোথায়, কেন যাচ্ছি, প্রশ্নগুলো খুবই স্বাভাবিক। রাত সাড়ে ৪টা হলেও চারদিকে গভীর নীরবতা। শীতকালের রাত। লন্ডনে শীতকালে সূর্য কখনো উঠলেও ১১টা-১২টার দিকে মাত্র কিছুক্ষণের জন্য ওঠে। তারপর এই শীতকালে বৃষ্টিও হয়, গুঁড়ি গুঁড়ি। তাই ওই আবাসিক এলাকায় রাতের ওই সময়টুকুতে গাড়িঘোড়ার চলাচল প্রায় নেই। তার ওপর আইনশৃঙ্খলার ব্যাপারে বালহাম এলাকাটির তেমন সুনামও নেই।

দ্রুত কাপড় বদলে একটি ওভার কোট গায়ে জড়িয়ে দিলাম। আমি কাপড় বদলাচ্ছি আর আমার অনুরোধে আমার স্ত্রী মতিন সাহেব এবং জায়গিরদার সাহেবকে টেলিফোনে ধরতে চেষ্টা করছে। তাঁদের দুজন বালহামেই কয়েকটি রাস্তার পর একটি বাড়ির উপর তলায়, নিচের তলায় থাকেন। তাঁদের দুজনও লন্ডনের বাংলাদেশ মিশনে আছেন। মতিন সাহেব মূলত অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিসের একজন কর্মকর্তা। '৭১-এর জুলাই পর্যন্ত পাকিস্তান হাইকমিশনে আমার মতোই কর্মরত ছিলেন। ১৯৭১-এর পহেলা আগস্ট তারিখে পাকিস্তান হাইকমিশনের আমার দ্বিতীয় সচিবের পদটি ছেড়ে দেওয়ার তিন-চারদিন পর লুৎফুল মতিনও পাকিস্তান হাইকমিশনের ডাইরেক্টর অব অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস পদটি ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করার জন্য বেরিয়ে আসেন।

মহিউদ্দিন আহমদ জায়গিরদার পাকিস্তান আমলে মূলত সিএসএস ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। ষাটের দশকের শেষদিকে তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন সেকশন অফিসার হিসেবে কাজ করছিলেন। ওখান থেকেই তিনি বদলি হয়ে নাইজেরিয়ার লাগোসে অবস্থিত পাকিস্তান হাইকমিশনের তৃতীয় সচিব হিসেবে বদলি হয়ে যান। একাত্তরের এই মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক বাঙালি কূটনীতিবিদ পাকিস্তানের বিভিন্ন দূতাবাস থেকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করতে বেরিয়ে আসেন। মহিউদ্দিন জায়গিরদারও তাঁদের মধ্যে একজন। একাত্তরের সেপ্টেম্বরেই তিনি লাগোসে তাঁর দায়িত্ব ত্যাগ করে তাঁর স্ত্রী এবং তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে লন্ডনে আমাদের সঙ্গে যোগ দেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ২৬ আগস্ট আমরা লন্ডনের নটিং হিল গেটের ওপর অবস্থিত

পেম্ব্রিজ গার্ডেনের ২৪ নম্বর বাড়িটির নিচতলার কয়েকটি কামরা নিয়ে বাংলাদেশ মিশন স্থাপন করি। ব্রিটিশ সরকার আমাদের এই মিশনকে স্বীকৃতি দেয়নি, তবে বাধাও দেয়নি। যুক্তরাজ্যে তৎকালীন পাকিস্তান হাইকমিশনার সালমান আলী ব্রিটিশ উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী জোশেফ গডবারের কাছে আমাদের এমন করে একটি দূতাবাস স্থাপনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। জোশেফ গডবার পাকিস্তান হাইকমিশনারকে এই বলে জবাব দেন, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো ব্রিটিশ আইন ভাঙছে, ততক্ষণ তাদের বাধা দেওয়া যাবে না।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনেকেই মুজিবনগর সরকারের নির্দেশে আমাদের সঙ্গে লন্ডনে এসে যোগ দিয়েছিলেন। কলকাতার পরই সেই সময় লন্ডন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য দ্বিতীয় বৃহত্তম কেন্দ্র ছিল বলেই এসব বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারীর লন্ডনে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর কাছে রিপোর্ট করতে মুজিবনগর সরকার নির্দেশ দিয়েছিল।

মহিউদ্দিন আহমদ জায়গিরদারের মতো আরও তিনজন বাঙালি কূটনীতিবিদ একইভাবে লন্ডনে যোগ দিয়েছিলেন। ফজলুল করিম ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ফরেন সার্ভিস ব্যাচের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি এলেন কায়রোর পাকিস্তান দূতাবাস থেকে। মরহুম সৈয়দ আমিরুল ইসলাম তিউনিশিয়া এবং আনোয়ার হাশিম এসেছিলেন বন থেকে।

মহিউদ্দিন জায়গিরদার বা লুৎফুল মতিন কাউকেই টেলিফানে ধরা গেল না। মতিনের বাসা থেকে কোনো জবাব না পাওয়ায় হঠাৎ আমার মনে পড়ে লুৎফুল মতিন মাত্র আগের দিন বার্মিংহাম গেছেন। বাংলাদেশ লিবারেশন ফান্ডে যেসব টাকা ওখানে জমা পড়েছে, এর হিসাব-নিকাশ মিলাতে ওখানে তার দু-তিনদিন থাকার কথা। কিন্তু জায়গিরদারও টেলিফোন ধরছেন না কেন? হতে পারে এই শীতের রাতে টেলিফোনের শব্দ তাদের কানে পৌঁছাচ্ছে না অথবা এই শীতের রাতে কে এই অসময় টেলিফোন করবে, হয়তো কোনো ভুল নম্বর, তাই জায়গিরদার গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

কয়েক মিনিটের মধ্যে আমি সর্বমোট ৫৯০ পাউন্ড দিয়ে দেড় বছর আগে নতুন কেনা আমার অস্টিন ১৩০০ গাড়িটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। তিন-চার মিনিট পর জায়গিরদারের বাসায় গিয়ে বেল টিপলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি দরজা খুলে আমাকে দেখে কিছুটা অবাক। এই অসময়ে আমি কেন, তার চোখ-মুখের জিজ্ঞাসা। তাকে আমি বলি, বঙ্গবন্ধু হিথ্রো বিমানবন্দরে এসে পৌঁছেছেন। রেজাউল করিম সাহেব আমাকে টেলিফোনে কয়েক মিনিট আগে খবরটি দিয়েছেন। আমি যাচ্ছি, আপনি কি যাবেন?

আমার এই প্রশ্নটি করার বোধহয় প্রয়োজন ছিল না। জায়গিরদার আমাকে প্রশ্নের জবাবে বললেন, আমাকে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দিন, আমি কাপড় বদলে আসি। জায়গিরদার বোধহয় মাত্র দুই মিনিট সময় নিলেন। আমি তার বসার ঘরে ওই দুই মিনিট দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে পায়চারি করে কাটালাম। সময় মাত্র দুই মিনিট; কিন্তু মনে হচ্ছিল কত যুগ। সেই মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা পেতে আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

জায়গিরদার সাহেব আমার পাশের সিটে। আমি স্টিয়ারিং হুইল হাতে নিয়ে বসি। গাড়ি দক্ষিণ লন্ডন থেকে সেন্ট্রাল লন্ডন পেরিয়ে উত্তর লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে যাবে। আমাদের গন্তব্য আলকক অ্যান্ড ব্রাউন ভিআইপি সুইট। আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। আমার পৌঁছাতে দেরি হলে রেজাউল করিম সাহেব বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কোথায় গিয়ে ওঠাবেন, তা আমি জানব কী করে? এছাড়া বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানানোর এমন একটি ঐতিহাসিক সুযোগ থেকে কি আমি বঞ্চিত হব?

সাধারণত দিনের ব্যস্ত সময়ে বালহাম থেকে হিথ্রো যেতে দেড় ঘণ্টা সময় লাগার কথা। কিন্তু আমি সৌভাগ্যবান, একে তো রাত; তার ওপর শনিবার। গাড়িঘোড়া রাস্তায় তেমন নেই।

গাড়ি চলছে তো চলছেই। জায়গিরদার সাহেবও কিছু বলেন না, আমিও না। কিন্তু আমার মনে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। আমি নিশ্চিত ছিলাম জায়গিরদারের মনেও তেমনই ঘটছে। কত কান্না, কত রক্ত, কত ত্যাগ এবং অপেক্ষা। এই মানুষটির জন্য মুসলমানরা রোজা রেখেছেন, নামাজ পড়েছেন, সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর রহমত কামনা করেছেন। আর অনেক হিন্দু তাঁকে দেবতা মনে করে পূজা করেছেন। লন্ডনের টেলিভিশনে নয় মাস এমন সব দৃশ্য দেখেছি।

গাড়ি চালাতে থাকি আমি আর বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে কতসব কথা এবং স্মৃতি আমার মনে পড়ে। রাওয়ালপিন্ডিতে ১৯৬৯-এর মার্চে পাকিস্তানের তখনকার সংকট নিরসনের লক্ষ্যে আহূত রাউন্ডটেবিল বৈঠকের জন্য ফিল্ড মার্শালের টিম আর নওয়াবজাদা নসরুল্লাহর নেতৃত্বে বিরোধী দলের অনেক রাজনৈতিক নেতা হাজির। কিন্তু বৈঠক তো শুরু হয় না। কারণ বঙ্গবন্ধু তখনও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হিসেবে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বন্দি। তাঁকে ছাড়া বিরোধীদলীয় কোনো নেতা ফিল্ড মার্শালের সঙ্গে কথা বলার ক্ষমতা বা সাহস রাখেন না। অচলাবস্থা চলল কয়েকদিন। আমরা তখন ইসলামাবাদ গভর্নমেন্ট হোস্টেলে থাকি।

এই অচলাবস্থার মধ্যে একদিন ইংরেজি দৈনিক 'পাকিস্তান টাইমস'-এর সম্পাদক জেডএ সুলেরি স্বনামে একটি সম্পাদকীয় লিখলেন। হুবহু মনে নেই, তবে তার মোদ্দা কথাটি এমন ছিল, 'If 10 of the opposition leaders cannot hold discussion on the political crisis in the country with the President without that one man Sheikh Mujibur Rahman, then the President should hold discussion with that one man only dismissing all 10 of them.'

বঙ্গবন্ধু বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে রাওয়ালপিন্ডি গেলেন এবং তারপরই সেই রাউন্ডটেবিল বৈঠক শুরু হয়েছিল। আজও বঙ্গবন্ধু আবার মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছেন। আমরা তাঁকে বরণ করতে যাচ্ছি।

বালহাম পেরিয়ে টেমস নদীর একটু আগে একটি টানেলে ঢুকব, তখন কথাটি জায়গিরদারকে বলেই ফেললাম। জায়গিরদার সাহেব, আমি বঙ্গবন্ধুকে একটি কথা বলতে চাই। জায়গিরদার আমার মুখের দিকে তাকান। আমি বলি, আমি বঙ্গবন্ধুকে বলতে চাই, 'সারাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনি দয়া করে দেখবেন, আপনার দেশে প্রত্যাবর্তনের পর প্রতিটি মুহূর্ত যেন দেশের এত হাজারও সমস্যা সমাধানে ব্যয় হয়।'

এমন বেপরোয়া একটি ভাব আমার কেন হলো, এর পেছনেও একটি কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল তখন আমার কাছে।

একাত্তরের মার্চের মাঝামাঝি দিনগুলোর কোনো একটি দিনের কথা। লন্ডনের পাকিস্তান হাইকমিশনে পাঠানো তৎকালীন পাকিস্তান অবজারভারের একটি খবর এখনো আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর ভক্ত, অনুসারী ও দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ করে নুরুল আমিন ও ওয়াহিদুজ্জামান একটি যুক্ত বিবৃতি দিয়েছিলেন। এত বছর পরও এই বিবৃতিটির মোদ্দা কথাগুলো এখনো মনে আছে। এই বিবৃতিতে তারা বলেছিলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। দেশের এই কঠিন সময়ে অনেক কিছু ভেবেচিন্তেই তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তিনি যে সিদ্ধান্তই নেন না কেন তার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া থাকবে। আমরা তাই মনে করি, দেশের এই সন্ধিক্ষণে, দেশের এই সংকটকালে গভীর চিন্তাভাবনা করে তাঁর সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে তাঁর এত হাজার দলীয় কর্মী, ভক্ত

এবং সমর্থক তাঁকে ওই সময়টুকু দিচ্ছেন না। মিছিল, মিটিং, সমাবেশ সাক্ষাৎকারের বিবরণ আমরা প্রতিদিন পত্রপত্রিকায় পড়ছি। এসবে প্রতিদিন এত সময় দিলে, তিনি দেশের কথা ভাববেন কখন? প্রশ্ন করেছিলেন এই দুজন।

আমার আশঙ্কা হচ্ছিল, দেশে ফিরে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর অমন একটি অবস্থা হবে। যেখানে মানুষ তাঁর জন্য রোজা রেখেছেন, তাঁকে দেবতার আসনে বসিয়েছেন, সেখানে তাঁর প্রতি প্রীতি, ভালোবাসা এবং আনুগত্য প্রকাশে মানুষজন তাঁর ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করবে। কিন্তু এত বড়ো বড়ো সমস্যা সমাধানেও যে তাঁকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এখানে যে তাঁর সময়ক্ষেপণের অবকাশ নেই।

জায়গিরদার আমার কথা শুনলেন এবং প্রত্যাশিতভাবেই বললেন, আপনার অমন কিছু বলা ঠিক হবে না।

জায়গিরদারের সঙ্গে আমি এই বিষয়ে আর কোনো আলোচনায় যাইনি। তবে মাঝে মাঝে নীরবতা ভঙ্গ করে জায়গিরদার দুই-একটি কথা বলছে– ওই নয় মাসের সংগ্রাম, ত্যাগ, রক্ত আমাদের ভবিষ্যৎ এবং প্রত্যাশা।

এখানে আমাদের মাঝে তিনি আধ ঘণ্টার মতো ছিলেন। এই দিনের একটি কথাই মনে আছে। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ছয় দফার প্রশ্নে কোনো আপস নেই

পাকিস্তান হাইকমিশনে প্রায় পৌনে দুই বছর থাকাকালে এবং তারপর মুক্তিযুদ্ধের সময় হিথ্রো বিমানবন্দরে অনেক ভিআইপি ও সাধারণ মানুষকে অভ্যর্থনা জানিয়েছি, বিদায়ও দিয়েছি। সুতরাং হিথ্রো বিমানবন্দরের বিরাট বিরাট তিনটি টার্মিনালের বিভিন্ন অলিগলি মোটামুটিভাবে আমার জানা ছিল। আলকক অ্যান্ড ব্রাউন সুইট দিয়েই ভিআইপিদের আসা-যাওয়া। সুতরাং ওখানেই লন্ডনে কর্মরত আমাদের কূটনীতিবিদদের আনাগোনা বেশি ছিল। হিথ্রো বিমানবন্দরে পৌঁছে ওখানে অনেকগুলো লেফট টার্ন, রাইট টার্ন করে ভিআইপি সুইটটিতে ঢুকতে আমার এতটুকু অসুবিধা হলো না।

তখন হিথ্রো বা দুনিয়ার কোনো বিমানবন্দরেই এত কড়াকড়ি ছিল না। তবে বিমান ছিনতাই সেই আমলেও আশঙ্কাজনকভাবে ঘটছে। ফিলিস্তিনিদের পক্ষে সেই তরুণী লায়লা খালেদ মাত্র এক বছর আগে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের সদ্য কেনা জাম্বো জেট হাইজ্যাক করে জর্ডানে নিয়ে গিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। এমন ঘটনার পর হিথ্রো বিমাবন্দরে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে; কিন্তু প্রধান ফটকে বা ভেতরে কেউ আমাদের আটকালো না। প্রধান ফটকে অবশ্য একজন প্রশ্ন করেছিল, কোথায় যাচ্ছ? উত্তর দিলাম, বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানাতে। মনে হলো এই নিরাপত্তাপ্রহরীও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। দ্বিতীয় প্রশ্নটি না করে বা কোনো পরিচয়পত্র না দেখেই ছেড়ে দিল। বঙ্গবন্ধুর নাম সেই রাতে সেই ব্রিটিশ দ্বাররক্ষীর কাছে 'ওপেন সিস্টেম'-এর কাজ করল।

নির্দিষ্ট জায়গায় গাড়িটি পার্ক করে ভিআইপি লাউঞ্জে ছুটে গেলাম এবং দেখলাম সেই অসাধারণ দৃশ্য। বঙ্গবন্ধু কথা বলছেন রেজাউল করিম সাহেবের সঙ্গে, পাশে ডক্টর কামাল হোসেন। আর একটু দূরে মিসেস হামিদা হোসেন তাদের দুই শিশুকন্যা নিয়ে বসে আছেন। লক্ষ করলাম, ইয়ান সাদারল্যান্ড টেলিফোনে কথা বলছেন কারও সঙ্গে। ইয়ান সাদারল্যান্ড তখন ব্রিটিশ ফরেন অ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিসের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের প্রধান। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ– সব তখন তাঁর সরাসরি দায়িত্বের মধ্যে।

কামরায় ঢুকতেই রেজাউল করিম সাহেব বঙ্গবন্ধুর কাছে দুই-তিনটি বাক্যে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন: বঙ্গবন্ধু, এই আমাদের মহিউদ্দিন, আমাদের বাংলাদেশ মিশনের সেকেন্ড সেক্রেটারি। আর মহিউদ্দিন জায়গিরদার থার্ড সেক্রেটারি, নাইজেরিয়া থেকে এসে যোগ দিয়েছে।

আমি বঙ্গবন্ধুকে সালাম দিয়ে পাশ কাটিয়ে সরে যাচ্ছিলাম। হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধু আমাকে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর বুকে টেনে নিলেন। আর আমার চোখ দিয়ে নদী প্রবাহিত হতে থাকল, মিনিটখানেক। বঙ্গবন্ধু বললেন, ভয় নেই, আমি এসে গেছি। আমার কান্নাতে মনে হলো, তাঁর গলাও আটকে গেছে।

বঙ্গবন্ধুকে এর আগে দুইবার দেখেছি। প্রথমবার ছাত্র হিসেবে। ষাটের দশকের প্রথম দিকে পল্টন ময়দানে একটি জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। স্পষ্ট মনে আছে, ওই সভা শেষে ডাকসুর জেনারেল সেক্রেটারিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল পুরানা পল্টনের ওই সভাস্থল থেকেই। সভা শেষ হওয়ার পরও বঙ্গবন্ধু আবার মাইক হাতে নিয়ে তার মুক্তি দাবি করেছিলেন।

দ্বিতীয়বার দেখেছিলাম ১৯৬৯-এর মার্চে, বঙ্গবন্ধু রাওয়ালপিন্ডিতে ফিল্ড মার্শাল আহূত রাউন্ডটেবিল কনফারেন্সে গিয়েছেন। আমরা তখন ইসলামাবাদে গভর্নমেন্ট হোস্টেলে থাকি। পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রবেশনারি কর্মকর্তা হিসেবে আমরা দিন কাটাচ্ছি। পশ্চিম পাকিস্তানে ফেব্রুয়ারি-মার্চের সেই দিনগুলোয় জুলফিকার আলী ভুট্টো একটির পর একটি লাখ লাখ লোকের সফল জনসভা করে যাচ্ছেন। লৌহমানব ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদ, বিক্ষোভ চলছে। এসব উত্তেজনা নিয়ে আমাদের দিন কাটছে। এমন সময় একদিন সন্ধ্যায় খবর পেলাম, বঙ্গবন্ধু গভর্নমেন্ট হোস্টেলের একটি কামরায় এসেছেন। আমরা বাঙালি কর্মকর্তারা যে যেখানে ছিলাম ছুটে গেলাম। দেখি বিশ-পঁচিশজন তাঁকে ঘিরে রেখেছে। আমরা আরও চার-পাঁচজন একত্রে ঢুকলাম।

এখানে আমাদের মাঝে তিনি আধ ঘণ্টার মতো ছিলেন। এই দিনের একটি কথাই মনে আছে। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ছয় দফার প্রশ্নে কোনো আপস নেই।

আলকক অ্যান্ড ব্রাউন সুইটে মিনিটদশেক কাটিয়েছি। সাদারল্যান্ড এসে খবর দিলেন, বঙ্গবন্ধু এবং ডক্টর কামাল হোসেনের জন্য

ক্ল্যারিজেস হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের এখন ওখানে যেতে হবে। তখন অনুমান করি সকাল সাড়ে ৬টা। এই সময়ে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যাওয়ার জন্য রেজাউল করিম সাহেবের ফোর্ড কর্টিনা এবং আমার অস্টিন গাড়িকেই সব চাইতে নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ মনে করা হলো। এই অত সকালে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টকে নিয়ে যাওয়ার জন্য লিমুজিনের ব্যবস্থাও হয়ে গেল।

কিন্তু বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত দিলেন তিনি রেজাউল করিম সাহেবের গাড়িতেই যাবেন এবং রেজাউল করিম সাহেব নিজেই চালাবেন। তার পাশের সিটে বঙ্গবন্ধু বসলেন এবং লিমুজিনে ডক্টর কামাল হোসেন, তার স্ত্রী এবং তাদের দুই মেয়ে। আমার গাড়িতে আমি এবং জায়গিরদার, আগের মতোই। তবে বঙ্গবন্ধু ও ডক্টর কামালের সুটকেস, যা দু-একটি ছিল তা আমার গাড়িতে উঠালাম। তাতেই আমি, বাংলাদেশ মিশনের দ্বিতীয় সচিব মহিউদ্দিন আহমদ দারুণ সম্মানিতবোধ করলাম।

ভিআইপি রুম থেকে বেরুতে যাব– এমন সময় দেখি, দরজায় আট-দশজন ক্যামেরাম্যান এবং সাংবাদিক এসে উপস্থিত। ইতোমধ্যে বিবিসি খবর প্রচার করা শুরু করেছে যে, পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনসের একটি বিশেষ বিমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডনে এসে পৌঁছেছেন।

এই সাংবাদিকদের অনুরোধে বঙ্গবন্ধুকে আরও তিন-চার মিনিট সোফায় বসে কাটাতে হলো। তিনি পাইপ ধরাচ্ছেন। আমি তাঁর পাইপে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছি, এইসব চিত্র টেলিভিশনে সেদিন দেখানোও হলো। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কোনো আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার দিলেন না। তাঁর নিজের সম্পর্কেও কোনো কথা সেদিন সকালে তিনি ভিআইপি রুমে বলেননি। মাত্র এই কয়েক মিনিটের অবস্থানকালে তিনি দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কোনো ব্রিফিং পাননি, তাই তিনি এই অবস্থান নিলেন। তবে সকাল থেকেই বিবিসি এবং অন্যান্য টেলিভিশন চ্যানেলে বঙ্গবন্ধুর এই কয়েক মুহূর্তের সচিত্র খবর সারা দুনিয়াকে বিশেষ করে বাংলাদেশ ও ভারতের মানুষকে জানিয়ে দেয় যে– বঙ্গবন্ধু নিরাপদে লন্ডনে পৌঁছেছেন।

ক্ল্যারিজেস হোটেলে পৌঁছতে পৌঁছতে সাড়ে ৭টা বেজে গেল। আনুষ্ঠানিকতা তেমন কিছু ছিল না। ওখানে পৌঁছার পর যা কিছু করার সব সাদারল্যান্ডই দেখলেন। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ব্রিটিশ সরকার তখনও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের সহানুভূতি এবং জনগণের সক্রিয় সমর্থন পুরো নয় মাস বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে ছিল। সেই বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর কোথায় না গিয়ে লন্ডনে এসেছেন। বিষয়টি ব্রিটিশ সরকারের জন্যও গৌরব ও আনন্দের। সারা দুনিয়ার সব নিউজ বুলেটিনে এই মানুষটির লন্ডনে পৌঁছানোই এক নম্বর খবর হলো। সুতরাং ব্রিটিশ সরকার তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদা এবং সম্মান দেবে, তা-ই তো সাধারণ প্রত্যাশা।

ক্ল্যারিজেস হোটেলের কামরাটির নম্বর এত বছর পর এখন সঠিক মনে নেই। তবে খুব সম্ভব ১১১ বা এই ধরনের কিছু একটি। পূর্ব-উত্তর কোণের দোতলার এই ভিভিআইপি সুইটে আট-দশটি কামরা ছিল। বলতে গেলে এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট। ডক্টর কামাল হোসেন দুইটি কামরা নিলেন। আর একটি বঙ্গবন্ধুর বেডরুম। অন্যগুলোর একটি তাঁর বসার ঘর, আর একটি ডাইনিং রুম, ভিভিআইপি সুইটটি এইভাবে সাজানো।

যতটুকু মনে পড়ে, তাঁর সঙ্গে এই অত ভোরে প্রথম দেখা করতে আসেন বেগম খুরশীদ (আবু সাঈদ) চৌধুরী, সঙ্গে কায়সার, যে এখন আবুল হাসান চৌধুরী নামে বেশি পরিচিত; কায়সারের ছোটো ভাই খালেদ এবং তাদের একমাত্র বোন শিরিন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী তখন লন্ডনে ছিলেন না, তিনি মাত্র তিনদিন আগে কলকাতা হয়ে ঢাকার উদ্দেশে লন্ডন ছেড়ে গেছেন।

ওই সকালের দিকে লুলু আপা, লুলু বিলকিস বানুও এসে বঙ্গবন্ধুকে সালাম জানিয়ে গেলেন। যুক্তরাজ্যে সেই একাত্তরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এক বিরাট শক্তি ছিলেন এই লুলু বিলকিস বানু, পঞ্চাশের দশকে ভিকারুননেসা নূন স্কুলের হেড মিস্ট্রেস।

ক্ল্যারিজেস হোটেলে পৌঁছে আমরা বাংলাদেশ দূতাবাসের তিনজন দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি করছি। দূতাবাসের অন্যসব কর্মকর্তাকে খবর দিয়েছি ইতোমধ্যে। কর্মচারীদের সবাইকেও ডেকে পাঠিয়েছি। হোটেলে আমাদের অফিস হিসেবে আলাদা একটি কামরা পেলাম, একটু দূরে। '৭১-এ লন্ডনে আমাদের প্রেস বিভাগের প্রধান মহিউদ্দিন চৌধুরী (একসময় ঢাকায় পিআইএ'র জনসংযোগ কর্মকর্তা) এই কামরার দায়িত্বে থাকলেন। বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ওখানেই তিনি প্রথম অভ্যর্থনা জানাবেন। সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ওখানে বসিয়ে বঙ্গবন্ধুর সুইটে আমাদের খবর দিবেন। তারপর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। ২৪ নম্বর পেম্ব্রিজ গার্ডেনে আমাদের সেই বাংলাদেশ মিশনের দায়িত্ব দেওয়া হলো আনোয়ার হাশিমকে। এই ঠিকানায় যত সব টেলিফোন, টেলিগ্রাম এবং চিঠি আসবে, তিনি ওগুলো ওখানে গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ওই এত সকালে বঙ্গবন্ধুর বসার ঘরে একজনকে দেখে আমি সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। মনে হলো সরাসরি ঢুকে পড়েছেন। অবশ্য তখনও বঙ্গবন্ধুর কামরায় ঢোকার ওপর কড়াকড়ি আরোপ করা হয়নি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাকে পুরো সৌজন্য দেখিয়ে কথা বলছেন। ভাষা আন্দোলনের সময় এই ডক্টর ওসমান গনি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রভোস্ট হিসেবে বীরোচিত ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু ষাটের দশকে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর মোনায়েম খান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এই ডক্টর ওসমান গনির পৃষ্ঠপোষকতায় এনএসএফ নামের ছাত্র সংগঠনটি যেন একটি দানব হিসেবে জনজীবন বিপন্ন করে তুলেছিল। ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে ডক্টর ওসমান গনির ন্যক্কারজনক ভূমিকা তার আগের ভাষা আন্দোলনের ভূমিকাকে একেবারেই ম্লান করে দিয়েছিল।

আইয়ুব, মোনায়েম খানের প্রতি ডক্টর ওসমান গনির এমন আনুগত্য এবং একান্ত নিবেদিত সেবার স্বীকৃতি হিসেবে শেষদিকে তিনি তাঞ্জানিয়ায় পাকিস্তানের হাইকমিশনার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শেষে সেই হাইকমিশনার এখন লন্ডন এসেছেন। দুই-তিন মাস আগে তাকে আমাদের বাংলাদেশ মিশনেও দেখেছি, মনে পড়ল।

কিন্তু এই অত ভোরে ক্ল্যারিজেস হোটেলে তাকে বঙ্গবন্ধুর কামরায় দেখার জন্য একেবারেই মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম না। কিছুক্ষণ পর ডক্টর ওসমান গনি বিদায় হলেন। বঙ্গবন্ধু আবারও তাকে সম্পূর্ণ সম্মান জানিয়ে বিদায় দিলেন। এখানেই তো সেই বিরাটদেহী মানুষটির প্রকাণ্ড হৃদয় সম্পর্কে একটু ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর তুলনায় অন্যসব মানুষ, আমরা তো 'লিলিপুট'– ক্ষমা নামের বস্তুটি সাধারণভাবে সাধারণ মানুষগুলোর কাছে তত সুলভ নয়।

ডক্টর ওসমান গনির বেলায়ও তাই ঘটল। বঙ্গবন্ধু তো হৃদয়ের প্রসারতা দিয়ে ওসমান গনিকে মাফ করে দিলেন; কিন্তু সাধারণ বাঙালি সেদিন ডক্টর ওসমান গনিকে ছেড়ে দেয়নি। কিছুক্ষণ পর, তখন ব্রিটেনের একজন বাঙালি ছাত্রনেতা, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একজন সক্রিয় কর্মী এবং বিএনপি নেতা ডক্টর খন্দকার মোশাররফ হোসেনের কাছ যে চাক্ষুষ বিবরণটি পেলাম, সেটি এমন– ডক্টর ওসমান গনি ক্ল্যারিজেস হোটেল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। রাস্তার ওপাশের ফুটপাতে

ইতোমধ্যে কয়েক হাজার মানুষ জড়ো হয়েছে। একটু গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি তখনও হচ্ছে। এই জনতা সামলাতে ইতোমধ্যে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে অশ্বারোহী পুলিশ এসে গেছে।

আমরা ওপরে বঙ্গবন্ধুর সুইটের 'ব্যালকনি' থেকে সমবেত মানুষ দেখছি। আর এই জনতার সামনে এই অশ্বারোহী পুলিশগুলো এদিক থেকে সেদিক এবং সেদিক থেকে এদিক করছে, তা-ও দেখছি। ডক্টর ওসমান গনিকে দেখেই এই জনতার কোনো একজন চিৎকার করে উঠলেন, এই যে ডক্টর ওসমান গনি যায়। সঙ্গে সঙ্গে সকলের দৃষ্টি পড়ল বুড়ো মানুষটির প্রতি। না, বুড়ো বলে সেদিন ক্ষুব্ধ বাঙালি তাকে ছেড়ে দেয়নি। কয়েকজন ছুটে গিয়ে তাকে কিল-ঘুসি মারতে মারতে ওই রাস্তাতেই শুইয়ে ফেলল এবং সেদিন ওই ব্রিটিশ অশ্বারোহী পুলিশ ডক্টর ওসমান গনিকে রক্ষা করেছিল। এই ঘটনার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বিবিসি প্রতি ঘণ্টার নিউজ বুলেটিনে ডক্টর ওসমান গনির নাম না নিয়ে এই ঘটনার বর্ণনা দিতে থাকে।

> যে বিশিষ্ট মানুষটিকে বঙ্গবন্ধুর কামরায় দেখলাম, তার জন্যও প্রস্তুত ছিলাম না। টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে দেখতে তাকে 'গড'-এর স্তরে উঠিয়ে ফেলেছিলাম আমরা এবং সারা দুনিয়ার আরও লাখ লাখ দর্শক।
>
> ডেভিড ফ্রস্টের কথা বলছি

ডক্টর ওসমান গনির মৃত্যুর দিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছ থেকে আমি টেলিফোন পেয়েছিলাম। আমি তখন কৃষি মন্ত্রণালয়ে যুগ্মসচিব। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ তখন দেশের শক্তিমান রাষ্ট্রপতি। ওসমান গনির মৃত্যুতে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ একটি বাণী দেবেন। বাণী তৈরির কাজে জেনারেল এরশাদের প্রেস বিভাগ তখন খুব সক্রিয়। তারা খোঁজ করছেন ডক্টর ওসমান গনির মুক্তিযুদ্ধে কী ভূমিকা ছিল। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কয়েকজনের সঙ্গে তারা কথা বলেছিলেন। কেউ তেমন সঠিক তথ্য দিতে পারেননি। ডক্টর ওসমান গনি সম্পর্কে আমি কিছু জানি কি না, ফরেন মিনিস্ট্রির এই কর্মকর্তা তা জানতে তখন আমাকে টেলিফোন করেন।

ক্ল্যারিজেস হোটেলের সামনের রাস্তার উপর সংঘটিত এই ঘটনাটিও সেদিন ওই কর্মকর্তাকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু এমন ঘটনা কি আর রাষ্ট্রপতির শোকবাণীতে উল্লেখ করা যায়? এই ঘটনা উল্লেখ করা হয়নি, তবে প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ডক্টর ওসমান গনির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন সেদিন। ডক্টর ওসমান গনির ওই স্মৃতিটুকু মনে পড়লে, আমার আরও মনে পড়ে, প্রায় মানুষকেই তার অপকর্মের জন্য একদিন না একদিন জবাবদিহি করতে হবে।

ডক্টর ওসমান গনির পর যে বিশিষ্ট মানুষটিকে বঙ্গবন্ধুর কামরায় দেখলাম, তার জন্যও প্রস্তুত ছিলাম না। টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে দেখতে তাকে 'গড'-এর স্তরে উঠিয়ে ফেলেছিলাম আমরা এবং সারা দুনিয়ার আরও লাখ লাখ দর্শক।

ডেভিড ফ্রস্টের কথা বলছি। সেই সকালেই এসে উপস্থিত। একটি মাত্র অনুরোধ, বঙ্গবন্ধুর একটি সাক্ষাৎকার চাই। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন, বঙ্গবন্ধু তখন পর্যন্ত কোনো সাক্ষাৎকার কাউকে দেননি। সুতরাং যিনিই প্রথম সাক্ষাৎকারটি পাবেন, তিনি একটি স্কুপ পেয়ে গেলেন। ডেভিড ফ্রস্টকে দেখে আমরা আবার গর্বিত হলাম। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের সাক্ষাৎকার নিতে এসেছেন সারা দুনিয়ার মশহুর টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব ডেভিড ফ্রস্ট।

বঙ্গবন্ধু ফ্রস্টকেও আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন, একান্ত আপনজনের মতো কথা বললেন ফ্রস্টের সঙ্গে। পরে আমরা কারণটি বুঝেছিলাম, কয়েকদিন পর লন্ডন টাইমসে একটি খবর পড়ে। ওই ষাটের দশকে 'ফ্রস্ট রিপোর্ট' নামে যে অনুষ্ঠানটি ঢাকা টেলিভিশনে দেখানো হতো, বঙ্গবন্ধু তা নিয়মিত দেখতেন এবং তিনিও একজন ফ্রস্টভক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

ফ্রস্টের অনুষ্ঠান তখন কয়েক মাস ব্রিটিশ টিভি চ্যানেলে বন্ধ ছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে ফ্রস্ট প্রস্তাব করলেন, তিনি বিশ্ববিখ্যাত লোকদের সাক্ষাৎকার নিয়ে আরেকটি নতুন সিরিজ শুরু করার পরিকল্পনা করেছেন এবং বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকার দিয়ে সিরিজের শুরু করতে চান। এমন প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধুও খুশি হলেন। বললেন, তোমার এক ঘণ্টার সাক্ষাৎকার তো আর এখানে হতে পারে না। এখানে এত লোকজন। এছাড়া এতক্ষণ সময় তো আমি তোমাকে দিতে পারব না এখন। ঠিক আছে, আমার মেহমান হিসেবে বাংলাদেশে এসে যাও, যতক্ষণ তুমি আমার সঙ্গে থাকতে চাও এবং ঘুরতে চাও, ততক্ষণ সময় তুমি পাবে। এরপর ফ্রস্টের প্রশ্ন, আমি কখন আসতে পারি। বঙ্গবন্ধুর তাৎক্ষণিক জবাব, তুমি যেদিন আসতে পার, যখনই আসতে পার। দুই-তিনদিন পরই ফ্রস্ট বাংলাদেশে তার ক্রু নিয়ে হাজির হয়েছিলেন এবং ওই জানুয়ারির শেষদিকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারটি দিয়েই তার নতুন সিরিজ বিবিসিতে শুরু হয়েছিল। ওই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধুর মুখ থেকে তাঁর নিজের এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা পান পৃথিবীর কোটি কোটি টেলিভিশন দর্শক।

পরে এই সাক্ষাৎকারের একটি টেপের জন্য বিবিসি'কে আমরা অনুরোধ করেছিলাম। কয়েক সের ওজনের এই টেপটি আমাদের মিশনের সেকেন্ড সেক্রেটারি ফজলুল করিম পুরো পথ হাতে করে নিয়ে এসেছিলেন ঢাকায়। ফজলুল করিমকে তখন ঢাকায় বদলি করা হয়েছিল। এই টেপটিই পরে আমাদের টিভিতে দেখানো হয়েছিল।

ডেভিড ফ্রস্ট নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর ইতোমধ্যে ঝগড়াও হয়ে গেল একটি– অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস এবং তসদ্দুক আহমদের মধ্যে। অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস সম্পর্কে এই দেশের মানুষ কমবেশি অবহিত। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে গণহত্যার ওপর লন্ডনের সবচাইতে প্রভাবশালী রবিবাসরীয় পত্রিকা সানডে টাইমসে জুন বা জুলাইয়ে

প্রকাশিত তার একটি চাক্ষুষ প্রতিবেদন সারা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সেই চাক্ষুষ প্রতিবেদনটি পরে 'দ্য রেপ অব বাংলাদেশ' নামের বইটিতে প্রকাশিত হয়েছিল।

সেই সকালে আমরা কয়েকজন দেখছি অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস দাবি করছেন, তিনি বঙ্গবন্ধুর খুব ঘনিষ্ঠ। সোহরাওয়ার্দীকে তিনি পাপা ডাকতেন এবং বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দী সাহেবের একনিষ্ঠ শিষ্য। সেই সুবাদে ম্যাসকারেনহাস এবং বঙ্গবন্ধুর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা অনেক দিনের। আর তসদ্দুক ভাইও কম যান না। তসদ্দুক ভাইয়ের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠতা চল্লিশের দশকের শেষদিক থেকে। পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে তসদ্দুক ভাই লন্ডনে চলে আসেন। লন্ডনে বাঙালি কর্মকাণ্ডের প্রতিটির সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং সক্রিয়। বঙ্গবন্ধু এর আগে যতবারই লন্ডনে এসেছেন তসদ্দুক ভাইও তাঁর দেখাশোনা করেছেন।

তসদ্দুক ভাই বলতে চান, বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই তার গতিবিধি ক্ল্যারিজেস হোটেলের মধ্যেও নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। যে কোনো লোক ইচ্ছা করলেই তাঁর কামরায় ঢুকতে পারে না। আর যে কেউ এলেই বঙ্গবন্ধুকে তাঁর বেডরুমে খবর দিয়ে বের করে আনা ঠিক হচ্ছে না।

ম্যাসকারেনহাস এবং তসদ্দুক আহমদ দুজনই বঙ্গবন্ধুর ভক্ত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে দুজনেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বঙ্গবন্ধুর এই নিরাপত্তা প্রশ্নে তাদের দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হলো; কিন্তু আমাদের হস্তক্ষেপে বেশিদূর গড়াল না। তাই বলে ম্যাসকারেনহাস তার রাগ দমাতে পারছিলেন না। আমাকে একটু দূরে টেনে নিয়ে বললেন, To hell with Tassadduq Ahmed's security arrangements. আমি তাকে শান্ত হতে বলি এবং অনুরোধ করি কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার সাক্ষাৎকারের একটি ব্যবস্থা হবে। ইতোমধ্যে ম্যাসকারেনহাস সানডে টাইমসের অফিসে টেলিফোন করে সেই গণহত্যার লোমহর্ষক বর্ণনার কপিটি আনিয়ে নিয়েছে। ওটিই তিনি বঙ্গবন্ধুকে উপহার দেবেন।

কিছুক্ষণ পর বিবিসির সিরাজুর রহমানেরও একটি মাত্র অনুরোধ, এই মাইক্রোফোনে আপনি ভালো আছেন, শুধু এই কথাটি বলে দিন। রেজাউল করিম সাহেব তা হতে দেবেন না। সিরাজুর রহমানও এই 'স্কুপ' মিস করতে চান না। রেজাউল করিম সাহেবের বিবেচনা হচ্ছে, দুপুর ১টার সময় একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে নিচের একটি হল ঘরে। এখন যদি বঙ্গবন্ধু কিছু বলে ফেলেন, তখন ওই সংবাদ সম্মেলনের গুরুত্ব কমে যাবে। বলে-কয়ে সিরাজ ভাইকে নিবৃত্ত করা গেল; কিন্তু তিনি অবশ্যই খুশি হলেন না। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার এত বছরের ঘনিষ্ঠতা, ও তো সাধারণ কোনো বিষয় নয়।

মিনহাজ ভাই– জনাব মিনহাজুদ্দিন– যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা এবং বঙ্গবন্ধুর একজন ঘনিষ্ঠ মানুষ এলেন দশটার দিকে, থাকলেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে গভীর রাত পর্যন্ত। আইনজীবী টমাস উইলিয়ামস কিউসি এসেছিলেন। তাঁকে লন্ডন থেকে পাঠানোর বিষয় যে কয়েকজন বঙ্গবন্ধুভক্ত উদ্যোগ নিয়ে টাকাপয়সা দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে এই মিনহাজুদ্দিন একজন ছিলেন। একাত্তরে মিনহাজ ভাইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ব্রিটেনে।

আপা পন্থ লন্ডনে তখন ভারতীয় হাইকমিশনার, সঙ্গে আইপি খোসলা (পরে বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনার), ভারতীয় হাইকমিশনের পলিটিক্যাল কাউন্সেলর, আরও আছেন ভারতীয় হাইকমিশনের আরেকজন কর্মকর্তা ব্যানার্জি, আমাদের সঙ্গে যার সরাসরি যোগাযোগ ছিল সেই আমলে। আমরা তার নাম দিয়েছিলাম ডাক্তার হোসেন।

আপা পন্থ একটির পর একটি মেসেজ দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধুকে, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং খুব সম্ভব ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরির কাছ থেকে। মিসেস গান্ধী তখন বোধহয় দিল্লিতে ছিলেন না। দিল্লির বাইরে কোনো এক প্রদেশে তিনি সেদিন সফরে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু লন্ডনে পৌঁছেছেন শোনামাত্রই তিনি বঙ্গবন্ধুকে টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন, আপা পন্থ খবর দিলেন। পরে তারা দুজন ওইদিনই টেলিফোনে কথা বলেছিলেন; বঙ্গবন্ধু মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে মিসেস গান্ধীর ব্যক্তিগত, ভারত সরকার এবং ভারতীয় জনগণের বিভিন্ন রকমের সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

রেজাউল করিম সাহেব ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধুকে টেলিফোনে কানেকশন দিয়েছেন বেগম মুজিবের সঙ্গে। আমরা তখন কেউ তাঁর বেডরুমে ছিলাম না। তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলছেন, আমরা শুনেছি, তাজ কাঁদিসনে, আমি এসে গেছি। শিগগির তোদের সঙ্গে দেখা হবে, ইনশা আল্লাহ।

পিটার শোর, এক বাঙালি প্রেমিক শ্রমিকদলীয় কমন সভার সদস্য। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ব্রিটেনে কত বড়ো এক ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি। তিনি এলেন সকালের দিকে একবার।

বিকেলের দিকে তিনি আবার আসলেন। এইবার ব্রিটিশ শ্রমিক দল নেতা হ্যারল্ড উইলসনকে নিয়ে।

কথাটি এই প্রথম শুনলাম একজন বিদেশির মুখে। আমাদের বঙ্গবন্ধুকে বলছেন, It is great to see your Excellency. একজন বিদেশি এই প্রথম বঙ্গবন্ধুকে 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট' হিসেবেও সম্বোধন করলেন।

এলেন আরনল্ড স্মিথ, কমনওয়েলথ সেক্রেটারি জেনারেল। একজন বাঙালিপ্রেমিক কানাডীয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে ব্রিটিশ সমর্থনের প্রতিবাদে জুলফিকার আলী ভুট্টো ইতোমধ্যেই পাকিস্তানকে নিয়ে কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে গেছেন। এর আগে আরনল্ড স্মিথ পাকিস্তান সফর করে ভুট্টোকে বোঝানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। এখন আরনল্ড স্মিথ চাইছেন বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্য হবে। বঙ্গবন্ধু তো এককথাতেই রাজি এবং আরনল্ড স্মিথ এই কয়েক মিনিটের আলোচনাতেই বঙ্গবন্ধুভক্ত হয়ে উঠলেন। বঙ্গবন্ধু আরনল্ড স্মিথকে বললেন, আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কমনওয়েলথে বাংলাদেশের সদস্যপদ ব্যবস্থা করতে পারেন।

আগেই বলেছি, বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের জন্য অস্থায়ীভাবে স্থাপিত অফিস দেখাশোনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মহিউদ্দিন চৌধুরী। একসময় এসে বলল, বঙ্গবন্ধুর জন্য দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে এগারো-বারোটি টেলিফোন 'কল' লাইনে অপেক্ষায় আছে বলে হোটেলের টেলিফোন অপারেটর তাকে জানিয়েছে। অপারেটর এখন কী করবে, এই সম্পর্কে নির্দেশ-পরামর্শ চায়। আমি বলি, মহিউদ্দিন চৌধুরীকেই সামলাতে হবে এই ধরনের সমস্যা।

মহিউদ্দিন চৌধুরীর তারিফ করতে হয়। ঢাকা থেকে কত বিখ্যাত বিখ্যাত লোকের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুকে কানেকশন দিতে অপারেটরকে নিষেধ করে দিয়েছিল সেদিন। সে এক প্রচণ্ড চাপ গেছে তার ওপর তখন।

টেলিফোন 'কল' এবং সাক্ষাৎকার প্রার্থীদের নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও বঙ্গবন্ধুকে সামলানো একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। বাইরে হোটেলের সামনে ফুটপাত থেকে প্রায়ই 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগান শোনা যাচ্ছে কামরার ভেতর থেকে, বঙ্গবন্ধুও শুনছেন। সবাই বঙ্গবন্ধুকে দেখতে এবং পারলে বঙ্গবন্ধুর হোটেলের কামরায় এসে তাঁকে একটু স্পর্শ করতে চায়। সকালের দিকে অবারিত দ্বার থাকলেও ভিড় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড প্রত্যেককে আর ঢুকতে দিচ্ছে না। উপরের

কামরা থেকে আমাদের ক্লিয়ারেন্স দিতে হচ্ছে অথবা আমাদের একজনকে সঙ্গে করে নিচ থেকে নিয়ে আসতে হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর চরিত্র, বঙ্গবন্ধু মানুষের ভালোবাসা দেখে অস্থির হয়ে পড়েন। এখানেও তা-ই ঘটল, তিনি পারলে ওই ব্যালকনি থেকেই বক্তৃতা দিয়ে ফেলেন। কিন্তু তা সম্ভব নয় দুই কারণে। প্রথমত, নিচে পাশ দিয়েই একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। রাস্তার ওই পারের ফুটপাতে মানুষজন দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের মানুষজন এবং অশ্বারোহী পুলিশের কারণে এমনিতেই গাড়িঘোড়ার চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। সুতরাং বক্তৃতা দেওয়া সম্ভব নয়। আর দ্বিতীয়ত, যেটি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটি ছিল, বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা। তিনি ছুটে গিয়ে ইতোমধ্যে ব্যালকনিতে দুই-তিনবার দাঁড়িয়েছেন, হাত নেড়ে সমবেত জনতার অভিনন্দনের জবাব দিয়েছেন। নিজেই জয় বাংলা স্লোগান উঠিয়েছেন একই ব্যালকনি থেকে। নিচের হাজার হাজার মানুষও তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আকাশ কাঁপিয়ে জয় বাংলা স্লোগান দিয়েছে। আশপাশের ব্রিটিশ লোকজন দেখছে; কিন্তু বুঝতে পারছে না। একসময় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লোকজন এসে আমাদের বলল, বঙ্গবন্ধুর এমন করে তাদের না জানিয়ে ব্যালকনিতে ছুটে যাওয়া তাঁর নিরাপত্তার জন্য প্রচণ্ড এক হুমকি। ছাত্রনেতা যুক্তরাজ্যে 'বাংলাদেশ স্টুডেন্টস অ্যাকশন কমিটি'র কনভেনার এজেড মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু এবং মহিউদ্দিন জায়গিরদার বঙ্গবন্ধুর দুই পাশে দাঁড়িয়ে নিরাপত্তাপ্রহরীর কাজ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কথা, ওটি কোনো নিরাপত্তাই নয়। যুক্তরাজ্যে সেই একাত্তরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এই মঞ্জু শক্তি, সাহস এবং দেশপ্রেমের আরেক উদাহরণ ছিল।

তিনি ছুটে গিয়ে ইতোমধ্যে ব্যালকনিতে দুই-তিনবার দাঁড়িয়েছেন, হাত নেড়ে সমবেত জনতার অভিনন্দনের জবাব দিয়েছেন। নিজেই জয় বাংলা স্লোগান উঠিয়েছেন একই ব্যালকনি থেকে। নিচের হাজার হাজার মানুষও তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আকাশ কাঁপিয়ে জয় বাংলা স্লোগান দিয়েছে

সেদিন দুপুর ১টার দিকে সংবাদ সম্মেলনটি হলো। কত হবে উপস্থিত সাংবাদিক এবং ক্যামেরাম্যানদের সংখ্যা, তিন শ না চার শ? আমরা কেউ গুনে দেখিনি, তবে কামরাটি ভর্তি ছিল। অনেকেই দাঁড়িয়ে থেকে প্রেস কনফারেন্সটি কাভার করেছেন, আবার অনেকেই কামরার বাইরে থেকেও নোট নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। পাকিস্তানি সাংবাদিক নাসিম আহমদকে দেখে উত্তেজিত হয়ে গেলাম আমি।

নাসিম আহমদ লন্ডনে করাচির ইংরেজি ডন পত্রিকার প্রতিনিধি ছিলেন। এমন কট্টর বাঙালিবিরোধী অথচ আজ এখানে কেন। পাকিস্তান হাইকমিশনে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কত রকমের অপমানজনক কথা বলেছেন এই নাসিম আহমদ। আমি বলি, নাসিম আহমদকে এখানে থাকতে দেওয়া যায় না। নাসিম আহমদ বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তার প্রতি একটি হুমকি। ফজলুল করিম প্রেস কনফারেন্সের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি আমার সিনিয়র, আমার এই প্রতিবাদ তিনি উপেক্ষা করলেন।

পূর্বঘোষিত সময়ের একটু পরে বঙ্গবন্ধু বসলেন তাঁর নির্ধারিত চেয়ারটিতে, আমরা কয়েকজন, মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু, যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডাক্তার আবদুল হাকিম, বাংলাদেশ লিবারেশন মুভমেন্ট স্টিয়ারিং কমিটির কনভেনার আজিজুল হক ভূঞা, সামসুল আলম, কোনো একটি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কর্মকর্তা গোলাম মাওলা, তার পেছনে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে এবং একটি বেষ্টনী রচনা করে বলতে গেলে তাঁর এই প্রথম পাবলিক ফাংশনে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকলাম।

বঙ্গবন্ধুর একপাশে ডক্টর কামাল হোসেন, আরেক পাশে রেজাউল করিম। মহিউদ্দিন চৌধুরী বসার জন্য কোনো আসন পাননি। কিন্তু এই প্রেস কনফারেন্সের অফিসিয়াল রেকর্ড রাখার জন্য কোথা থেকে একটি টেপরেকর্ডার জোগাড় করে ওটি নিয়ে বঙ্গবন্ধু এবং রেজাউল করিম সাহেবের চেয়ার দুটোর মাঝে 'ফ্লোরে' বসে বঙ্গবন্ধুর প্রেস কনফারেন্স টেপ করল। পরের দিন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এই প্রেস কনফারেন্সের ওপর প্রকাশিত ছবিতেও মহিউদ্দিন চৌধুরীর শুধু মাথাটি দেখা যাচ্ছিল।

বঙ্গবন্ধু প্রথমে একটি লিখিত বিবৃতি পড়লেন। এই বিবৃতিটি রচনা করেন মুখ্যত রেজাউল করিম; আর দেখে দেন ডক্টর কামাল হোসেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার এবং জনগণের সমর্থনের কথা তিনি উল্লেখ করলেন এই বিবৃতিতে। বাংলাদেশে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী এবং তাদের দোসররা জানমালের যে ব্যাপক ক্ষতি করেছে, এর বর্ণনা দিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে সাহায্য চাইলেন।

এই বিবৃতি চূড়ান্ত করার আগে রেজাউল করিম সাহেব বঙ্গবন্ধুকে একবার দেখিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর একটিই মন্তব্য ছিল সেদিন এই বিবৃতির ওপর। বললেন, রেজাই করিম, (বঙ্গবন্ধু রেজাউল করিম সাহেবকে রেজাই করিমই ডাকতেন) তুমি তো বলেছ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করেনি; কিন্তু ওই দেশের মানুষজন তো আমাদের পক্ষে ছিল। তো মার্কিন জনগণের সমর্থনের কথাটি এখানে লাগিয়ে দাও না।

রেজাউল করিম সাহেব তা-ই করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সেই প্রেস স্টেটমেন্টটি নিচে উদ্ধৃত করছি:

'Today, I am free to share the unbounded joy of freedom with my fellow-countrymen, who have won their freedom in an epic liberation struggle. The ultimate achievement of this struggle is the creation of the independent sovereign People's Republic of Bangladesh of which my people declared me as the President while. I was a prisoner in the condemned cell awaiting the exclusion of a sentence of hanging.

No people has had to pay as high a price in human life and suffering for their freedom as has been exacted from the people of Bangladesh. I cannot wait a single moment to return to my people. I congratulate our heroic people both at home and abroad and in particular, all sections of the Mukti Bahini who have led the people to their cherished goal of freedom. I also mourn today the sacred memory of the millions of martyrs who lost their lives in the struggle for liberation and pray to Almighty for their departed souls.

The independent sovereign People's Republic of Bangladesh which has come into existence as a result of the struggle is now an unchallengeable reality. I would like to thank all those freedom loving States who have supported our national liberation struggle, in particular India, Soviet Union, Poland and other East European countries, the United Kingdom and also those freedom loving people of the United State of America.

I now appeal to all States to extend recognition to the People's Republic of Bangladesh, to enter into diplomatic relations with her and to support her immediate admission to the United Nations.

As regards the reported talks with Mr. Bhutto, the new President of Pakistan these consisted of an appeal by Mr. Bhutto to me and to the people of Bangladesh through me to consider finding some possible link between them and the people of Bangladesh. I told him that I could not say anything about this matter until I return to no people.

I reiterate that existence of the People's Republic of Bangladesh is an unchallengeable reality and that her future relations with any other State must be based on this fundamental reality.'

বিবৃতিটি পড়া শেষে প্রশ্নোত্তরের পালা। কিন্তু প্রথম প্রশ্নটিই যে এমন হবে, সেজন্য আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। বঙ্গবন্ধুর ডান পাশে মহিউদ্দিন চৌধুরীর মতোই মাটিতে বসা শুধু মাথাটি দেখা যাচ্ছে– এক সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, আপনি দুনিয়ার সব দেশের কাছ থেকে বাংলাদেশের পুনর্বাসনে সাহায্য চাইছেন। যে কোনো দেশ আপনার সাহায্যে এগিয়ে এলে আপনি কি সেই সাহায্য গ্রহণ করবেন? বঙ্গবন্ধু ইতিবাচক জবাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এবার সাপ্লিমেন্টারি প্রশ্ন। ইসরাইল যদি এমন সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসে, আপনি কি তা গ্রহণ করবেন? কয়েক সেকেন্ড আমরা সবাই চুপ। আগেই বলেছি, এমন প্রশ্নের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। এই মানুষটি তখন বললেন, না, ইসরাইল যদি সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসে, সেই সাহায্য গ্রহণ করার আগে আমাদের চিন্তাভাবনা করতে হবে। ভদ্র কূটনৈতিক ভাষায় ইসরাইলের সাহায্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন বঙ্গবন্ধু।

সেই দিনই আরব দেশগুলোর প্রতি বঙ্গবন্ধু আমাদের পররাষ্ট্রনীতি ঘোষণা করেছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইলের অন্যায় অত্যাচারীর আচরণ, ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ইসরাইলের আরবভূমি দখল, নিজ দেশে ফিলিস্তিনিদের শরণার্থী জীবনযাপন– এসবের প্রতিবাদ হিসেবে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালনের প্রথমদিনেই তাঁর পররাষ্ট্রনীতির একটি মৌলিক স্তম্ভের ঘোষণা দিয়েছিলেন। আরববিশ্বের প্রতি আমাদের সংহতি এবং সহমর্মিতা সেদিন বঙ্গবন্ধু যেমন ঘোষণা করেছিলেন, তা আজও একই রকম অব্যাহত আছে। বঙ্গবন্ধুর আমলে এবং তারপর এমন একাত্মতা আমরা বারবার প্রকাশ করেছি।

কিন্তু প্রশ্ন, আরববিশ্ব কি তেমনভাবে বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশকে দেখেছে? বঙ্গবন্ধুকে সম্মান, মর্যাদা দিয়েছে?

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে বঙ্গবন্ধুর প্রথম সরকারি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তটি কী ছিল, এখন সেই বিষয়ে একটু বর্ণনা দিই।

মোহাম্মদ জমির সাবেক পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসের ১৯৬৮ ব্যাচের একজন সদস্য। আমার এক বছরের জুনিয়র। একাত্তরে কায়রোতে পাকিস্তান দূতাবাসে তৃতীয় সচিব হিসেবে কর্মরত ছিল জমির। মুক্তিযুদ্ধের পর চার কি পাঁচ জানুয়ারিতে জমির লন্ডনে সস্ত্রীক হাজির, বাংলাদেশ সরকারে যোগ দিতে চায়। রেজাউল করিম সাহেব এই বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না। কারণ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিবিদদের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল মুজিবনগর সরকার। এই সময়সীমার আগে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের পক্ষে বেরিয়ে আসবে, মুজিবনগর সরকারের এই সিদ্ধান্ত জমির অনুসরণ করেনি।

৮ জানুয়রি সেই সকালে জমিরও বঙ্গবন্ধুর ক্ল্যারিজেস হোটেলের কামরায় হাজির। স্বভাবতই নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত। জমিরের বাবা বিচারপতি আসির সাহেবকে বঙ্গবন্ধু ভালো করেই চিনতেন। সাবেক পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী হত্যা তদন্তের জন্য আসির সাহেবকে নিয়ে পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে একটি তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু রেজাউল করিম সাহেবকে ডেকে আনতে আমাকে হুকুম দিলেন। পাশের আরেকটি কামরায় রেজাউল করিম সাহেব কী একটি কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাকে বলতেই তিনি ছুটে এলেন। বঙ্গবন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, বিষয়টা কী রেজাউল?

রেজাউল করিম সাহেব ব্যাখ্যা করলেন, মুজিবনগর সরকারের নির্দেশটি ব্যাখ্যা করেন, জমির সেই ঘোষণা মোতাবেক ওই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আসেনি বলে এখন ওই ঘোষণার সংশোধন বা পরিবর্তন না করলে জমিরকে তো নেওয়া যাচ্ছে না।

আবারও এই মানুষটির উদারতা এবং মহানুভবতা দেখলাম। জিজ্ঞাসা করলেন, জমির বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করেনি তো? রেজাউল করিম সাহেব বললেন, না, করেনি। এইবার বঙ্গবন্ধু বললেন, ছেলে মানুষ, বউ নিয়ে এখন যাবেটা কোথায়! তাকে নিয়ে নাও। পরদিন থেকে জমির আবার বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিসের একজন সদস্য হিসেবে লন্ডনে বাংলাদেশ মিশনে যোগ দিল এবং এর কয়েকদিন পর বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে বাংলাদেশ তার প্রত্যাবর্তন এবং আমাদের সদ্যসৃষ্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তার যোগদান। জমির তারপর লিবিয়া, ইরান, লন্ডন– এসব জায়গায় আমাদের দূতাবাসে কাজ করেছে। সর্বশেষ ইসলামী সম্মেলন সংস্থার একজন ডাইরেক্টর হিসেবে প্রায় চার বছর কাজ করেছে। এখন সে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত।

এই দিন বিকালে বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সঙ্গে দেখা করতে ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে গেলেন। আমাদের মধ্যে একজন আবারও রেজাউল করিম সাহেবকে প্রশ্ন করলেন, আমাদের প্রেসিডেন্ট ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে তার বাড়িতে যাবেন কেন? এডওয়ার্ড হিথেরই তো আসা উচিত ছিল বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে; যেমনটি এসেছেন হ্যারল্ড উইলসন এবং অন্য নেতৃবৃন্দ। রেজাউল করিম সাহেব বুঝিয়ে বলেন, ব্রিটিশ সরকার এই নয় মাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে সরাসরি এবং পরোক্ষভাবে যতসব

সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েছে, তার জন্য ধন্যবাদ জানাতেই বঙ্গবন্ধু ডাউনিং স্ট্রিটে গেছেন। এতে প্রটোকল ভঙ্গ হয়নি।

বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার জন্যও ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন সময়ে পাকিস্তানের দুই শাসক, প্রথমে জেনারেল ইয়াহিয়া খান এবং গত কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর ওপর চাপ দিয়ে আসছে। বঙ্গবন্ধু মুক্ত হয়ে প্রথম লন্ডন এসেছেন এবং এখানে তাঁকে যেমন আদর-যত্ন, সম্মান দেখানো হয়েছে, এর জন্যও তো তাঁর ব্রিটিশ সরকারকে ধন্যবাদ জানানো প্রয়োজন। এছাড়া এখন পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়নি। হ্যারল্ড উইলসন শ্রমিক দলের নেতা এবং কমনস সভায় বিরোধী দলের নেতা; তিনি এসে বঙ্গবন্ধুর প্রতি যে সম্মান দেখিয়েছেন, তা ব্রিটিশ জনগণের শুভেচ্ছা প্রকাশের একটি অসাধারণ gesture, কথাটি ঠিক। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীরা তাদের শনিবার, রবিবারের উইক এন্ড কাটাতে লন্ডনের বাইরে চলে যান। এজন্য লন্ডনের কয়েক মাইল বাইরে চেকার্স নামক জায়গায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর জন্য একটি আলাদা কান্ট্রি হোমও আছে। সাধারণত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীরা শুক্রবার দিন বিকেলে ওখানে চলে যান। শনিবার এবং রবিবার এই দুই দিন তাঁরা চেকার্সে অবস্থান করেন। এই অবকাশযাপনকালেও অবশ্য তারা গুরুতর রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম দেখাশোনা করেন। জরুরি হয়ে পড়লে গুরুত্বপূর্ণ দেশি-বিদেশি ব্যক্তিরা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে ওই শনিবার, রোববার চেকার্সেই যান।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথও আগের দিন, ৭ জানুয়ারি উইক এন্ড কাটাতে চেকার্সে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরদিন ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর লন্ডন পৌঁছানোর খবর শুনে তিনি লন্ডন ফিরে আসেন এবং বিকেলে বঙ্গবন্ধুকে লন্ডনে তাঁর বাসভবনে অভ্যর্থনা জানান। বঙ্গবন্ধুর এই সাক্ষাৎকারকালে তাঁর সঙ্গে ছিলেন ডক্টর কামাল হোসেন। পরদিন রোববার ব্রিটিশ পত্রপত্রিকায় বঙ্গবন্ধুর লন্ডন কর্মসূচির ওপর যেসব ছবি ছাপা হয়, তার মধ্যে একটি ছিল প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১০ নম্বর ডাউন স্ট্রিটে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বিদায় সংবর্ধনা জানাচ্ছে, পাশে ডক্টর কামাল হোসেন।

বঙ্গবন্ধু এবং আমাদের সবার জন্য এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ও অভিজ্ঞতা ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি এই প্রথম আরেকটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের সরকারপ্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ব্রিটেনের গুরুত্ব কমে গিয়েছিল ঠিক; কিন্তু তারপরও এই দেশটি গুরুত্ব ও মর্যাদায় দুনিয়ার প্রথম সারির কয়েকটি দেশের মধ্যে অন্যতম। এই সাক্ষাৎকারকালে এডওয়ার্ড হিথ তাঁকে যেমন আন্তরিকতা দেখিয়েছিলেন, তা পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকে দেখতে ক্ল্যারিজেস হোটেলে একবার অবশ্যই এসেছিলেন, তবে আট মাস পর। বঙ্গবন্ধু সেবারও ব্রিটিশ সরকারের মেহমান। তিনি তখন তাঁর গল স্টোনের অপারেশনের জন্য লন্ডন গিয়েছিলেন। দুই নেতার মধ্যে এটি দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার ছিল। আমার কাছে একটি ছবি আছে, সেই ৪৮ বছর আগের। অনেক জায়গায় ভেঙে গেছে। কিন্তু তবুও যত্ন করে আগলে রেখেছি এই ৪৮টি বছর। এই ৪৮ বছরে কত জায়গায় গিয়েছি দিল্লি, জেনেভা, জাকার্তা, জেদ্দা, নিউইয়র্ক। আর ঢাকায়ও কতবার বাসা বদল করেছি; কিন্তু ছবিটি আমার সাথেই আছে।

বঙ্গবন্ধু এবং আমাদের সবার জন্য এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ও অভিজ্ঞতা ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি এই প্রথম আরেকটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের সরকারপ্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে হ্যারল্ড উইলসনের ছবি। দুইজনেই পাইপ ধরাচ্ছেন, বঙ্গবন্ধুর কামরায় ৮ জানুয়ারি ১৯৭২-এর বিকেলের দিকে সেই সাক্ষাৎকারকালে। পরদিন এই ছবিটি ডেইলি মেইল পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। নিচে শিরোনাম ছিল: লাইটিং আপ টাইম।

বঙ্গবন্ধু এবং সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন দুই নেতা পাশাপাশি সোফায় উপবিষ্ট। ছবিটির ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরি এমন। মহিউদ্দিন জায়গিরদার ক্ল্যারিজেস হোটেলের ভিআইপি সুইটের দরজায় ডিউটিতে আছেন। এমন সময় এই পত্রিকাটির একটি ফটোগ্রাফার দুই নেতার একটি ছবি তুলতে চেয়ে জায়গিরদারকে খুব অনুনয় করল। এই ফটোগ্রাফার এমন করে অনুনয় করল যে, জায়গিরদার পরে বলেছিলেন, তিনি এই ফটোগ্রাফারকে না করতে পারেননি। মাত্র দুই মিনিটের অনুমতি দিয়েছিলেন– ঘরে ঢুকবে, ছবি তুলবে এবং বেরিয়ে আসবে, কোনো কথা নয়। দুই মিনিটেই ছবি তুলে নিল সেই দক্ষ ফটোগ্রাফার। আর আগেই যেমন বলেছি, পরদিন এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটির ছবি ছাপা হলো এই ব্রিটিশ পত্রিকাটিতে।

এত সুন্দর ছবিটি দেখে আনোয়ার হাশিম নিজ থেকেই একটি উদ্যোগ নিলেন। ওই পত্রিকা অফিসে যোগাযোগ করে ওই ছবির একটি কপির জন্য অনুরোধ জানালেন। কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দিতে হলো আনোয়ার হাশিমকে, এই ছবির বাণিজ্যিক ব্যবহার করা হবে না– এই মর্মে একটি অঙ্গীকার দিতে হলো। ছবিটি পাওয়ার পর আনোয়ার হাশিম এটি পাঠালেন হ্যারল্ড উইলসনের ব্রিটিশ হাউস অব কমনস অফিসে, ছবিটিতে উইলসনের একটি অটোগ্রাফের জন্য। উইলসন লিখে দিলেন একটি ছোট্ট বাক্য। সেই ছবিটি যখন আমাদের মিশনে ফিরে এলো আমরা একদিকে যেমন খুব উল্লসিত, অন্যদিকে মর্মাহত। উইলসন লিখেছেন: For Sheikh Mujibur Rahman, Prime Minister of Bangladesh, in friendship and admiration. তারপর সই– Harold Wilson. সইয়ের নিচে বছরের উল্লেখ– 1972।

হ্যারল্ড উইলসন বঙ্গবন্ধুকে তার ফ্রেন্ডশিপ এবং অ্যাডমিরেশন জানিয়েছেন। একটি নতুন রাষ্ট্রের প্রতি তার শুভকামনা এবং সদিচ্ছার এমনই প্রকাশে আমরা অভিভূত হয়ে গেলাম। আমরা তাকে কিছুই লিখতে অনুরোধ করিনি, শুধু একটি অটোগ্রাফ চেয়েছিলাম। এই অটোগ্রাফসহ আমরা ছবিটি বঙ্গবন্ধুর কাছে পাঠাব ভেবেছিলাম। কিন্তু মর্মাহত হওয়ার কারণ, ডাক মারফত ছবিটি উইলসনের অফিস থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল বলে ছবিটি দুমড়েমুচড়ে গেছে। ডাকে পাঠানোর সময় উইলসন সাহেবের অফিস থেকে যথাযথভাবে প্যাক করা হয়নি বলে এমন সুন্দর ছবিটির এই অবস্থা। (হ্যারল্ড উইলসন এই ছবিটি যখন অটোগ্রাফ করে পাঠান, ততদিনে বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেছেন, তাই ছবিটিতে 'প্রাইম মিনিস্টার' লেখা।)

এই ছবি তো আর বঙ্গবন্ধুর কাছে পাঠানো যায় না। ইতোমধ্যে আনোয়ার হাশিম লন্ডন থেকে বদলি হয়ে গেছেন। এইবার আমি একটি উদ্যোগ নিলাম, আবার এই পত্রিকা অফিসে ধরনা। আবার মুচলেকা দিতে হলো যে, এই ছবির বাণিজ্যিক ব্যবহার হবে না। এইবার হাতে হাতে ছবিটি জোগাড় করে আবার উইলসনের অফিসে তার সেক্রেটারির সঙ্গে যোগাযোগ করলাম এবং আগের ছবিটির দুর্দশার কথা ব্যাখ্যা করে জিজ্ঞেস করলাম, নতুন জোগাড় করা ছবিটি পাঠালে মিস্টার উইলসন কি কষ্ট করে আরেকবার অটোগ্রাফ দেবেন? মনে পড়ে, উইলসনের প্রাইভেট সেক্রেটারি একজন হৃদয়বান মহিলা ছিলেন। বাংলাদেশের প্রতি তার নেতার মনোভাব এই মহিলা ঠিকই জানতেন। আমার কথায় রাজি হয়ে গেলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে ছবিটি নিয়ে তাকে দিলাম, সঙ্গে আগেরটিও। এটি নিতে হলো দুই কারণে, প্রথমত, ছবিটির যে এমন দুর্দশা হয়েছে, তা দেখানো দরকার। দ্বিতীয়ত, উইলসন সাহেব জানতে চেয়েছেন প্রথমবার অটোগ্রাফ দেওয়ার সময় ওই ছবিটিতে তিনি কী লিখেছিলেন এখন তার মনে নেই। প্রথম ছবিটিতে যা লেখা ছিল, তিনি আবার তা লিখে দিতে চান।

উইলসন সাহেব তো দ্বিতীয়বার এই একই লেখাগুলো লিখে দিলেন। কিন্তু সঙ্গে নতুন এক দায়িত্ব পড়ল। তিনি একটি অপ্রত্যাশিত অনুরোধ করে বসলেন। বঙ্গবন্ধুও কি তার জন্য ওই ছবিটি অটোগ্রাফ করে পাঠাবেন?

আবারও ওই পত্রিকা অফিসে তৃতীয়বারের মতো গেলাম। হ্যারল্ড উইলসনের অটোগ্রাফসহ ছবিটি বঙ্গবন্ধুর সচিবালয়ে পাঠিয়েছিলাম।

বঙ্গবন্ধুও তাঁর অটোগ্রাফসহ একটি ছবি সোনালি ফ্রেমে বাঁধাই করে আমাদের কাছে লন্ডনে পাঠিয়েছিলেন। উইলসনের অফিসে দিয়ে আসার পর সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এই ছবিটির জন্য চিঠি লিখে আমাদের ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন।

হ্যারল্ড উইলসনের সঙ্গে তোলা দুইজন পাইপ ধরাচ্ছেন– এই ছবিটি বঙ্গবন্ধু তাঁর ডেস্কের পেছনে রাখতেন। বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকারকালে এই ছবিটি তাঁর পেছনে থাকত। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত এসব সাক্ষাৎকারের অনেক ছবিতে বঙ্গবন্ধু এবং হ্যারল্ড উইলসনের এই ছবিটি দেখেছি।

১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট এই ছবিটিও ধ্বংস করা হয়।

তবে সেই দুমড়ানো-মুচড়ানো ছবিটি আমার কাছে এখনো আছে। হ্যারল্ড উইলসনও মারা গেছেন কয়েক মাস আগে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর জন্য তার নিজ হাতে ফ্রেন্ডশিপ এবং অ্যাডমিরেশন লেখা ছবিটি আমার কাছে এখনো আছে। অনেক অতি মূল্যবান জিনিসের চাইতে এই ছবিটি আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

দিন-তারিখ মনে নেই, তবে একাত্তরের সেপ্টেম্বর হবে। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী লন্ডনে অবস্থিত কিউবার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন, সঙ্গে তিনি আমাকেও নিয়েছেন। স্পষ্ট মনে পড়ে, কিউবার এই রাষ্ট্রদূত ছিলেন একজন মহিলা। দূতাবাসটি ছিল সেন্ট্রাল লন্ডনের কেনসিংটন এলাকায়। মনে আছে, গৌরিং স্ট্রিটের বাংলাদেশ লিবারেশন মুভমেন্টের জন্য গঠিত ব্রিটেনে বাঙালিদের সর্বোচ্চ সংস্থা 'স্টিয়ারিং কমিটি' অফিস থেকে দুইজন ট্যাক্সি করে হাই স্ট্রিট কেনসিংটনের একটি উইম্পি বারের সামনে নামলাম। উইম্পি বারে সস্তা লাঞ্চ সেরে দুইজন কেনসিংটনের রাস্তা ধরে সেই সেপ্টেম্বরের পড়ন্ত দুপুরে কিউবান অ্যাম্বাসিতে যাচ্ছি। স্বাধীনতাযুদ্ধ এবং তার বিভিন্ন দিক নিয়ে ট্যাক্সিতে ওঠার পর থেকেই স্যার কথা বলছেন। হাঁটতে হাঁটতে একসময় বঙ্গবন্ধুর কথা উঠতেই বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বললেন, সারা দুনিয়াতে শুধু তিনজন বাঙালি বিশ্ব আসন পেয়েছেন এবং বাঙালিদের মর্যাদা ও পরিচিতি সারা দুনিয়ায় তুলে ধরেছেন– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষ চন্দ্র বসু এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধুও তাঁর অটোগ্রাফসহ একটি ছবি সোনালি ফ্রেমে বাঁধাই করে আমাদের কাছে লন্ডনে পাঠিয়েছিলেন। উইলসনের অফিসে দিয়ে আসার পর সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এই ছবিটির জন্য চিঠি লিখে আমাদের ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন

১৯৭২-এর ৮ জানুয়ারি পূর্ববর্তী কয়েক দিনের উত্তেজনা, টেনশন এবং পরবর্তী কয়েকদিনের উন্মাদনা, আনন্দ-উৎসব এবং উল্লাস কয়েক বছর আগে অমন আর একবার দেখা গিয়েছিল, নেলসন ম্যান্ডেলার মুক্তির কয়েক দিন আগে এবং কয়েক দিন পর। নেলসন ম্যান্ডেলা ২৭ বছর জেল খেটে বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁর দেশের মানুষের ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার, নির্যাতন চলেছে অনেক দশক। তারপর প্রকৃত অর্থে তাদের স্বাধীনতা এসেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাও ৩০ লাখ মানুষের রক্তে কেনা, অনেক অত্যাচার-নির্যাতন এবং অপমানের পর অর্জিত।

**লেখক: সাবেক পররাষ্ট্র সচিব**

# বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে পূর্ণতা পেল বাঙালি জাতীয়তাবাদ

**স্বদেশ রায়**

বাঙালি নরগোষ্ঠী দীর্ঘদিনের। দ্রাবিড় এই জনগোষ্ঠীকে নিয়ে নানা মত আছে। কোথা থেকে এরা এসেছে, আর্যরা আসার আগে এরা এখানে ছিল কি না– এমনই নানান প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে নানাভাবে। তবে বাঙালি নরগোষ্ঠী আর ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্রের একটি বাঙালি জাতি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। কারণ, এই যে জাতিরাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদ, এটা সম্পূর্ণরূপে আধুনিক সভ্যতার বিষয়। পশ্চিমাদের হাত ধরেই আমাদের এ উপমহাদেশের চিন্তাচেতনায় এই জাতীয়তাবাদ প্রবেশ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন ভারতীয় উপমহাদেশে একটি জাতীয়তাবাদের জোয়ার ওঠে, ওই সময়ে এটি ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষাভিত্তিক স্বাতন্ত্র্য আচার-আচরণের নরগোষ্ঠীগুলো নিয়ে কেউ সেসময়ে আলাদা আলাদা জাতীয়তাবাদের বিষয়টি চিন্তা করেননি। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল– সবাই বাঙালি ছিলেন, তাঁরা বাঙালির সার্বিক চেতনার উন্নয়নে অনেক কিছু করেছেন। তাঁরা বাঙালিকে জাগিয়ে তুলেছিলেন, তবে কখনোই বাঙালি নরগোষ্ঠীকে নিয়ে আলাদা জাতীয়তাবাদের চিন্তা বা আলাদা একটি বাঙালি জাতির চিন্তা করেননি। বাংলাকে নিজের জন্মভূমি মনে করলেও নিজের দেশ মনে করেছেন ভারতবর্ষকে। জাতীয়তার ক্ষেত্রে মেনে

নিয়েছেন বা বিশ্বাস করেছেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল দুজনের লেখায় বাংলাদেশ কথাটা ঘুরে-ফিরে বারবার এলেও তাঁরা কখনোই বাঙালির একটি আলাদা রাষ্ট্র এবং সেই রাষ্ট্রের অধিবাসীদের জাতীয়তা বাঙালি– এমনটি নির্দিষ্ট করে বলেননি। বরং তাঁরা বৃহত্তর ঐক্যভূমি ভারতের মধ্যে বাংলা ও বাঙালির অবস্থানকে দেখেছিলেন।

তবে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কাজের ভেতর দিয়ে অবচেতনভাবে বা আপন জন্মভূমির শেকড় থেকে আসা চেতনার কারণে একটি বাঙালি জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। যেমন একটি জাতীয়তাবাদ তৈরি হতে ওই জাতির একটি সমৃদ্ধ সাহিত্য, নৃত্য, চিত্রকলা, গান প্রভৃতির প্রয়োজন পড়ে, অর্থাৎ আপন সংস্কৃতির একটি শক্তিশালী নান্দনিক ভূমি তখন অনিবার্য হয়ে পড়ে। এগুলো ওই নরগোষ্ঠী বা জাতির বোধকেই শুধু শানিত করে না, তাকে একটি ভিন্ন আত্মপরিচয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। বাংলা সাহিত্য মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে আধুনিক পথে ছুটতে শুরু করলেও রবীন্দ্রনাথ এই সাহিত্যকে এমন একটি ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দেন যে, ওই সাহিত্য বা চিন্তাচেতনা ধারণ করে তখন একটি আধুনিক জাতিগোষ্ঠীর মনন জেগে উঠতে পারে। তেমনিভাবে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, যামিনী রায় থেকে জয়নুল আবেদিন-কামরুল হাসান প্রমুখ এই জাতির একটি স্বাতন্ত্র্য চিত্রকলা দাঁড় করিয়ে দেন। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল দুই মিলে বাঙালির হাজার বছরের গানের ভান্ডারে নিয়ে আসেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিশেলের অজস্র গানের সম্পদ, যা একটি স্বতন্ত্র জাতিগোষ্ঠী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে অনেকটা পথ এগিয়ে দেয়। গান বা সংগীত কোনো নরগোষ্ঠীকে কতটা আত্মপরিচয় দেয়, তা আমরা আফ্রিকান-আমেরিকানদের দেখলে বুঝতে পারি। সেই কবে আফ্রিকা থেকে শিকার হিসেবে এদের নিয়ে আসা হয়েছিল আমেরিকায়। তারপর তাদের ওপর দিয়ে ইতিহাসের বহু জল গড়িয়ে গেছে। অন্যদিকে তারাও সৃষ্টি করেছে ইতিহাস। মার্টিন লুথার কিং থেকে ওবামা অবধি পৌঁছেছে তারা আমেরিকার ইতিহাসে। কিন্তু তারপরও তাদেরকে এখনো সব থেকে বেশি স্বাতন্ত্র্য দেয় যে বিষয়টি, যা ইউরোপীয়-আমেরিকান থেকে তাদের আলাদা বলে পরিচিত করে প্রতিমুহূর্তে– সেটা তাদের সংগীত। বাস্তবে তাদের শরীরের রঙের থেকেও বেশি স্বাতন্ত্র্য এনে দেয় নিজস্ব সংগীত। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল মিলে এই জারি, সারি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, বাউল ও কীর্তনের ঝাঁপিতে নিয়ে আসে আরও ঝাঁপি ঝাঁপি সংগীত। যা বাঙালিকে স্বতন্ত্র জাতি হতে অনেকটা পথ সহজে এগিয়ে দেয়। এমনইভাবে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী মিলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রগুলো একের পর এক পরিপুষ্ট হতে থাকে নানা বাঙালি মনীষীর হাত ধরে। জাতীয়তার বিষয়টি শুধু রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রকেন্দ্রিক নয়, সমাজের গভীরেও সেটা থাকে। সমাজকে শুধু ছুঁয়ে যায় না, সমাজের নানা উপকরণেও থাকে তার শেকড়। ঊনবিংশ শতাব্দীজুড়ে এমনকি বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাঙালির সমাজ-জীবনে আসে অনেক পরিবর্তন। বিশেষ করে পশ্চিমা ধাঁচের একটি জাতীয়তাবাদকে ধারণ করার জন্য যে উদারতার প্রয়োজন পড়ে, সেই উদারতা বাঙালি সমাজে বেশ ভালোভাবে স্থান নেয়। এমনকি একটি জাতি গঠনের জন্য যে উদার মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রয়োজন, তারও জন্ম ঘটে বাঙালি সমাজে।

কেউ হয়তো বাঙালি সমাজের উদারতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন, বলতে পারেন উদারতাই যদি থাকবে, তাহলে বাঙালি কেন বিংশ শতাব্দীর মাঝভাগে এসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উন্মত্ত হলো? এ প্রশ্নের উত্তর সহজে দেওয়া যায় না। কারণ বাঙালির জীবনে এ এক দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত। তাই এর উত্তর খুঁজতে হলে বেশ গভীরে গিয়ে নির্মোহ গবেষণা করতে হবে। তবে এতটা বছর পার করে আসার পরে এবং পরবর্তী অনেক বাস্তবতা থেকে বলা যায়, ওই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সমাজের গভীর থেকে ঘটেনি, তা অনেকখানি আরোপিত ছিল বা বিশেষ প্রক্রিয়ায় ঘটানো হয়েছিল। যে কারণে এটাই বাঙালি সমাজের সবটুকু পরিচয় নয়। বাঙালি সমাজে তখনও লালন, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের চেতনা জাগ্রত ছিল। তাছাড়া স্বভাবের দিক থেকে বাঙালি বাউল মনের অধিকারী বা সহজিয়া। তাই এ সমাজে সহজে উদারতাকে গ্রহণ করার একটা অন্তঃসলিল ধারা রয়ে গেছে। তারপরও ১৯৪৬ সালের এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঙালি সমাজের অনেক গভীরে নাড়া দিয়েছিল। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যেমন ভারতকে ভাগ করার কাজ প্রশস্ত করে, তেমনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে ধর্মের উগ্রতার কাছে পরাজিত করে। পরাজিত এই ভারতবর্ষে বাঙালিও তখন একটি পরাজিত ও বিধ্বস্ত নরগোষ্ঠী। আর সেসময়ে শেখ মুজিবুর রহমানও একজন পরাজিত এবং বিধ্বস্ত তরুণ। মানসিকভাবে ও আদর্শগতভাবে সম্পূর্ণ না হলেও অনেকখানি বিধ্বস্ত তিনি। কারণ, তদ্দিনে মুসলিম লীগের প্রতি তাঁর যে বিশ্বাস ছিল, সে বিশ্বাস ভেঙে গেছে। অন্যদিকে পাকিস্তান তখন প্রায় বাস্তবতা। তাই সেখান থেকে তিনি সরে আসতে পারছেন না। বুঝতে পারছেন, এ মুহূর্তে এখান থেকে সরে গেলে তিনি রাজনৈতিকভাবে সমাজের কাছ থেকে, মানুষের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন। তাই যে কোনোভাবে হোক আপাতত মানুষের সঙ্গে থাকতে হবে তাঁকে। কারণ, তদ্দিনে তাঁর নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও অনেকখানি পরাজিত একজন মানুষ। সোহরাওয়ার্দীকে মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার একটা প্রচেষ্টা ওই সময় সার্বক্ষণিক পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রযন্ত্র

একটি জাতীয়তাবাদ তৈরি হতে ওই জাতির একটি সমৃদ্ধ সাহিত্য, নৃত্য, চিত্রকলা, গান প্রভৃতির প্রয়োজন পড়ে, অর্থাৎ আপন সংস্কৃতির একটি শক্তিশালী নান্দনিক ভূমি তখন অনিবার্য হয়ে পড়ে। এগুলো ওই নরগোষ্ঠী বা জাতির বোধকেই শুধু শানিত করে না, তাকে একটি ভিন্ন আত্মপরিচয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়

থেকে করা হচ্ছিল। অবশ্য পরবর্তী সময়ে দুজনেরই রাজনীতি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, পাকিস্তান সৃষ্টির মুহূর্তে তাঁরা পরাজিত হলেও বুঝতে পেরেছিলেন, পাকিস্তান একটি সাময়িক বিষয়। পাকিস্তানকে কোনো মতেই একটি শক্ত রাজনৈতিক কেন, সঠিক রাজনৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড় করানো যাবে না। আবার পাঞ্জাব ও বাংলার দাঙ্গা যে সামাজিক ভিত্তিভূমি ভেঙে ছারখার করে দিয়েছে, তাতে নতুন কোনো পথ ছাড়া এই সমাজকে নিয়ে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া যাবে না। অন্যদিকে এই রাষ্ট্র যেমন একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হতে পারবে না, তেমনই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও হতে পারবে না। আবার ধর্মভিত্তিক কোনো জাতীয়তাবাদ যে হতে পারে না বরং সেটা কেবলই একটি অন্ধত্ব, তা ১৯৪৬ এর দাঙ্গা ও ধর্মের নামে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার ভেতর দিয়ে প্রমাণ হয়ে গেছে। তাই তখন স্বাভাবিকভাবেই এই সত্য সামনে আসে, যদি ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের জন্ম ঘটে, তাহলে পাকিস্তান নামক দেশটি সহজে ভেঙে যাবে। পাকিস্তান শুরুর পরপরই শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতি লক্ষ করলে এমন একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যা হোক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা দিয়ে এই সত্য দেখতে তাদের খুব একটা কষ্ট হয়নি। ফলে ওই বিধ্বস্ত সময়েও একটি আশার আলো জেগেছিল। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের ভেতর থেকেই তাদেরকে পরিবর্তন আনতে হবে। আর এই পরিবর্তন আনার পথে নেমে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী রাজনৈতিকভাবে শেখ মুজিবুর রহমানকে অনেকদূর এগিয়ে দিলেও শেখ মুজিবুর রহমান শুরু থেকে এককভাবে পাকিস্তানের রাজনীতিতে একটি ভিন্ন পথ নেন। সে পথটি ছিল রাজনৈতিকভাবে পশ্চিমা জাতীয়তাবাদের মতো একটি বাঙালি জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলা। আর একটি স্বাধীন রাষ্ট্রই হবে ওই জাতীয়তাবাদের অন্যতম আশ্রয়স্থল। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদের সম্পূর্ণ আশ্রয়স্থল কখনোই কেবল রাষ্ট্র হয় না– সমাজ ও সংস্কৃতি সব সময়ই জাতীয়তাবাদের অনেক বড়ো ভিত্তি। তরুণ শেখ মুজিবুর রহমান তাই পাকিস্তানের রাজনীতিতে ফিরে এসে শুধু রাজনৈতিক অঙ্গনের আন্দোলনের মধ্যে নিজ অবস্থানকে স্থির রাখেননি। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাত্রা যাতে বৃদ্ধি পায়, সেদিকে সব সময়ই তাঁর সহযোগিতা বজায় রাখেন। যে কোনো রাষ্ট্রকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলতে হলে ওই রাষ্ট্রের বা ভূখণ্ডের সমাজকে পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক হিসেবে গড়ে তুলতে হয়। এটাই ছিল ওই মুহূর্তে শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য সব থেকে কঠিন কাজ। কারণ, সাম্প্রদায়িকতার নামে তখন সবেমাত্র পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে। ওই সময়ে সেকুলারিজমের পথে হাঁটা মোটেই সহজ কাজ ছিল না। অবশ্য বাঙালি জাতি যেহেতু কোনোদিনই উগ্র সাম্প্রদায়িক নয় বরং উদার, তাই রাজনৈতিক উন্মাদনায় ধর্মের নামে পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও সমাজের গভীরে সাম্প্রদায়িকতা খুব বেশি প্রবেশ করতে পারেনি। অন্যদিকে পাকিস্তানি নেতারা বিশেষ করে জিন্নাহ ও নাজিমউদ্দিন এ কাজে কিছুটা সহযোগিতাও করেন ভাষা বিতর্ককে সামনে নিয়ে এসে। এর পাশাপাশি সমাজের মধ্যে যে বিষয়গুলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে জন্ম নিয়েছিল, তা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, পাকিস্তান আন্দোলন যতই সাম্প্রদায়িকতার দিকে ঝুঁকে গিয়েছিল, ততই প্রগতিশীল শিক্ষিত মুসলিম তরুণগোষ্ঠী এর সঙ্গে আর শতভাগ একাত্মবোধ করতে পারেনি। তাদের একটি অংশ বামপন্থার দিকে ঝুঁকে যায়। আরেকটি অংশ বামপন্থাকে ঠিক পছন্দ করতে পারেনি। তারা একটি মধ্যপন্থা বা উদারনৈতিক পন্থা খুঁজছিল। বাঙালি সমাজ যেহেতু হাজার বছর ধরে সহজিয়া, তাদের আনন্দ উপাচার সবই সহজসরল, তাই স্বাভাবিকই এখানে কোনো কট্টর জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠার পথ ছিল না। এখানে পথ খোলা ছিল একমাত্র সহজাত একটি উদার জাতীয়তাবাদ, যা মূলত বাঙালির জারি, সারি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, বাউল ও কীর্তনের মতোই সহজসরল। আপন স্বভাবগত কারণে ওই সময়ে বামপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়া এবং উদারনৈতিক মুসলিম তরুণশ্রেণি তাদের নিজ নিজ পরিমণ্ডলে একটি উদার আবহাওয়া গড়ে তোলার চেষ্টা করতে থাকে। বাঙালি বামপন্থি মুসলিম তরুণদের অনেকে দুই দিকে ঝোঁকা ছিল। একদিকে তাদের ভেতর একটি জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ছিল। অন্যদিকে তারা বামপন্থি হওয়ায় সাধারণ মানুষের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার আগ্রহে অনেক বেশি উদার ছিল। এটা তাদের কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল হতে যত না সাহায্য করে, এর থেকে বেশি সাহায্য করেছিল একজন উদার মানুষ বা ধর্মীয় রাজনীতির গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসা একজন মানুষ হওয়ার জন্য। এমনকি অবচেতনভাবে জাতীয়তাবাদের দিকে বা কায়মনোবাক্যে বাঙালি হওয়ার দিকে ঠেলে দেয়।

এমন একটি পরিবেশে ভাষা আন্দোলন একটি ল্যান্ডমার্ক হয়ে দাঁড়ায় বাঙালি জীবনে। যে ভাষা এতদিন তার জন্য সহজাত ছিল, অর্থাৎ তার চারপাশের বাতাসের মতো ছিল– ওই ভাষা হঠাৎই তার অন্তরের অন্তস্থলের একটি জাগ্রত বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ভাষা তার নিজস্ব শক্তি নিয়ে জাতীয় জীবনে জেগে ওঠার ফলে অনিবার্যই জেগে ওঠে বাঙালি সংস্কৃতি। এই সময়ে বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে দেখা যায় আরও একটি নতুন যাত্রা। অর্থাৎ যেসব তরুণ ও তরুণী বাম আদর্শকে আঁকড়ে ধরেছিল আর যারা নিজেদের উদার একটি রাজনৈতিক বা সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিল, তারা সবাই মিলে আস্তে আস্তে খুঁজতে শুরু করে বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি। বলা যেতে পারে, এটাই বাঙালির প্রথম জাতীয়তাবাদের পথচলা শুরু বা বাঙালির নিজের ঘরে ফেরা শুরু। এরা যখন বাঙালি সংস্কৃতির পথে চলতে শুরু করে, তখনও তাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না যে তারা কোন ধরনের কাঠামোর মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ খুঁজছে? সেটা কি পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে, না বাঙালির স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্রের মধ্যে? এত বছর পর এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের নানা সত্য বের হয়ে আসায় এখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে তিনি পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পর থেকেই বাঙালির এক স্বতন্ত্র আবাসভূমি খুঁজেছিলেন। তাই স্বাভাবিকই তাঁর বাঙালি জাতীয়তাবাদের পথচলাটি ছিল বাঙালির একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মধ্যে। আর একজন বড়োমাপের উদার রাজনীতিকের যা কাজ, সেটাই তাঁর ভেতর পাওয়া যায়। কোনোরূপ উগ্রতা দিয়ে তিনি কখনোই বাঙালি জাতীয়তাবাদকে জাগানোর চেষ্টা করেননি। এর একটি বড়ো কারণ হতে পারে ধর্মীয় উগ্র জাতীয়তাবাদের ফল ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রত্যক্ষ করা। তাই শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখা যায়, পঞ্চাশের দশকে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ও সমাজে যা কিছু উদারনৈতিক ঘটনা ঘটতে থাকে, তিনি সেগুলোকে সবই নিজের মধ্যে ধারণ করে চলেছেন। আর প্রতিমুহূর্তে ওই আত্মপরিচয়ের পথে চলার কাজকে রাজনৈতিক নিরাপত্তা দিয়ে চলেন তিনি।

ওই সময়ে ভাষা আন্দোলনের পরপরই বাঙালি তার নিজস্ব পরিচয়ের পথে একের পর এক পা ফেলতে থাকে। যেমন, মুসলিম লীগ সরকারের উদ্যোগে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হলে নিজেদের ধর্মের পরিচয়ের বাইরে এসে বাঙালি হিসেবে রুখে দাঁড়ানোর জন্য একদল উদার তরুণ-তরুণী এগিয়ে আসে। শেখ মুজিবুর রহমান তখন তাঁর সহযাত্রী উদার রাজনৈতিক নেতা, কর্মী ও সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে রাজনৈতিক পথে এগিয়ে আসেন। যারা রুখে দাঁড়াতে এগিয়ে এসেছিলেন, তাদের শুধু নিরাপত্তা দেন না, তাদেরকে নেতৃত্বও দেন। অর্থাৎ সমাজের এই শুভবুদ্ধিকে, বাঙালি হওয়ার পথের ঐকতানকে তিনি নিজের ভেতর ধারণ করেন, রাজনীতির ভেতর অবস্থান দেন– যা মূলত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুভাবেই বাঙালির পথযাত্রাকে সহায়তা করে।

আবার এর কিছুদিন পরেই ঢাকাকেন্দ্রিক শিক্ষিত ও অগ্রসর তরুণ-তরুণীরা বাঙালির একটি নিজস্ব নববর্ষ তৈরির পথে নামেন। এ কাজে তারা বঙ্গাব্দকেই বেছে নেন। দীর্ঘকাল ধরে ফসল উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত বাঙালির যে সাল ছিল, যেদিন সেই ফসল বিক্রির অর্থ দিয়ে নানা দায়দেনা শোধ করত আর যার ভেতর দিয়ে শুরু হতো কৃষিজীবী ও সাধারণ বাঙালি ব্যবসায়ীদের পরবর্তী বছরে প্রবেশের দিন, ওই দিনটিকে নিজস্ব নববর্ষ করার পথে নামেন তারা। ওই তরুণ ও তরুণীরা ছিলেন সাংস্কৃতিক কর্মী বা সেবী। সেখানে কোনো রাজনীতি ছিল না। বরং তারা ওই দিনটির সঙ্গে আধুনিক বিশেষ করে ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে কলকাতাকেন্দ্রিক রেনেসাঁর ফলে বাঙালি সংস্কৃতিতে যে পরিবর্তনগুলো এসেছিল, যা পূর্ণতা পেয়েছিল রবীন্দ্র-নজরুলের হাত ধরে, সেগুলোর যোগ ঘটান। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মিলে রবীন্দ্র-নজরুলের হাত সংস্কৃতিতে নতুন যে অনেক উপাদান প্রবেশের জন্য তৈরি ছিল, তাই নিয়ে তারা নতুন একটি সাংস্কৃতিক বৃক্ষের জন্ম দেওয়ার কাজে নেমে পড়েন। মূলত তারা গ্রামবাংলা থেকে বঙ্গাব্দের নতুন বছরের বৃক্ষটির শিকড় নিয়ে এসে তার সঙ্গে কলম করে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে পরিবর্তিত বাঙালি সংস্কৃতির শাখাটির। যার মাধ্যমে নতুন একটি গাছ সৃষ্টির পথে নামেন তারা। পৃথিবীর তাবৎ সংস্কৃতি এভাবেই নতুন পথে যাত্রা করে। পূর্ব বাংলায়ও ষাটের দশকের শুরুতে সেটাই ঘটেছিল।

তাদের ওই সংস্কৃতির রূপান্তর করানোকে সহজভাবে নেয়নি পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে সামরিক শাসকরা। কারণ, ততদিনে পশ্চিম পাকিস্তানকেন্দ্রিক পাকিস্তানি শাসকরা বুঝে গেছে যে বাঙালি তার নিজস্ব জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির কাজে নেমেছে। তাই তারা রাষ্ট্রযন্ত্রকে ওই তরুণ-তরুণীদের কাজের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে দিতে থাকে প্রতিমুহূর্তে। এ সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান ওই তরুণ-তরুণীদের কাজের নেতৃত্ব নেন না, এমনকি তাদের নেতৃত্ব দিতেও এগিয়ে আসেন না ঠিকই; কিন্তু তিনি হন তাদের মূল রাজনৈতিক সহায়ক। তিনি তাঁর রাজনীতিতে এবং তাঁর রাজনৈতিক দলে সংস্কৃতির ওই রূপান্তরিত রূপকে নিজস্ব বলে গ্রহণ করিয়ে তাঁর রাজনৈতিক দল ও কর্মীর মাধ্যমে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে নামেন। ফলে বাঙালির নতুন রূপের নিজস্ব নববর্ষ পালন সাধারণের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে যায়। এ কাজে শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি বাম রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোও এগিয়ে আসে। তাদেরও সহযোগিতা করেন শেখ মুজিবুর রহমান। কারণ, তদ্দিনে তিনি প্রায় একক নেতা হয়ে উঠেছেন পূর্ব বাংলায়। অন্তত একক তরুণ নেতা যে তিনি তদ্দিনে হয়ে উঠেছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না।

বাঙালি যেমন তার নিজস্ব নববর্ষকে সেদিন নবরূপ দেয়, তেমনি তারা আবার নতুন করে আঁকড়ে ধরে বাঙালি সংস্কৃতিকে। পাশাপাশি তারা আঁকড়ে ধরে, যিনি সত্যি অর্থে আধুনিক জাতীয়তাবাদের এমনকি মানবিকতাবাদের সংস্কৃতিতে পরিণত হওয়ার উপাদানের ডালি ভরে দিয়ে গেছেন– সেই রবীন্দ্রনাথকে। পাকিস্তান সরকার চেয়েছিল বাঙালি জীবন থেকে রবীন্দ্রনাথকে সরিয়ে দিতে। তারা বুঝতে পেরেছিল যত বেশি রবীন্দ্রনাথকে আঁকড়ে ধরবে বাঙালি, তত তাড়াতাড়িই তারা বাঙালি হবে। কিন্তু পাকিস্তান যে পথে বাঙালি থেকে রবীন্দ্রনাথকে আলাদা করতে চেয়েছিল, তা ছিল সম্পূর্ণ ভুল পথ। বরং পাকিস্তান সরকার যা করে, তা ছিল মূলত আগুনে ঘি ঢেলে দেওয়া। তারা জোর করে বাঙালির জীবন থেকে রবীন্দ্রনাথকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করতেই বাঙালি শিক্ষিত সমাজ ফুঁসে ওঠে। ফলে বাঙালি রবীন্দ্রনাথকে চর্চায় বা চর্যায় আঁকড়ে ধরে আরও বেশি। আর এ কথা সত্য, বাঙালিকে একটি আধুনিক বাঙালি জাতি হওয়ার জন্য যতটুকু সংস্কৃত হওয়ার দরকার, তার সিংহভাগ উপাদানই রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জাতিকে দিয়ে গেছেন। বাঙালি বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত তরুণ-তরুণী ষাটের দশকে রবীন্দ্রনাথকে তখন আপন আত্মার অংশ হিসেবে গ্রহণ করে। এ সময়ে এ কাজে সব রাজনৈতিক নিরাপত্তা শুধু শেখ মুজিবুর রহমান দেননি, তিনি অতি সহজ পথে রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যান। যেমন মহাত্মা গান্ধী রাজনীতির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন ভারত-আত্মার মহত্ত্বকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাধ্যমে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যায় রবীন্দ্রনাথের হাতে পরিবর্তিত বাঙালির আত্মপরিচয়ের বা সাংস্কৃতিক বোধের মহত্ত্ব। বাঙালি জাতীয়তাবাদের গন্তব্যে পৌঁছতে এ ছিল এক বিশাল মাপের পদক্ষেপ। যারই পরিপূর্ণ রূপ আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার আগেই অধিকাংশ রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক সংগঠন তাদের অনুষ্ঠান শুরু করছে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' এই রবীন্দ্রসংগীতটি দিয়ে। আর বঙ্গবন্ধু তদ্দিনে তাঁর ঘনিষ্ঠজনের কাছে ঘোষণা দিয়েছেন, এটাই হবে বাঙালির জাতীয় সংগীত। জাতীয় সংগীত হিসেবে আমার সোনার বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত হতে অনেক রক্তের সাগর পাড়ি দিতে হয়েছিল। তারপরও মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের অমোঘ অস্ত্র হয়েছিল 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। তবে এর আগেই যখন অধিকাংশ বাঙালি কণ্ঠে তুলে নিয়েছিল আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, তখনই বাঙালি জাতীয়তাবাদ পূর্ণতা পেয়ে যায়। আর এই অধিকাংশের কাছে পৌঁছে দিয়ে, অধিকাংশকে প্রস্তুত করে এই পূর্ণতা সেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই দিয়েছিলেন। তাই তিনিই বাংলা নামের দেশের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠাতা।

বাঙালি বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত তরুণ-তরুণী ষাটের দশকে রবীন্দ্রনাথকে তখন আপন আত্মার অংশ হিসেবে গ্রহণ করে। এ সময়ে এ কাজে সব রাজনৈতিক নিরাপত্তা শুধু শেখ মুজিবুর রহমান দেননি, তিনি অতি সহজ পথে রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যান

**লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত সিনিয়র সাংবাদিক**

# বঙ্গবন্ধু বললেন, সোনার বাংলার সঠিক সৈনিক তৈরির দায়িত্ব তোমাদের ওপর রইল

## —সৈয়দ আহমাদ ফারুখ

সৈয়দ আহমাদ ফারুখ; ছাত্ররাজনীতির মাঠ থেকে রণাঙ্গনের সৈনিক, মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএম হলের ভিপি ছিলেন। ছিলেন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের কোষাধ্যক্ষ। শেখ মণি'র সঙ্গে সাংবাদিকতা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন এবং পরবর্তী সময়ে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন প্রতিষ্ঠাকালীন আওয়ামী যুবলীগের। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা। রাজনৈতিক সূত্রেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সান্নিধ্য পেয়েছেন। কাছ থেকে পেয়েছেন নেতৃত্বের দিকনির্দেশনা। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বহু স্মৃতি এখনো তাঁকে তাড়িত করে। এসব বিষয় নিয়ে সৈয়দ আহমাদ ফারুখের সঙ্গে কথা বলেন নিরীক্ষা'র সহকারী সম্পাদক– **দুলাল আচার্য**

**প্রশ্নঃ** সাবেক ছাত্র এবং যুবনেতা হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন?

**সৈয়দ আহমাদ ফারুখঃ** মানুষের সুখ-দুঃখের সমব্যথী হওয়ার বিরল গুণাবলি নিয়েই জন্মেছিলেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমান। তাঁর জীবনদর্শন রাজনীতি-সচেতন মানুষের জন্য দারুণ এক অনুপ্রেরণা। জীবনে কখনোই অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি তিনি। বাঙালিকে কখনো বিশ্বের কাছে ছোটো হতে দেননি। ছাত্রজীবনেই তাঁর নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। ১৯৩৯ সালে অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল পরিদর্শন করতে এলে ছাত্রদের পক্ষ থেকে তাদের কাছে স্কুলের ছাদ মেরামত এবং ছাত্রাবাস নির্মাণের দাবি তুলেছিলেন শেখ মুজিব। তখনকার শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছে ন্যায্য দাবি তুলতে কুণ্ঠিত হননি সেদিনের খোকা। বলা যায়, নেতৃত্বের শুরুটা এভাবেই তাঁর। ১৯৪৬ সালে তিনি কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন আইন পরিষদে 'পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবে'– এমন ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবাদ জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের একটি ন্যায়সংগত আন্দোলনে সমর্থন জানিয়ে প্রতিবাদ করেন। শুধু তা-ই নয়, যারা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাদের বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কর্তৃপক্ষ। পরবর্তী সময়ে মুচলেকা দিয়ে অন্যরা ছাত্রত্ব বজায় রাখলেও শেখ মুজিব আপস করেননি। তিনি মুচলেকায় সই দিতে অস্বীকৃতি জানান। নীতির প্রশ্নে আপসহীন একজন শেখ মুজিবকে আমরা সেদিন চিনি, যিনি ন্যায়ের প্রশ্নে নিজের আইন পেশার ক্যারিয়ারকে তুচ্ছ করেছেন। আসলে শাসকের রক্তচক্ষুকে তিনি কখনো ভয় পাননি।

বঙ্গবন্ধু ধীরে ধীরে একটি জাতিকে সত্যিকারের স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেছেন। বলা হয়ে থাকে, যখনই কোনো মানুষ বঙ্গবন্ধুর সংস্পর্শে এসেছেন, তখনই তাদের প্রত্যেকের মনে একধরনের গভীর ছাপ রেখে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর জীবনে এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। জীবনের একটি বড়ো অংশ তিনি কাটিয়েছেন জেলখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। যে সময় বাইরের খোলা আলো-বাতাসে থেকেছেন, সেই সময়টাও পরিবারের সঙ্গে শান্তিতে বাস করতে পারেননি। শাসকের রক্তচক্ষু তাঁকে অনুসরণ করেছে ছায়ার মতো।

বঙ্গবন্ধু অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। তিনি নিশ্চিত জানতেন কোনোভাবেই পাকিস্তানিরা বাঙালিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। তাই ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ অবিচল কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' মূলত: এটিই আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রাজনৈতিক ইতিহাসে পলায়ন ও আত্মগোপনের কোনো রেকর্ড নেই। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বিকালে গোপনে ইয়াহিয়ার ঢাকা ত্যাগের সংবাদে তিনি নিশ্চিত হয়ে যান যে, ওদের সঙ্গে একই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতরে অবস্থান আর সম্ভব নয়। তিনি স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। রাত ১২টার পর পাকিস্তানি বাহিনী আসার সংবাদে বিন্দুমাত্র আতঙ্কিত না হয়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করে নিজ গৃহে অপেক্ষা করতে থাকেন। সেদিন পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করে এবং পরে পাকিস্তানে নিয়ে যায়।

সেসময় আমরা যারা ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, বঙ্গবন্ধু ছিলেন আমাদের কাছে রাজনীতির আরাধ্য পুরুষ। যাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় থাকত সমগ্র জাতি। যার অঙ্গুলিহেলনে কেঁপে উঠত সারাবাংলা। বিশেষ করে আমরা যারা তরুণ-যুবা, তাদের কাছে পরাধীন বাংলার মুক্তিদাতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন তারুণ্যের বীজমন্ত্র। তাই তাঁর নির্দেশেই মনি ভাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

**প্রশ্ন:** বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়?

**সৈয়দ আহমাদ ফারুখ:** বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ কবে কখন হয়, সঠিক তারিখ আমার মনে নেই। তবে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের অব্যবহিত পর পাকিস্তানের সম্মিলিত বিরোধী দল লাহোরে একটি সর্বদলীয় বৈঠক করে। বঙ্গবন্ধু ওই সম্মেলনের মূল অধিবেশনে পূর্ব বাংলার পক্ষে ছয়দফা উত্থাপন করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের কেউ এই ছয়দফা দাবি সভার প্রস্তাবে সংযোজন না করায় বঙ্গবন্ধু সভা থেকে বেরিয়ে আসেন এবং সাংবাদিকদের কাছে তাঁর ছয়দফা পেশ করেন। পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক অসহায়ত্বই নয়, পূর্ব বাংলার ভৌগোলিক ও সামরিক অসহায়ত্বের কথা তিনি সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরেন। '৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের ১৭ দিন বাংলার মানুষের সামরিক অসহায়ত্ব ছিল। যুদ্ধের সময় ভারত পশ্চিম পাকিস্তানের বদলে পূর্ব পাকিস্তানের দিকে হাত বাড়ালে কারোরই কিছু করার থাকত না। তখন আমি মাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি। থাকি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে।

বঙ্গবন্ধু লাহোর থেকে ফিরে আসার পর তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। আরও অনেক ছাত্রনেতার সঙ্গে আমিও ছিলাম। রাজ্জাক ভাই (আবদুর রাজ্জাক, প্রয়াত মন্ত্রী ও এমপি) আমাদের সবার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেই প্রথম এই প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা সৌম্য দর্শন এবং প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী এই নেতাকে দেখলাম। লাহোরের ঘটনাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ কণ্ঠে বললেন– 'ছয় দফাই হবে বাঙালির মুক্তির সনদ। ছয়দফা কায়েম হবেই।' সেটাই ছিল আমার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর প্রথম সাক্ষাৎ।

**প্রশ্ন:** তারপর...

**সৈয়দ আহমাদ ফারুখ:** বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পরে আরও অনেকবার দেখা হয়েছে। আইয়ুব খান অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগের কথা বলার পর আমরা ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তিনি ছাত্ররাজনীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে নানা নির্দেশনা দেন। ১৯৬৮ সালে আমি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হই। পরে ১৯৬৯ সালে আমি ছাত্রলীগের কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হই। ছাত্রলীগের কোষাধ্যক্ষ হওয়ার পর তৎকালীন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজসহ আমাদের প্রায়ই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হতো। দলের সার্বিক পরিস্থিতি, ওই সময়ে আমাদের কী করণীয়– এ সম্পর্কে আলোচনা ও দিকনির্দেশনা দিতেন। ছাত্রলীগের তখন একটি অভ্যন্তরীণ বিবাদ ছিল, যা আওয়ামী লীগেও ছিল। ছয় দফার যুক্তিকথা ও দফাগুলোকে আরও নমনীয় করা যায় কি না– এসব বিতর্ক তো ছিলই। আমরা ছিলাম বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠ সমর্থক। তাই ছয় দফার পুরো বাস্তবায়নই আমাদের লক্ষ্য ছিল।

এই প্রসঙ্গে একটি স্মৃতি খুব মনে পড়ছে। উনসত্তরের আন্দোলন চলাকালীন হঠাৎ শাহজাহান সিরাজ অসুস্থ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে ভর্তি হন। বঙ্গবন্ধু খবর শুনে আমাকে কিছু টাকা দিয়ে বললেন শাহজাহান তো অসুস্থ, তুমি টাকাগুলো ওকে দিও আর তার প্রতি লক্ষ রেখো। সেদিন বঙ্গবন্ধু আমাকে আরও কিছু করণীয় সম্পর্কে উপদেশ দেন।

সত্তরে জাতীয় নির্বাচনের কিছুদিন আগে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হল থেকে সহসভাপতি (ভিপি) নির্বাচিত হই। নির্বাচনে বিজয়ের পরে আমরা সবাই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে

যাই। সামনেই দেশে জাতীয় নির্বাচন। চারিদিকে ষড়যন্ত্র। প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের পর আওয়ামী লীগ বাদে অন্যান্য বিরোধী দল নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে বঙ্গবন্ধু এর বিরোধিতা করেন। তিনি আমাদেরকে জাতীয় নির্বাচনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে দুর্গত এলাকার রিলিফ জোরদার করার জন্য আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগসহ সবাইকে নির্দেশ দেন।

এর কিছুদিন পর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আঞ্চলিক উন্নয়ন সহযোগিতার জন্য যেসব দেশের সঙ্গে পাকিস্তানের সুসম্পর্ক (আঁতাত) আছে, সেসব দেশে শিক্ষাসফরের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর সহসভাপতিদের (ভিপি) পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রথমে সিদ্ধান্ত হয় ইরান ও তুরস্ক যাওয়ার। জাতীয় নির্বাচনের আগে দেশ ছেড়ে এই সফরে যাওয়া ঠিক হবে কি না, এ বিষয়ে আমরা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম, তাই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ডাকসুর ভিপি আ স ম আবদুর রবসহ সাক্ষাৎ করি। বঙ্গবন্ধু সব শুনে একটু হেসে বললেন, বেশিদিন থাকিস না। ওরা এই সফর লম্বা করার চেষ্টা করতে পারে। বঙ্গবন্ধুর সম্মতি পাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। আমাদের কাছে পয়সা কোথায়? ঢাকা হলের ভিপি মো. শহিদ উল্লাহ (প্রয়াত, সাবেক সংসদ সদস্য) বললেন, তুমি তো ছাত্রলীগের ট্রেজারার, চল যাওয়ার আগে বন্ধবন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি। তার কথা মতো বিদায় নিতে যাই। তিনি আমাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেই দুজনের হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে দিলেন। আমাদের মুখ ফুটে কিছুই চাইতে হয়নি।

আরেকবারের ঘটনা। শুনলে পাঠক বুঝতে পারবেন বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য ও চিন্তাধারার মর্মকথা। আগরতলা মামলা থেকে মুক্তি পেয়ে আরটিসিতে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছিল। মুক্তির আগে, প্যারোলে যাবেন নাকি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবেন, এই বিতর্কের অবসানের পরে বঙ্গবন্ধু আরটিসিতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। নেতাদের মধ্যে নানা ভিন্নতা। নানা জনের নানা মত। যাওয়ার আগে কোনো এক সন্ধ্যায় সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে আমিও ছিলাম। কেউ একজন বললেন, লিডার আমাদের ভয় লাগছে। আপনার তো ওইখানে অনেক শত্রু। আপনাকে তারা মেরেও ফেলতে পারে। এ কথা শুনেই তিনি হেসে উঠলেন। সহাস্যে বললেন, 'তা-ই যদি হয়, তাহলে তো তোমাদের আন্দোলন বাস্তবায়নই হয়ে গেল। তখন বাংলা এমনিতেই স্বাধীন হয়ে যাবে।' নিজের জীবনের তিনি কখনো পরোয়া করেননি। জীবনের বিনিময়েও বাংলার স্বাধীনতা তাঁর কাছে শ্রেয় ছিল।

তখন তিনি তাঁর একটি স্বপ্নের কথা, ইচ্ছার কথাও বলেন। তিনি বলেন, 'দেশ স্বাধীন হলে তোরা আর আওয়ামী লীগ মিলে দেশ চালাবি। তখন আমার স্বপ্ন পূরণ হয়ে যাবে। আমাকে তখন তোরা কক্সবাজারে একটি বাড়ি করে দিস। আমি সেখান থেকে দেখব তোরা কীভাবে বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলিস।' দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু ফিরে আসেন ঠিকই; কিন্তু তাঁর সেই ইচ্ছা, সেই স্বপ্নই থেকে যায়। কারণ, স্বাধীনতাবিরোধীদের চক্রান্তে বলি হয়ে যায় তাঁর সেই স্বপ্ন।

**প্রশ্ন:** শুনেছি, শেখ ফজলুল হক মনি এবং শেখ শহীদুল ইসলামের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল?

**সৈয়দ আহমাদ ফারুখ:** ছাত্রলীগেই আমার রাজনীতির হাতেখড়ি। আমাদের ছাত্ররাজনীতির সময়টাই ছিল আন্দোলন-সংগ্রামের যুগ। উনসত্তরের গণআন্দোলন থেকে শুরু করে সত্তরের নির্বাচন এবং একাত্তরের উত্তাল দিনগুলোয় রাজপথেই ছিলাম। আর রাজনৈতিক সূত্রেই আমরা খুব কাছের বন্ধু ছিলাম। ওনারা পদে সিনিয়র হলেও চলাফেরা করতাম বন্ধু-আপনজনের মতো। শেখ শহীদুল ইসলাম তখন বঙ্গবন্ধুর বাসার নিচ তলায় দক্ষিণ-পূর্ব কোণের একটি কক্ষে থাকতেন। কক্ষটি বঙ্গবন্ধুর বৈঠকখানার সঙ্গেই, পেছনের দিকে। আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিধায় আমি প্রায়ই ওখানে যেতাম। রাজনীতি ছাড়াও ব্যক্তিগত পর্যায়েও আমাদের আলাপ হতো।

মনি ভাই, রাজনীতির বাইরেও কর্মস্থলে আমরা সহকর্মী ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর নির্দেশে ভারতে প্রশিক্ষণ নিই এবং আগরতলায় তাঁর নেতৃত্বে কাজ করি।

**প্রশ্ন:** একাত্তরের উত্তাল দিনগুলোতে...

**সৈয়দ আহমাদ ফারুখ:** একাত্তরের পুরো মার্চেই ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা চলছিল। ৩ মার্চের পর একদিন সকাল, সঠিক দিন-তারিখ মনে নেই। আমরা ৩২ নম্বরে। বঙ্গবন্ধু বাসা থেকে বেরিয়ে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনার জন্য রওয়ানা হচ্ছেন। ডাকসু ভিপি আ স ম আবদুর রব বঙ্গবন্ধুর গাড়িতে স্বাধীন বাংলার নতুন পতাকাটি গাড়ির ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ডে বসাতে উদ্যত হলে রব ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আগ বাড়িয়ে খেলে ফাউল করতে যেয়ো না। সেন্টার ফরোয়ার্ডকে গোল করতে দাও বলে তিনি গাড়িতে উঠে গেলেন।'

সর্বশেষ দেখা একনজর ২৫ মার্চ সন্ধ্যায়। তিনি উপস্থিত ছাত্রনেতাদের হল ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার উপদেশ দেন। তিনি সেদিন উত্তেজিত, চিন্তিত ও ব্যস্ত ছিলেন।

**প্রশ্ন:** আপনার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং জয় বাংলা পত্রিকা?

**সৈয়দ আহমাদ ফারুখ:** মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি এসএম হল ছাত্র সংসদের ভিপি, ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষ। পড়াশোনা করি ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে। পাশাপাশি সাংবাদিকতা ইংরেজি দৈনিক দ্য পিপলে। পত্রিকাটি ছিল এই অঞ্চলের গণমানুষের ইংরেজি মুখপত্র। অবশ্য দ্য পিপলে আমি কাজ শুরু করি পত্রিকাটি যখন সাপ্তাহিক ছিল, তখন থেকেই। যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনি ছিলেন সাপ্তাহিক দ্য পিপলের বার্তা সম্পাদক। ২৫ মার্চ রাতে দ্য পিপলে আমার শেষ রিপোর্টটি জমা দিয়ে যখন বের হই, রাত তখন ১১টা। শাহবাগে অবস্থিত দ্য পিপল অফিস থেকে বের হয়ে হেঁটে সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে (ইকবাল হল) আসি। চারদিকে রাস্তাঘাটে ব্যারিকেড আর মুহুর্মুহু স্লোগানে মুখরিত, সার্জেন্ট জহুরুল হক হল তখনও সরগরম। আমাদের হলে না থাকার জন্য সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। ওই রাতেই পাকিস্তানি হানাদাররা নির্মম আঘাত হানল নিরীহ জনসাধারণের ওপর। সেই ইতিহাস সবারই জানা।

আমরা তখন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে নিরাপদ অবস্থানে। একপর্যায়ে আমরা ছাত্রলীগের কর্মীরা মিলিত হই। তখন দেশের বিভিন্ন স্থানে অল্পবিস্তর প্রতিরোধ শুরু হয়েছে। ঠিক তখনই কুমিল্লার বিশিষ্ট ছাত্রনেতা মাইনুল হুদা বলল, এভাবে চলতে পারে না। চল কিছু একটা করি। তার কাছে একটা সাইক্লোস্টাইল মেশিন আছে। ভাবলাম আমরা তো ইচ্ছে করলে আমাদের সাথীরা কোথায় কীভাবে প্রতিরোধ করছে, তা নিয়ে একটি ইশতেহার বের করতে পারি। তখন আমাদের নেতা সৈয়দ রেজাউর রহমান (আইনজীবী ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য) বলেন, ইশতেহার কেন? আমরা তো একটি পত্রিকাই প্রকাশ করতে পারি। সবাই একমত হই যে, আমরা দুই পাতার একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করব। রেজা ভাইয়ের নেতৃত্বে মাইনুল হুদা, আকবর কবীর (বর্তমানে কানাডায়), ছাত্রনেতা নাজমুল হাসান পাখী, ছাত্রনেতা রুস্তম আলী, ফজলুর রহমান ঝিনু (কবি), দীপক রায়সহ সবাই সিদ্ধান্ত নিই যে, নিজেদের খাবার পয়সা বাঁচিয়ে

পত্রিকার প্রকাশনার ব্যয়ভার বহন করব। প্রথম দুই সংখ্যা সাইক্লোস্টাইল করেই বের করা হয়। নাম দেওয়া হয় 'সাপ্তাহিক বাংলাদেশ'। সম্পাদক হিসেবে প্রথমে একটি কাল্পনিক নাম দেওয়া হয়। পরে আগরতলার একটি প্রেস থেকে তা নিয়মিত প্রকাশ করা শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে বর্তমানে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর আবদুল মান্নান চৌধুরী সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। তিনি অবশ্য ছদ্মনামই ব্যবহার করেছিলেন।

আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধব অনেকে আগরতলা শহরের কলেজটিলার কোনো এক কলেজের ভবনে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে গিয়ে শেখ ফজলুল হক মনি ভাইকে পাই। আমার যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা শুনে তিনি প্রথমে প্রবল আপত্তি করেন। বললেন ওনার সঙ্গে থাকতে হবে। পরে আমার জোরাজুরিতে মনি ভাই আমাকে মুজিব বাহিনীর গেরিলা ট্রেনিং গ্রহণের জন্য দেরাদুনে পাঠান। তখন মুজিব বাহিনী কেবল রাজনৈতিক কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত হতো। প্রথম ব্যাচে আমরা আগরতলা থেকে ২৫ জন ট্রেনিংয়ে যাই। আমাদের ২৫ জনের মধ্যে তৎকালীন ছাত্রনেতা নাজমুল হাসান পাখী, কামরুল ইসলাম (সাবেক খাদ্যমন্ত্রী), মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনসহ (বিএমএ নেতা) বৃহত্তর কুমিল্লা, সিলেট ও ঢাকার ছাত্রনেতারা ছিলেন। দেরাদুন গিয়ে দেখি ওখানে বহু ছাত্রলীগ কর্মী জড়ো হয়েছে। যথারীতি ট্রেনিং শুরু হলো। এক মাসের ট্রেনিং। বিভিন্ন ধরনের বন্দুক চালনা, বন্দুকগুলো খোলা আবার জোড়া লাগানো, বিস্ফোরকের ব্যবহার, রাতের আকাশ দেখে কীভাবে চলাফেরা করতে হবে, গভীর জঙ্গলের মধ্যে চলাফেরার অনেক কায়দাকানুন শিখলাম। ট্রেনিং শেষ। আগরতলা ফিরব। দেশের অভ্যন্তরে যাব, যুদ্ধ করব। উত্তেজনার শেষ নেই। কিন্তু হায়! ভারতীয় প্রশিক্ষকরা ইতোমধ্যে আমাদের মধ্য থেকে আটজনকে স্থানীয় প্রশিক্ষক হিসেবে নির্বাচন করলেন আমাদের ঊর্ধ্বতন নেতাদের সম্মতিতে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাসানুল হক ইনু (সাবেক তথ্যমন্ত্রী), শরীফ নুরুল আম্বিয়া, আ ফ ম মাহবুবুল হক (বাসদ নেতা), যশোরের নোয়াপাড়ার খাইরুজ্জামান, সিলেটের মোহনলাল সোম ও আমি। ফলে যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করা আর হলো না আমার। আগস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকে আমি মনি ভাইয়ের নির্দেশে আগরতলা ফিরে আসি। তখন মনি ভাই ও রেজা ভাই প্লাস ফ্যাক্টরি নামক একটি জায়গায় থাকতেন। মনি ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তিনি খুব খুশি হলেন। তিনি বললেন, 'ভালোই হলো। এবার তুমি যুদ্ধে যারা আহত হয়ে দেশ থেকে এখানে আসছে, তাদের দেখাশোনা করো। হাসপাতালগুলোয় যাও আর তাদের চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থার দায়িত্ব নাও।' মনি ভাইয়ের কথার অবাধ্য হওয়ার কোনো সুযোগই নেই। অগত্যা এবারও সশস্ত্র যুদ্ধে যাওয়া হলো না আমার। দুঃখ কেবল– আমার সঙ্গে যারা ট্রেনিং করেছে, তারা সবাই যুদ্ধ করছে। মনির চৌধুরীও (সাবেক সংসদ সদস্য ও ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি) প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ নিয়েছে আর আমি পারছি না। তবে যুদ্ধে অনেক প্রিয় কর্মীকে আমি হারিয়েছি। বন্ধু কামালের ছোটো ভাই, আমার প্রতিবেশী নিজামকে হারিয়েছি।

**প্রশ্ন:** মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধু বিষয়টি কীভাবে দেখেন?

**সৈয়দ আহমাদ ফারুখ:** দেখুন, বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ অর্জন হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা-সংগ্রাম– সবই পরিচালনা করেছেন বঙ্গবন্ধু তাঁর অসীম সাহসিকতা, দক্ষতা ও যোগ্যতায়। তাঁর ছিল মানুষকে কাছে টানার, মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার মতো অসাধারণ মোহনীয় শক্তি। অনলবর্ষী বক্তা হিসেবে তাঁর ছিল বিপুল খ্যাতি। তাঁর অকৃত্রিম দেশপ্রেম, জনগণের প্রতি গভীর ভালোবাসা, অমায়িক ব্যক্তিত্ব তাঁকে স্থান করে দিয়েছে অবিসংবাদিত নেতার সম্মানে। পাকিস্তানিদের ২৩ বছরের অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করে ৩০ লাখ মানুষের রক্তস্নান আর পাঁচ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে বাঙালি তাঁর নেতৃত্বেই স্বাধীনতা অর্জন করে। পাকিস্তানিদের সঙ্গে বাঙালির ২৩ বছরের এক অসম যুদ্ধের সমাপ্তি হয় সশস্ত্র স্বাধীনতা-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এই অসম যুদ্ধে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লড়াই করে গেছেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

সংগ্রাম আর অবদানে নিজ নিজ জাতির মুক্তিদাতা হিসেবে আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন, ভারতের মহাত্মা গান্ধী, তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক, দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা, কিউবার ফিদেল কাস্ত্রোর নাম বিশ্বখ্যাত। তাদের নামের পাশে যুক্ত আছেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দীর্ঘ সংগ্রাম আর একনিষ্ঠ সাধনার মধ্য দিয়ে তিনি আজ ইতিহাসের বরপুত্র। তাঁর জীবনাদর্শে আমরা সংগ্রামী চেতনা ও কর্মনিষ্ঠার পরিচয় পাই, যা আমাদের অনুপ্রাণিত করে। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালির বিজয়, বাংলাদেশ– কোনোটাই বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া নয়। আমি মনে করি, প্রতিটি শব্দই সমার্থক এবং একে অপরের পরিপূরক।

**প্রশ্ন:** দেশ স্বাধীনের পর?

**সৈয়দ আহমাদ ফারুখ:** দেশ স্বাধীন হলো। আমরা যার যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। আজ একটি কথা এখানে উল্লেখ না করলে মনে শান্তি পাব না। ১৯৭৪-এর কোনো একসময় বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সামরিক বাহিনী নামানো হয়। কুমিল্লায় দায়িত্বপ্রাপ্তদের মধ্যে কুখ্যাত মেজর ডালিমও ছিল। ডালিম কুমিল্লাতেই লেখাপড়া করেছে। এই সুযোগে ছাত্রজীবনে যাদের সঙ্গে পেরে উঠেনি এবং ছাত্রীদের নিয়ে তার অভদ্রতার প্রতিবাদ যারা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে, তার সহপাঠীদের বিরুদ্ধেই প্রতিশোধ নিতে নেমে পড়ে। তৎকালীন যুবনেতা সৈয়দ রেজাউর রহমান, আওয়ামী লীগ নেতা আফজাল খানসহ বিশিষ্ট ছাত্র ও আওয়ামী লীগ নেতাদের কুমিল্লা ওয়াপদা রেস্ট হাউসে নিয়ে অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন করে মেজর ডালিম। প্রতিবাদ জানাতে ঢাকাস্থ কুমিল্লার ছাত্রনেতারা একদিন সকালে সৈয়দ রেজাউর রহমানসহ আমরা বঙ্গবন্ধুর বাসায় যাই। রেজা ভাই অত্যাচারের বিবরণ দেওয়ার একপর্যায়ে সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউল্লাহও বঙ্গবন্ধুর বাসায় উপস্থিত হন। বিস্তারিত শোনার পর বঙ্গবন্ধু আমাদের শান্ত এবং আশ্বস্ত করে বলেন, 'I will see who is who and what is what? যাও, তোমরা কুমিল্লা চলে যাও।'

**প্রশ্ন:** কেন্দ্রীয় যুবলীগের রাজনীতি?

**সৈয়দ আহমাদ ফারুখ:** ১৯৭৪ সালে শেখ ফজলুল হক মনি যুবলীগ গঠন করলেন। আমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নির্বাচিত করেন। যুবলীগ গঠন হওয়ার পর আমরা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করি। এবং বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মতো সংগঠন পরিচালনা করি। তবে দুঃখের সঙ্গেই বলতে হয়, যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মনি আওয়ামী যুবলীগকে যেভাবে দেখতে চেয়েছিলেন, আজকের যুবলীগের দিকে তাকালে মন শুধু ভারাক্রান্তই হয়। দায়িত্ব পাওয়ার পর বঙ্গবন্ধু আমাদের বলেছিলেন, 'যুবসমাজকে চিত্তচাঞ্চল্য, চিত্তদৌর্বল্য পরিহার করে সোনার বাংলার সঠিক সৈনিক তৈরির দায়িত্ব তোমাদের ওপর রইল।' আমরা কি তা পেরেছি? আর এখনই বা কী দেখছি!

১৯৭৪ সালে শেখ ফজলুল হক মনি ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট নির্বাচনে রেজিস্ট্রার গ্র্যাজুয়েটদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আমাকে মনোনীত করেন। নির্বাচনে আমাদের নিরঙ্কুশ জয় হয়। বিজয়ীর বেশে আমরা দেখা করতে গেলে বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের সুফল বর্ণনা করে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেন ভবিষ্যতে কখনো ক্ষমতাসীনদের ক্রীড়নক না হয়।' সেজন্যই এই অর্ডিন্যান্স তিনি অনুমোদন করেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, ছাত্র-শিক্ষক সবাই এর সুফল পাবে।

**প্রশ্নঃ** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষের পথে দাঁড়িয়ে কী বলবেন?

**সৈয়দ আহমাদ ফারুখঃ** বঙ্গবন্ধু আজ আর আমাদের মাঝে নেই। আজকের এই দিনে আমাদের নতুন প্রজন্মকে ভাবতে হবে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাচেতনা, তাঁর জীবনদর্শন। কীভাবে বঙ্গবন্ধু 'সঠিক' অনুধাবন করতেন, জানতে হবে তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলি। আমাদের কাজকর্মের চিন্তাধারায় বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যকে মনের মণিকোঠায় স্থান দিয়ে সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে যেতে হবে। এখনো বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ সুযোগ পেলেই শুনি এবং বাজাই। ৭ মার্চের ভাষণ ছিল স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিকনির্দেশনামূলক। কিন্তু স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বঙ্গবন্ধু আরও অনেক দিকনির্দেশনামূলক ভাষণ দিয়েছেন। এই পরের ভাষণগুলো আমরা আজ আর কোনো উপলক্ষ্যেই শুনি না বা শুনতে চাই না। অথচ ওই ভাষণগুলোয় এমন অনেক কথা আছে, যা শুনলে এবং মানার চেষ্টা করলে বাংলাদেশ সত্যিই সোনার বাংলায় রূপ নিত।

তাই বলতে চাই, আসুন আমরা সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর ভাবনাগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করি। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী মন দিয়ে পড়ে বঙ্গবন্ধুকে বোঝার চেষ্টা করি। শুধু মুখে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের বাস্তবায়নের কথা বললেই হবে না, কাজের মাধ্যমেও তার প্রমাণ দিতে হবে। দেশ গঠনে, দেশের উন্নয়নে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য বঙ্গবন্ধুর ভাষণগুলোই আমাদের পথপরিদর্শক হোক।

**প্রশ্নঃ** আগামী দিনের নেতৃত্বে যে তরুণসমাজ, তাদের উদ্দেশে কিছু বলুন?

**সৈয়দ আহমাদ ফারুখঃ** বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে দেশের তরুণসমাজকে বলব, তোমরা বঙ্গবন্ধুকে উন্মুক্ত কর তাঁরই সৃষ্ট অসীমতায়। বঙ্গবন্ধুর আকাশ থেকে সরাতে হবে কালো মেঘের ছায়া। মনে রাখতে হবে– বঙ্গবন্ধু আমাদের পরিচয়, তিনিই আমাদের অস্তিত্ব। তিনিই আমাদের আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক।

তবে তরুণসমাজের চেতনায় বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত প্রতিচ্ছবি, সঠিক প্রতিবিম্ব তুলে ধরার দায়িত্ব তাদের, যারা নিজেদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শিক সৈনিক হিসেবে উপস্থাপন করেন। যারা নিজেদের বঙ্গবন্ধুর ধারক-বাহক হিসেবে পরিচয় দিয়ে উচ্ছ্বসিত হন। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রভেদে ব্যক্তিস্বার্থে তারাই আবার বঙ্গবন্ধুকে আড়ালে রাখতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। এই অবস্থার পরিবর্তন জরুরি। তরুণসমাজকে এখন শপথ নিতে হবে– এই মুজিববর্ষে দুর্নীতি, মাদক, সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার।


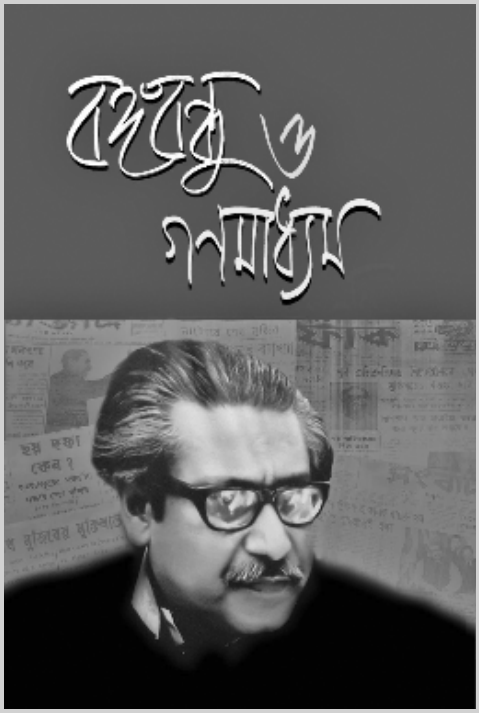


**গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য**
**পিআইবি'র প্রকাশনা**

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
**প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)**
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

# সংবিধান প্রণয়নে বঙ্গবন্ধু

## বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক

দেশে এই মর্মে একটি ভুল কথা প্রচলিত যে, ড. কামাল হোসেন সংবিধানপ্রণেতা। দুঃখের বিষয়, অনেক জ্ঞানী বিজ্ঞজনও কথাটি বলে থাকেন। অথচ এ কথা যে কত বড়ো ভ্রান্তিকর, তা সবারই জানা দরকার। এটি নিশ্চিত করেই বলা যায়, একটি স্বার্থান্বেষী মহল কথাটি উদ্দেশ্যমূলকভাবেই ছড়িয়েছে।

বাস্তবতা হলো, দেশে ফিরেই বঙ্গবন্ধু যে কাজটিকে প্রাধান্য দিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, তা সংবিধান প্রণয়ন। এ উদ্দেশ্যে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ৩৪ জন গণপরিষদ সদস্যের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। এই ৩৪ সদস্যের মধ্যে ছিলেন ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, অ্যাডভোকেট সিরাজুল হক, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ প্রমুখ। ড. কামাল ছিলেন ওই ৩৪ জনের একজন।

আইন বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রচণ্ড ঝোঁক ছিল। তাই তিনি আইনের কোর্সে ভর্তিও হয়েছিলেন। পড়াশোনাও করেছিলেন; কিন্তু যে মানুষটি জীবনের একটি বড়ো অংশ জেলে কাটিয়েছেন, দেশের মানুষের মুক্তির জন্য প্রতিদিনের বেশির ভাগ সময় আন্দোলন-সংগ্রামে কাটিয়েছেন, তাঁর পক্ষে সেই কোর্স শেষ করার সুযোগ নিশ্চয়ই ছিল না। আইন পাস না করলেও আইনের ওপর বিশেষ করে সংবিধানবিষয়ক আইনে তাঁর

চমকপ্রদ ব্যাপ্তি ছিল বিভিন্ন কারণে। প্রথমত, তিনি উপমহাদেশের বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ব্যারিস্টার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠজন ছিলেন এবং তার কাছ থেকে আইনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেন। দ্বিতীয়ত, সারাজীবন তিনি পাকিস্তানি শাসকদের থেকে বহু মামলা খাওয়ার কারণেও তাঁকে আইনের জ্ঞান নিতে হয়েছে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনার জন্য বিলেতের ব্যারিস্টার থমাস উইলিয়ামসন সেদেশের হাইকোর্টে বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি নিজেও বঙ্গবন্ধুর আইনি জ্ঞান অবলোকন করে অবাক হয়েছিলেন বলে অনেকের কাছে শুনেছি। ব্যারিস্টার আমীর, সুরঞ্জিত বাবু, অ্যাডভোকেট সিরাজুল হক, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ প্রমুখের মুখেও শুনেছি বঙ্গবন্ধুর আইনি জবানের প্রশংসা।

১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি লন্ডনের ক্ল্যারিজেস হোটেলে বঙ্গবন্ধুকে দেখতে যাওয়ার এক বিরল সুযোগ পেয়েছিলাম। সেদিন উপস্থিত বাঙালিদের সঙ্গে আলাপচারিতায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন তাঁর প্রধান কাজগুলোর অন্যতম হবে সংবিধান প্রণয়নে হাত দেওয়া। আরও বলেছিলেন, এটি হবে এমনই এক সংবিধান, যেখানে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের সবকটি বিধান থাকবে, থাকবে অসাম্প্রদায়িকতার কথা, ধর্মনিরপেক্ষতার নিশ্চয়তা, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের কথা, থাকবে সাম্যের কথা, রাষ্ট্রের চিকিৎসার দায়িত্বের কথা, গণতন্ত্রের নিশ্চয়তা ইত্যাদি। আরও বলেছিলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবিধান ঘেঁটে তিনি সেসব বিধান যাচাই করবেন যা জনমঙ্গলকর। তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু জরুরি ভিত্তিতে সংবিধান রচনার কাজ হাতে নেন এবং সবাইকে বিস্মিত করে মাত্র ৯ মাসে এমন একটি সংবিধান উপহার দিলেন, যেটি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। অথচ পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচনায় লেগেছিল ৯ বছর আর ভারতের প্রয়োজন হয়েছিল আড়াই বছর; যদিও ড. আমবেদকারের মতো প্রজ্ঞাবান আইনজ্ঞ এর রচনায় মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন। বাহাত্তরে অনেক নিন্দুক বিশেষ করে স্বাধীনতাবিরোধীরা বলতেন, এত অল্প সময়ে রচিত সংবিধানে অনেক ত্রুটি থাকবে। সময় তাদের মুখে কালিমা দিয়ে প্রমাণ করেছিল যে, এটি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান– সব অর্থে।

তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু জরুরি ভিত্তিতে সংবিধান রচনার কাজ হাতে নেন এবং সবাইকে বিস্মিত করে মাত্র ৯ মাসে এমন একটি সংবিধান উপহার দিলেন, যেটি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে

ড. কামাল এই সংবিধান প্রণয়নে গঠিত ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির একজন সদস্য, সেসময় মন্ত্রী ছিলেন বিধায় পদাধিকারবলে তিনি ওই কমিটির চেয়ার ছিলেন। চেয়ারম্যানের মুখ্য দায়িত্ব থাকে সভা ডাকা, মুলতুবি করে সদস্যদের থেকে খসড়া গ্রহণ করা ইত্যাদি। এককভাবে খসড়া চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নয় এবং তিনি তা করেননিও। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ থেকে পরিষ্কার সংবিধানের খসড়া প্রণয়নে ওই ৩৪ জন এবং কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ভূমিকা রেখেছিলেন। যে কারণে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে ওই ৩৪ জন এবং অধ্যাপকদের ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন।

ড. কামালের চেয়ে বরং ব্যারিস্টার আমীর, সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের ভূমিকা বেশি কার্যকর ছিল এই অর্থে যে, ব্যারিস্টার আমীর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের খসড়া তৈরি করেছিলেন। সংবিধান প্রণয়নে সেটিকে প্রাথমিক রূপরেখা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আর সুরঞ্জিত বাবু বহু সংশোধনী এনে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন। কিন্তু সবার চেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রেখেছিলেন স্বয়ং বঙ্গবন্ধু। অধ্যাপক আবু সাইয়িদ থেকে শুনেছি, বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন দেশের সংবিধান সংগ্রহ করে সেগুলোর মধ্য থেকে জনমঙ্গলকর বিধানগুলো চিহ্নিত করে কমিটির ৩৪ সদস্যের মধ্যে বিতরণ করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি প্রতিনিয়ত ওই ৩৪ জনকে নির্দেশনা দিতেন এবং মতবিনিময় করতেন। সোজা কথায়– মূল তদারকির দায়িত্বে তিনিই ছিলেন। বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ থেকে শুনেছি, খসড়া সংবিধানটি গণপরিষদে উপস্থাপনের আগে বঙ্গবন্ধু ওই ৩৪ সদস্য এবং অধ্যাপকদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকে বসেছিলেন ভাওয়াল এলাকায়। বৈঠকে খসড়াটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা-পর্যালোচনায় আসে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ও নির্দেশনায়। ওই বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শুধু খসড়াটি পর্যালোচনাই করেননি, তিনি নিজে অনেক কিছু যোগ ও সংশোধন করেছিলেন। তোফায়েল আহমেদ তখন বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সচিব হিসেবে তাঁর সঙ্গে ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

গণতন্ত্রের জন্য আজীবন সংগ্রামী বঙ্গবন্ধু নিশ্চিত করেছিলেন সংবিধান হবে গণতন্ত্রের রক্ষাকবজ। সকল ক্ষমতার মালিক হবে জনগণ। এ কথা তিনি কমিটির সদস্যদের পরিষ্কার ভাষায় বলে গিয়েছিলেন, যার ফলে সংবিধানে ৭ অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। এই বিধানের কারণে আমাদের সংবিধান অনন্য।

গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং ধর্মনিরপেক্ষতার বিধানগুলোর ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন বিধায় সংবিধানের ২৬ থেকে ৪৪– এই ১৮টি অনুচ্ছেদে শুধু মানবাধিকারই নিশ্চিত করেননি, ৪৪ এবং ১০২ অনুচ্ছেদ সংযোজন করেছিলেন এটি নিশ্চিত করতে যাতে মানবাধিকার ভঙ্গের বিরুদ্ধে মানুষ হাইকোর্টের আদেশ পেতে পারে। কেউ যেন হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা অমান্য করতে না পারে, সেজন্য তিনি ১০৮ অনুচ্ছেদ দ্বারা হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টকে ক্ষমতা দিয়েছেন অমান্যকারীদের শাস্তি দিতে।

আমাদের সাংবিধানিক ধারায় গণতন্ত্র ছাড়া অন্য কোনো পন্থা যে প্রয়োগ হতে পারে না, সেকথা হাইকোর্ট এবং আপিল বিভাগ

দ্বিধাহীনভাবে উল্লেখ করেছেন পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী বাতিল করা রায়ে। আইনের শাসনতত্ত্বে গভীর বিশ্বাসী বঙ্গবন্ধু এই মর্মে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দিয়েছিলেন যেন হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের আদেশ কেউ অমান্য করতে না পারে। সেই নির্দেশনার প্রতিফলন ঘটেছে ১১২ অনুচ্ছেদে, যেখানে বলা হয়েছে– সকল নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রিম কোর্টকে সহায়তা করবেন। অর্থাৎ এরা সবাই সুপ্রিম কোর্টের আদেশ কার্যকরে পদক্ষেপ নিতে এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানতে বাধ্য থাকবেন। বঙ্গবন্ধু শুধু ধর্মনিরপেক্ষতাকেই প্রাধান্য দেননি, তিনি এ তত্ত্বের নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই বলে যে, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। এর মানে– সব ধর্মের মানুষের ধর্ম পালনে সমান অধিকার। তিনি ধর্মভিত্তিক রাজনীতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার বিধান সংবিধানে পরিষ্কার ভাষায় সংযোজনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যা প্রতিফলিত হয়েছে সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদে। আজীবন অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দর্শন ধারণ করে বেড়ে ওঠা বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে ছাত্রলীগের সম্মেলনে বলেছিলেন, সৃষ্টিকর্তা রাব্বুল আল-আমিন অর্থাৎ সকল মানুষের প্রভু; রাব্বুল মুসলেমিন নন অর্থাৎ শুধুই মুসলমানদের প্রভু নন। তাঁর এই শক্ত ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থান প্রতিফলিত হয়েছে আমাদের বাহাত্তরের সংবিধানে।

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে সংবিধান প্রণয়ন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু যে অসাধারণ ভাষণ দিয়েছিলেন, তা বিশ্বের বহু বিজ্ঞজন ঐতিহাসিক এবং গভীর তত্ত্বসমৃদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সেই ভাষণে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলেন, ধর্মের নামে কোনো রাজনীতি এদেশে চলবে না। গণতন্ত্র, শোষণমুক্ত ও সাম্যবাদী সমাজের বিশদ ব্যাখ্যা এবং কার্যকারিতার কথাও প্রচ্ছন্নভাবে উল্লিখিত হয়েছিল তাঁর সেই জ্ঞানগর্ভ ভাষণে। এ ভাষণও একদিন বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে বলে বিজ্ঞজনেরা মনে করেন। কেননা এ ধরনের তত্ত্ববহুল ও ব্যাখ্যাসমৃদ্ধ ভাষণ গোটা পৃথিবীতেই বিরল।

জাতির দুর্ভাগ্য যে, পাকিস্তানি মনোভাবাপন্ন এবং পাকিস্তানি আদর্শের বরপুত্র জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে আগ্নেয়াস্ত্রের বলে ক্ষমতা জবরদখল করে দেশকে পুনরায় পাকিস্তানে পরিণত করার মানসে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং অসাম্প্রদায়িকতার সব বিধান নস্যাৎ করে বঙ্গবন্ধুর পবিত্র সংবিধান তছনছ করেছিলেন। তার বিদায়ের পর তার পাকিস্তানি দর্শনসিক্ত স্ত্রী খালেদা জিয়াও সেই বিদগ্ধ সংবিধান ঠিক জায়গায় ফিরিয়ে না এনে তার স্বামীর পদাঙ্কই অনুসরণ করেছেন পাকিস্তানিকরণ প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা আড়ালে রাখার জন্য। তবে পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা ক্ষমতায় আসার পর সংবিধানের ওপর জিয়ার নারকীয়তাকে নস্যাৎ করেন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়। পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী মামলার রায়ের মাধ্যমে আমরা বঙ্গবন্ধু প্রণীত বাহাত্তরের সংবিধান বহুলাংশেই ফিরে পেয়েছি। এই সংবিধানে এখন আর জিয়ার প্রেতাত্মা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আজ সত্যের জমিনে দাঁড়িয়ে আমাদের এটি স্পষ্ট করে বলতেই হবে, একটি সংবিধানের প্রাণ হচ্ছে তার রাজনৈতিক দর্শন। আর ১৯৭২ সালে যে রাজনৈতিক দর্শনের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের মহান সংবিধান, সেই রাজনৈতিক দর্শনের দার্শনিক আর কেউ নন– তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যে মানুষটি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব অস্বীকার করে বাংলার মানুষের অধিকার চেয়েছিলেন, সেই অধিকার তিনি সর্বতোভাবে নিশ্চিত করেছেন বাহাত্তরের মহান সংবিধানে।

**লেখক: অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, আপিল বিভাগ**

**গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য**
**পিআইবি'র প্রকাশনা**

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
**প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)**
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

# আমার বঙ্গবন্ধু

## মেজর জেনারেল (অব.) সুবিদ আলী ভূঁইয়া

চলার পথে অনেক স্মৃতিময় ঘটনার জন্ম হয়। কিছু স্মৃতি হয় সুখের, কিছু বেদনার। অনেকের জীবনে এমন অনেক স্মৃতি আছে, যা ইচ্ছে করলেই ভোলা যায় না। আমার জীবনে তেমনই এক স্মৃতি হলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। চাকরিজীবনে সেনাবাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করার সুবাদে বঙ্গবন্ধুকে বেশ কয়েকবার কাছ থেকে দেখার এবং জানার সুযোগ হয়েছিল আমার। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারির শেষদিকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার প্রথমবার সাক্ষাতের সুযোগ হয়। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের সব স্মৃতিই আমার কাছে গর্বের, গৌরবের। সেই স্মৃতিময় ঘটনা নিয়ে আজ এই লেখার প্রয়াস।

**এক.**

উনিশ শ একাত্তর সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলেও দেশের কয়েকটি বিহারি অধ্যুষিত এলাকা তখনও উত্তপ্ত ছিল। ওই সব স্থানে বাঙালি-বিহারি সংঘর্ষ বেধে যেত। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিহারিদের অমানুষিক ও বর্বর আচরণের কারণে বাঙালিরা ছিল তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ। যদ্দূর মনে পড়ে, সময়টা ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারির শেষদিকে হবে।

আমি তখন যশোরে ১১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের টুআইসি। একদিন রাত ১২টার দিকে টেলিফোন পেলাম খুলনায় বাঙালি-বিহারি সংঘর্ষ চলছে। ১১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের তৎকালীন কমান্ডিং অফিসার মেজর মতিন বললেন দুই ঘণ্টার মধ্যে একটি কোম্পানি নিয়ে আমাকে ঘটনাস্থলে যেতে হবে। এর কিছুক্ষণ পরই ৫৫ ব্রিগেডের ব্রিগেড কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল এমএ মঞ্জুর আমাকে ফোনে খুলনার খালিশপুরে বাঙালি-বিহারি সংঘর্ষের বিস্তারিত জানালেন এবং নির্দেশ দিলেন যত দ্রুত সম্ভব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য। নির্দেশ পেয়ে খুলনা পৌঁছে সূর্য ওঠার আগেই দাঙ্গাকবলিত এলাকায় সেনা মোতায়েন করলাম। গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোয় মেশিনগান ফিট করলাম। একপর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলো।

কয়েকদিন পর বঙ্গবন্ধু দাঙ্গাকবলিত এলাকা দেখতে এলেন। লেফটেন্যান্ট কর্নেল এমএ মঞ্জুর ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে রিসিভ করলেন। বঙ্গবন্ধু ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনের পর খুলনা সার্কিট হাউসে চলে গেলেন। লেফটেন্যান্ট কর্নেল এমএ মঞ্জুর আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার সময় বললেন, ভূঁইয়া আমি সার্কিট হাউসে যাচ্ছি, বঙ্গবন্ধু আমাকে ডেকেছেন। শুনে আমি আবেগতাড়িত হয়ে গেলাম। বঙ্গবন্ধুকে কাছ থেকে দেখার ইচ্ছে আমারও হলো। কোনো কিছু না ভেবে আমি লেফটেন্যান্ট কর্নেল মঞ্জুরকে বললাম, স্যার, আমি কি আপনার সঙ্গে যেতে পারি? আমি কখনো বঙ্গবন্ধুকে দেখিনি। মঞ্জুর বললেন, ঠিক আছে চলো, গাড়িতে ওঠো।

স্যারের সঙ্গে সার্কিট হাউসে গেলাম। লেফটেন্যান্ট কর্নেল মঞ্জুর খুলনার পরিস্থিতি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে প্রায় ৪০ মিনিট কথা বললেন। বিদায়ের আগে মঞ্জুর বঙ্গবন্ধুকে বললেন, স্যার, আমার সঙ্গে একজন অফিসার এসেছে, সে আপনাকে কখনো দেখেনি। আপনাকে দেখতে চায়। বঙ্গবন্ধু বললেন, ও তাই নাকি, ওর নাম কী? ঠিক আছে, ওকে ডাক।

আমি বঙ্গবন্ধুর কক্ষে ঢুকে সামরিক কায়দায় সালাম দিলাম। বঙ্গবন্ধু বললেন, ভূঁইয়া তুমি কেমন আছ? আমি জবাব দেওয়ার আগেই হাসতে হাসতেই বললেন, আরে তুমি মেজর ভূঁইয়া না ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া? আমি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছি। বঙ্গবন্ধু আবারও বললেন, তুমি যুদ্ধের সময় চট্টগ্রামে ছিলে। তোমরা চট্টগ্রামে যুদ্ধ করেছিলে, তা আমি শুনেছি। তারপর বললেন, আমি নাসিরের (শেখ আবু নাসের) বাসায় যাচ্ছি। ইউ বোথ ফলো মি।

বঙ্গবন্ধু সফরসঙ্গীদের নিয়ে শেখ নাসের সাহেবের বাসায় পৌঁছলেন। খানাপিনার সুন্দর আয়োজন। বঙ্গবন্ধু খাবার টেবিলে বসলেন। টেবিলটি (আনুমানিক ২০ ফুট বাই ৪ ফুট) উত্তর-দক্ষিণে সাজানো। দক্ষিণদিকে বসলেন তিনি। তাঁর পাশে মন্ত্রী-এমপিরা বসলেন। এমএ মঞ্জুর ও আমি বসলাম অন্য সারিতে– উত্তর প্রান্তের শেষদিকে, মুখোমুখি। বঙ্গবন্ধু এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, আরে দেখ তো, আমার সঙ্গে দুজন সামরিক বাহিনীর অফিসার এসেছে, ওরা কোথায়? আমাদের অবস্থান জানার পর তিনি তাঁর ডানে এবং বামে বসা দুই মন্ত্রীকে অন্যত্র বসতে বলে আমাদের তাঁর কাছে এসে বসতে বললেন। আমি বসলাম বঙ্গবন্ধুর ডানে এবং মঞ্জুর বামে। মঞ্জুর আর আমি মুখোমুখি।

খাবার টেবিলেই বঙ্গবন্ধু জানতে চাইলেন, মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে চট্টগ্রামে কী ঘটেছিল, কীভাবে কী করেছিলাম। অল্পক্ষণেই তিনি আমাকে 'তুমি' থেকে 'তুই' সম্বোধন করে কথা বলতে শুরু করলেন। আমি বিস্তারিত সংক্ষেপে বললাম। জানতে চাইলেন, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কথা। একপর্যায়ে তিনি আমাকে বললেন, ওই ভূঁইয়া, তোরা তো একটা ভুল করেছিলি। আমাকে পাকিস্তানিরা ধরে নিয়ে গেল আর তোরা রেডিওতে প্রচার করেছিলি আমি তোদের সঙ্গেই আছি, এটা কেমনে করলি তোরা।

আমি বললাম, স্যার, আপনার নাম বলা ছাড়া তো আর কোনো উপায় ছিল না। আমাদের কে চেনে!

বঙ্গবন্ধু বললেন, শোন, আমি আছি পাকিস্তানিদের সঙ্গে আর তোরা বলছিলি আমি আছি তোদের সঙ্গে। এই অজুহাতে ওরা যদি আমাকে মেরে...?

একপর্যায়ে তিনি আমাকে বললেন, ওই ভূঁইয়া, তোরা তো একটা ভুল করেছিলি। আমাকে পাকিস্তানিরা ধরে নিয়ে গেল আর তোরা রেডিওতে প্রচার করেছিলি আমি তোদের সঙ্গেই আছি, এটা কেমনে করলি তোরা

আমি বললাম, স্যার, আসলে ওই সময় তো এত সিরিয়াসলি ভাবিনি। তবে আপনার নাম বলার কারণ ছিল জনসাধারণকে আমাদের পক্ষে টেনে আনা, তাদের মনোবল চাঙা রাখা। জনগণ যদি জানত এবং বিশ্বাস করত আপনি আমাদের সঙ্গে নেই, তখন তো যুদ্ধের শুরুতেই দেখা দিত বিশৃঙ্খলা বা হতাশা।

বঙ্গবন্ধু আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। একপর্যায়ে আমি বললাম, স্যার, একটা কথা বলি। আপনি তো দেশটা স্বাধীন হওয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন। আমরা আপনার নাম ব্যবহার করার ফলে যদি তারা আপনাকে মেরে ফেলত, বিনিময়ে যদি আমরা স্বাধীনতা পেতাম, আপনার আত্মা অন্তত শান্তি পেত।

বঙ্গবন্ধু আমার কথা শুনে হাসি দিয়ে খাবার টেবিল মাতিয়ে তুললেন। সেই স্মৃতিময় সাক্ষাৎ আমাকে আজও বিমোহিত করে। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি আমাকে তুমি থেকে তুই বলে আপন করে নিয়েছিলেন। এরপর যতবারই দেখা হয়েছে, ততবারই তুই বলে সম্বোধন করতেন।

**দুই.**

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের লড়াইয়ের ঘটনাপ্রবাহকে আমি একটি ডায়েরিতে লিখে রাখতাম। যুদ্ধের পর এই ডায়েরিটা আমার শ্বশুর আহমদ পাবলিশিং হাউসের কর্ণধার মহিউদ্দিন আহমেদ সাহেবকে দেখালাম। ডায়েরিটা দেখে তিনি বললেন, এটা তো একটি সুন্দর বই হয়। তুমি এটিকে বই আকারে রূপ দাও না কেন? তাঁর এই পরামর্শ আমাকে আগ্রহী করে তুলল। তাঁর পরামর্শ মতো খুলনার খালিশপুরে পিপলস জুট মিলে বাঙালি-বিহারি দাঙ্গা দমনের দায়িত্ব পালনের ফাঁকে অবসর সময়টুকু কাজে লাগাই। সেখানে থাকা অবস্থায় প্রায় দুই মাস অনেক পরিশ্রম করে এই স্মৃতিগুলো বই আকারে দাঁড় করানোর জন্য স্ক্রিপ্ট তৈরি করলাম। আমি যেহেতু সেনাবাহিনীর অফিসার, তাই সেনাসদরের অনুমতি ছাড়া বই প্রকাশ করা সম্ভব না। সেজন্য সেনাসদরে ক্লিয়ারেন্সের জন্য পাঠালাম। কিন্তু অনুমতি পেতে বিলম্ব হচ্ছিল।

মুক্তিযুদ্ধের ওপর বই, তাই আমার শ্বশুর বারবার তাগাদা দিচ্ছিলেন। যশোর থেকে ঢাকায় ফিরে আমি একদিন সুগন্ধায় গেলাম। এটা ছিল বঙ্গবন্ধুর সান্ধ্যকালীন অফিস। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সেখানে বেশ কয়েকজন মন্ত্রী এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। বঙ্গবন্ধু আমাকে দেখেই বললেন, কী ভূঁইয়া, কেমন আছিস?

বললাম, ভালো আছি স্যার।

কেন এসেছিস, কাজ আছে?

বললাম, স্যার, আপনার সঙ্গে কথা ছিল।

তিনি বললেন, একটু অপেক্ষা কর। তারপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও কথাবার্তা সেরে বঙ্গবন্ধু বললেন, তুই জানি কী বলতে চেয়েছিলি?

আমি বললাম, স্যার, আমি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণমূলক একটি বই লিখেছি। নাম দিয়েছি 'মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস'। প্রকাশের জন্য অনুমতি চেয়ে সেনাসদরে পাঠিয়েছি; কিন্তু এক মাস হয়ে গেল অনুমতি পাই না।

তিনি বললেন, কেন? অনুমতি পেতে দেরি হচ্ছে কেন?

আমি বললাম, স্যার, কারণ তো বলতে পারব না। তবে ক্লিয়ারেন্স না পেলে তা প্রকাশ করতে পারছি না। তিনি বললেন, কে ক্লিয়ারেন্স দেয়?

আমি বললাম, নিয়মানুযায়ী সেনাসদর। স্যার, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু আমাকে বললেন, ছাপাইয়া ফেল না, কী হবে? পরক্ষণেই বললেন, ঠিক আছে আর কয়েকটা দিন দেখ। বেশি দেরি হলে আমাকে জানাইছ।

**তিন.**

আমি তখন ১২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ভারপ্রাপ্ত কমান্ডিং অফিসার। দিনটা ছিল ২৬ ডিসেম্বর ১৯৭২। বঙ্গবন্ধু যশোর ক্যান্টনমেন্ট পরিদর্শনে এলেন। এ সময় ১২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পরিদর্শন করলেন। পরিদর্শনকালে ট্রুপসদের মহড়া দেখলেন, কোয়ার্টার গার্ড পরিদর্শন করলেন, পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করলেন, অফিসার্স মেসে কিছুক্ষণ কাটালেন। তাঁকে সেদিন মহড়ার সময় এবং পরিদর্শনকালে অতি কাছ থেকে দেখার এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল আমার। আপ্যায়নের সময় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে এক বিশেষ মুহূর্তের ছবিও রয়েছে আমার।

**চার.**

চুয়াত্তর সালের কথা। আমি তখন লেফটেন্যান্ট কর্নেল, ব্যাটালিয়নসহ বরিশালে। আমার ওপর দায়িত্ব ছিল আর্মস রিকভারি করার। আমার হেডকোয়ার্টার তখন বরিশালে। আমি আর্মস রিকভারিতে ব্যস্ত। সেসময় বঙ্গবন্ধুর মা সায়েরা খাতুন মারা যান। বঙ্গবন্ধু দাফন শেষে স্টিমারে টুঙ্গিপাড়া থেকে ফেরার পথে বরিশাল এলেন। বরিশালের এসপি মোর্শেদ এবং আমাকে স্টিমারে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য খবর পাঠালেন। এসপি এবং আমি সেখানে গেলাম। তিনি আমাদের কাছে অস্ত্র উদ্ধার এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমরা তাঁকে বিস্তারিত জানালাম। আজ মনে পড়ছে, সেসময় ওই এলাকার কুখ্যাত ডাকাত কুদ্দুস মোল্লাকে আমরা গ্রেফতার করেছিলাম। পাকিস্তান আমলেই যার ৫৪ বছরের জেল হয়েছিল। তার অত্যাচারে ওই অঞ্চলের মানুষ অতিষ্ঠ ছিল। বঙ্গবন্ধু এই গ্রেফতারের কথা শুনে সেদিন খুব খুশি হয়েছিলেন। সেই সময় তোফায়েল আহমেদও বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলেন। সেদিনই তোফায়েল ভাইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়।

**পাঁচ.**

আমি তখনও বরিশালে। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার এবারের সাক্ষাৎটা খুব একটা সুখকর ছিল না। আমি বৃহত্তর বরিশালের দায়িত্বে। আর্মস রিকভারির উদ্দেশ্যে আমার টুআইসি এক মেজরকে এক কোম্পানি সৈন্যসহ পটুয়াখালী অঞ্চলে দায়িত্ব দিয়েছিলাম। আর্মস রিকভারি একটি দুরূহ কাজ। কারণ, কেউ তার হাতে থাকা অস্ত্র জমা দিতে চায় না। যেহেতু স্বেচ্ছায় কেউ অস্ত্র জমা দেয় না, এ কারণে তা উদ্ধার করার জন্য মাঝেমধ্যে উদ্ধারকারীরা থার্ড ডিগ্রি মেথড অ্যাপ্লাই করে থাকেন। তখন সমগ্র বরিশালে সর্বহারা, গণবাহিনীর তৎপরতা ছিল। এককথায়– নানা ধরনের অপরাধীর অভয়াশ্রম ছিল অঞ্চলটি। এদের তৎপরতায় সাধারণ মানুষ ছিল অতিষ্ঠ ও আতঙ্কগ্রস্ত। এ অবস্থায় আর্মস রিকভারি করতে গিয়ে পটুয়াখালীতে ট্রুপসদের ভূমিকায় কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বিস্তারিত জানতে আমাকে গণভবনে তলব করা হয়। সেদিন গণভবনে উপস্থিত ছিলেন সেনাপ্রধান কেএম শফিউল্লাহ, একজন মন্ত্রী ও কয়েকজন নেতা। বঙ্গবন্ধু আমার কাছে বিস্তারিত শুনলেন। কিছুক্ষণ শোনার পর দীর্ঘায়িত না করে বঙ্গবন্ধু অন্যদের বললেন, তোমরা যাও, আমি বিষয়টি দেখছি। আমাকে বললেন, তুই বস। তোর সঙ্গে কথা আছে। সবাই চলে যাওয়ার পর বঙ্গবন্ধু আমাকে বললেন, বাসায় চল।

আমি প্রথমে তাঁর কথা বুঝতে পারিনি। পরে তাঁর পেছনে পেছনে এলে তিনি বললেন, গাড়িতে ওঠ। ছোট্ট একটি গাড়ি। গাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর কষ্ট হচ্ছিল। আমি গাড়িতে বসে বঙ্গবন্ধুকে বললাম, স্যার, আপনি এত ছোট্ট গাড়ি ব্যবহার করছেন?

বঙ্গবন্ধু বললেন, বড়ো গাড়িতে তেল খরচ বেশি হয়। দেখতেই তো পারছিস দেশে তেল সংকট চলছে।

আমি বললাম, স্যার আপনি একা সাশ্রয় করলেই কি হবে?

তিনি বললেন, আমার দেখাদেখি দেখিস অনেকেই তা করবে। আমাকে অনুসরণ করবে। তিনি আমাকে নিয়ে এলেন ৩২ নম্বরের বাড়িতে। বাসার তৃতীয় তলায় বসার জায়গায় বসতে বললেন। এই বাড়িতে আমার এই প্রথম আসা। মিনিটকয়েক পর বঙ্গবন্ধু এলেন। আমাকে দু-একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করার পর তিনি প্রসঙ্গ আনলেন বরিশালের পরিস্থিতি নিয়ে। আবারও জানতে চাইলেন বৃহত্তর বরিশালে সর্বহারা ও গণবাহিনীর তৎপরতা এবং তাদের কাছে অস্ত্র উদ্ধারের বিষয়ে। আমি তাঁকে বললাম, সেনাবাহিনী মাঠে নামার পর গণবাহিনী এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। আর সর্বহারারা অস্ত্রসহ আত্মগোপনে। তারপরও আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি। তিনি আমাকে এই বিষয়ে কিছু পরামর্শ দিলেন। সেদিন আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর বাসায় চলে আসি।

**ছয়.**

সালটা ১৯৭৫, প্রথমদিকের কথা। বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রাম সফরে এলেন। আমি তখন বিডিআরের সেক্টর কমান্ডার। বঙ্গবন্ধু ভিজিটে আসায় আমাকে সেখানে যেতে হলো। বিকালে তিনি হিমছড়িতে গেলেন। সেখানে ঝাউগাছবেষ্টিত বাগানে বঙ্গবন্ধু তাঁর মন্ত্রিপরিষদের কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে গল্প করছিলেন। আমি কাছাকাছিই বসেছিলাম। নানা কথার মাঝে বঙ্গবন্ধু একপর্যায়ে আক্ষেপ করে তাঁর মন্ত্রিসভার এক সিনিয়র মন্ত্রীকে বললেন, দেখ 'পরশ্রীকাতরতা' শব্দটি একমাত্র আমাদের বাংলা ডিকশনারিতেই আছে। আর কোনো ভাষার অভিধানে নেই। উল্লেখ্য, ওই মন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা বলার সময় অন্য কারও বিরুদ্ধাচরণ করছিলেন। কথাটি আজও আমার মনে পড়লে সেই স্মৃতি ভেসে ওঠে। সেদিনের আরেকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ না করলেই নয়। বঙ্গবন্ধু আলাপচারিতার একপর্যায়ে বললেন, শোন, আইয়ুব খানের আমলে আমি যখন হুলিয়া নিয়ে দেশের নানা স্থানে ঘুরে বেড়াই, তখন এই পাহাড়ের পূর্বদিকে এক চৌকিদারের ঝুপড়ি ঘরে আমি আশ্রয় নিয়েছিলাম। বঙ্গবন্ধু উপস্থিত ডিসিকে উদ্দেশ করে বললেন, দেখ তো তাকে খুঁজে বের করা যায় কি না। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তাকে আনা হলো। তার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু কথা বললেন এবং ডিসিকে তাৎক্ষণিক নির্দেশ দিলেন তার জন্য কিছু খাস জমির ব্যবস্থা করার জন্য।

**সাত.**

৬ জুলাই ১৯৭৫। বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বরের বাড়িতে দ্বিতীয়বার যাওয়া। আমি তখন চট্টগ্রামে বিডিআরের সেক্টর কমান্ডার। ঢাকায় হেডকোয়ার্টারে এসেছিলাম একটি কাজে। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিল। একপর্যায়ে সুযোগও পেলাম। আমি আর বঙ্গবন্ধু ৩২ নম্বরের বাসায় তৃতীয় তলায় দক্ষিণের বারান্দায় বসে কথা বলছি। বঙ্গবন্ধু দেশের পরিস্থিতির পাশাপাশি আমার কাছে বাংলাদেশ-মিয়ানমার (বার্মা) সীমান্তের চোরাচালান সংক্রান্ত বিষয়াদি জানতে চাইলেন। আমি যেহেতু ওই অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত সেক্টর কমান্ডার, তাই আমাকে তিনি কিছু দিকনির্দেশনা দিলেন। সাক্ষাতের একপর্যায়ে শেখ কামাল এলেন। সেনাবাহিনীর অফিসার হিসেবে তার সঙ্গে আমার আগে থেকেই পরিচয় ছিল। তবে বঙ্গবন্ধুকে সেদিন খুব বিষণ্ন মনে হয়েছিল। তাঁকে চিন্তিত মনে হয়েছিল। এই দীর্ঘ সময়ের কথাবার্তায় কখনো মনে হয়নি আমি একজন রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে কথা বলছি। আসার সময় তিনি তাঁর স্বভাব-সুলভ ভঙ্গিতে বললেন, 'ভালো থাকিস।' সেই দেখাই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার শেষ দেখা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এই ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছেন গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার এক অজপাড়াগাঁয়ে। তারপর অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে তিনি শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু এবং জাতির পিতা হয়েছেন। হয়েছেন ইতিহাসের মহানায়ক, সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। বঙ্গবন্ধু মনেপ্রাণে ছিলেন খাঁটি বাঙালি। তাঁর চলনে-বলনে বেশভূষায় বাঙালিত্বের ছাপই লক্ষ করা গেছে। সাধারণ জীবনযাপনে তিনি ছিলেন অভ্যস্ত। তাঁর মতো সাহসী রাজনীতিবিদ ইতিহাসে খুবই কম। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও দেশপ্রেমে অটল ছিলেন তিনি। ছিলেন আপসহীন ও নির্ভীক। দুবার ফাঁসির মঞ্চ থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি ছিলেন দূরদর্শী, যার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর ৭ মার্চের ভাষণে। এদিন তিনি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এড়িয়ে গিয়ে এমন বক্তব্য দিলেন, যা স্বাধীনতার ঘোষণারই শামিল। মানুষকে খুব সহজে আপন করে নিতেন, যার প্রমাণ আমি নিজেও। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। হিমছড়ির সেই চৌকিদারের কথা নামসহ মনে রাখা এবং তাকে সহায়তা এর বড়ো দৃষ্টান্ত হতে পারে।

বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতি তিনি ছিলেন উদার। তাঁর কূটনৈতিক দূরদর্শিতার কারণে অল্পসময়ে সদ্যস্বাধীন একটি দেশকে পৃথিবীর বহু দেশ স্বীকৃতি দিয়েছিল। তাঁর নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের কারণেই স্বাধীনতার মাত্র তিন মাসের মধ্যে ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশ ত্যাগ করে। পৃথিবীর ইতিহাসে এই ধরনের ঘটনা বিরল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে ১৯৪৫ সালে। অথচ আজও বিদেশি সৈন্য রয়ে গেছে জার্মানি, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন, জাপানসহ পৃথিবীর বহু দেশে। শুধু তা-ই নয়, দেশ স্বাধীনের পর মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রসমর্পণ প্রক্রিয়াটিও হয়েছিল তাঁরই ব্যক্তিত্বের কারণে। এই গুণের কারণে বঙ্গবন্ধু বেঁচে আছেন এ দেশের কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে।

নানা কথার মাঝে বঙ্গবন্ধু একপর্যায়ে আক্ষেপ করে তাঁর মন্ত্রিসভার এক সিনিয়র মন্ত্রীকে বললেন, দেখ 'পরশ্রীকাতরতা' শব্দটি একমাত্র আমাদের বাংলা ডিকশনারিতেই আছে

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে হয়ে উঠেছিলেন জাতির প্রতীক। স্কুলজীবন থেকেই ধাপে ধাপে এ পর্যায়ে এসেছেন তিনি। হঠাৎ করে নেতা হননি বা ক্ষমতায় আসেননি তিনি। বড়ো নেতা তারাই, যারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও বড়ো হতে থাকেন। তাঁদের হত্যা করে সমাজ থেকে নির্বাসিত করা যায় না। তাঁরা বারবার ফিরে আসেন। আব্রাহাম লিংকন, মার্টিন লুথার কিং, মহাত্মা গান্ধীকেও কুচক্রীরা হত্যা করেছে; কিন্তু ইতিহাস থেকে মুছতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুকেও বাঙালির ইতিহাস থেকে মুছে দিতে কম চেষ্টা হয়নি; কিন্তু পারেনি। আসলে ইতিহাস কারও নির্দেশে রচিত হয় না। ইতিহাস তার নিজস্ব গতিতেই চলে। ইতিহাসের সত্য রক্ষার খাতিরে ইতিহাসই বঙ্গবন্ধুকে ধরে রাখবে।

**লেখক: মুক্তিযোদ্ধা, সভাপতি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি**

# মণিময় স্মৃতি ছয় দশক পেরিয়ে

**পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়**

বাড়িতে তিনটি খবরের কাগজ রাখা হতো। এর মধ্যে একটা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা থেকে প্রকাশিত। বাকি দুটো ভারতের কলকাতা থেকে। প্রথমটির নাম দৈনিক সংবাদ। অপর দুটি দৈনিক লোকসেবক ও ডেইলি স্টেটস্‌ম্যান। শেষোক্তটি ইংরেজি দৈনিক। আমাদের মফস্বল শহরে রোজকার কাগজ হাতে আসত একদিন পর। পড়তে হতো বাসি খবর। আরও একটা দৈনিক অবশ্য মাঝেমধ্যেই বাড়িতে বাবা নিয়ে আসতেন, যার নাম দৈনিক ইত্তেফাক। সন্ধ্যায় বাবার একটা আড্ডা ছিল তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে। সেখানে সবার পড়া শেষ হলে বাবা প্রায় জীর্ণ ইত্তেফাকটি বগলদাবা করে বাড়ি ফিরতেন।

বাড়িতে যে তিনটি খবরের কাগজ রাখা হতো, এর মধ্যে দৈনিক সংবাদ ছিল মাগনা। অর্থাৎ ওটির জন্য টাকা দিতে হতো না। কাগজ দিয়ে যেতেন যিনি, তিনি আশু মামা। ধুতি পাঞ্জাবি পরনে, কাঁধে কাপড়ের ঝোলা। শুনতাম দৈনিক সংবাদ নাকি তাঁর পার্টির কাগজ। মাঝেমধ্যে কাগজ দেওয়া বন্ধ হতো। শুনতাম আশু মামাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। তিনি নাকি কমিউনিস্ট। ছোট্ট মফস্বল শহরে পুলিশি হয়রানির বিষয় পাড়ায় পাড়ায় ফিসফিস করে আলোচনা হতো।

দু-একজন কেবল কালো শেরওয়ানি, মাথায় কালো টুপি চড়িয়ে শীত-গ্রীষ্ম সব সময় জুতায় মচমচ শব্দ তুলে হেঁটে যেতেন রাস্তা দিয়ে। তারা নাকি আইয়ুব খানের লোক, মুসলিম লীগ। ঠিক যেভাবে হাওয়ায় হারিয়ে গিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবেই কোনো সাড়াশব্দ না করে একদিন হাওয়াতেই যেন ভেসে আসতেন আশু মামা। কাঁধের ঝোলা থেকে খবরের কাগজগুলো বের করে বারান্দায় রাখতেন। মা একহাত ঘোমটা টেনে আশু মামার জন্য এক হাতে জলের গ্লাস, আরেক হাতে চায়ের কাপ নিয়ে আসতেন। চায়ের প্লেটে দুটো টোস্ট বিস্কুট। পুলিশি হয়রানি বা গ্রেফতার বিষয়ে একটা উদ্বিগ্ন শব্দও উচ্চারিত হতো না। ভাবখানা এমন যেন কিছুই হয়নি, আশু মামা হয়তো বা কিছুদিনের জন্য জেলা শহরে গিয়েছিলেন কোনো বিশেষ কাজে। চা-বিস্কুট খাওয়া শেষ হলে হাতের ছাতাটা খুলে ধীর পায়ে হেঁটে চলে যেতেন বাড়ির বাইরে।

মায়ের বড়ো ভাইদের মধ্যে কে যেন স্বদেশি করতেন। আমার মায়ের ধারণা ছিল আশু মামাও বুঝি স্বদেশি। বাবা শুধরে দিয়ে বলতেন, স্বদেশি নয়, কমিউনিস্ট। স্বদেশিদের সময় শেষ হয়ে গেছে বারো-তেরো বছর আগে। মা অতসব বুঝতেন না। খবরের কাগজগুলোকে বারান্দা থেকে তুলে কপালে ভক্তিসহকারে স্পর্শ করতেন। বিদ্যা বলে কথা। আমার বয়সই বা তখন কত? আট-দশ বছর। স্বদেশি, কমিউনিস্ট, পুলিশি হয়রানি, মুসলিম লীগ– এসব বোঝার মতো জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার কথা নয়। তবে কমিউনিস্ট শব্দটি আমার বেশ মনে ধরেছিল। বাবার কমিউনিস্ট বলার ভঙ্গিটি আজও বেশ স্পষ্ট দেখতে পাই। কমিউনিস্ট আশু মামাকে এক বিশেষ মর্যাদার মানুষ মনে করে বাড়তি শ্রদ্ধাও করতাম। শুনেছি পঁয়ষট্টির পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে পুলিশ আশু মামাকে পিঠমোড়া বেঁধে সর্বসমক্ষে জেলখানায় নিয়ে যায়। তখন আমরা অবশ্য অন্য শহরে চলে এসেছি। কমিউনিস্ট আশু মামাকে সেবার বলা হয়েছিল ভারতের দালাল। দালাল শব্দের অর্থ বোঝার বয়স তখন আমার হয়েছে। তাই বেশ কষ্ট পেয়েছিলাম। গোয়েন্দাদের বারবার জিজ্ঞাসাবাদে বাবার সান্ধ্যকালীন আড্ডাও ভেঙে গেল। সন্ধ্যার পর থেকে সারারাত কোথাও একটু পিদিমও জ্বলত না। শহরে কঠিন ব্ল্যাকআউট। মুসলিম লীগের উগ্র কর্মীরা সারারাত লাঠিসোঁটা নিয়ে শহরের হিন্দু বসতি এলাকায় দাপট দেখিয়ে হইচই করত। ভারতীয় সেনাবাহিনী নয়, দেশের হিন্দুরাই বুঝি পাকিস্তানের শত্রু, ভাবখানা এমন।

পঁয়ষট্টির যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ভারত-পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তজুড়ে। পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণই ছিল অরক্ষিত। পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকরাও ছিল অনিরাপদ। তার মানে, ভারত চাইলে অরক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানকে তুড়ি মেরেই নিজেদের দখলে নিয়ে নিতে পারত। যুদ্ধে ভারতীয় সেনাদের কাছে পাকিস্তানি সেনারা পর্যুদস্ত হয়েছিল। অরক্ষিত ও অনিরাপদ থাকার আতঙ্ক সেবার পূর্ব পাকিস্তানবাসী হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল, যা পরবর্তীকালের রাজনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। ওই প্রসঙ্গে না গিয়ে আমি বরং লেখার শুরুর প্রসঙ্গে গিয়ে হৃদয় খুঁড়ে দু-একটি মণিময় স্মৃতি খোঁজার চেষ্টা করি। জেল থেকে বেরিয়ে আশু মামা দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন ভারতে, কলকাতার কাছাকাছি বারাসাতে। দালাল হিসেবে নিজ দেশে থাকাটা বোধহয় তার কাছে অসম্মানের মনে হয়েছিল।

বাড়িতে আসার তিন-চারটি খবরের কাগজের ভেতর আমার আকর্ষণ ছিল কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক লোকসেবকের প্রতি। কারণ, ওই খবরের কাগজে একটি ধারাবাহিক প্রতিবেদন ছাপা হতো, যার শিরোনাম ছিল– শৈলমারী ঘুরে এলাম। শৈলমারীর একটি আশ্রমের যিনি ধ্যানরত সাধু, তিনি নাকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। আশৈশব শুনে এসেছি বাঙালি বীর নেতাজির বীরত্বগাথা। পারিবারিক আলোচনায় শুনেছি তাঁর অকস্মাৎ অন্তর্ধানের গল্প। আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের আলোচনায় শুনেছি এই বীর বাঙালির সত্য-মিথ্যা অনেক কাহিনি। তখনকার দিনে সিনেমার সঙ্গে সমান পাল্লা দেওয়া জনপ্রিয় যাত্রাদলেও নেতাজিকে বীরের চেয়েও বীর বানিয়ে আকর্ষণীয় পালা লেখা হয়েছে এবং সেই পালা দেখতে গিয়েছেন শত শত দর্শক, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। সাতচল্লিশের স্বাধীনতার আগে যখন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে, তখন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে বাঙালি বীর বানিয়ে যাত্রার পালা লেখা হয়েছিল। ব্রিটিশদের প্রতি ঘৃণা এবং বাংলার তৃণমূল মানুষকে উদ্দীপ্ত করতে সত্য ইতিহাস না হওয়া সত্ত্বেও সিরাজউদ্দৌলা পালা ভূমিকা রেখেছিল। শৈশব-কৈশোরে সিরাজউদ্দৌলা আমাকে আকর্ষণ করেনি, করেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। আর সে কারণেই দৈনিক লোকসেবক কাগজের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের প্রতি ছিল আমার বিশেষ আকর্ষণ। বাবা বলতেন, 'ওসব কল্পকাহিনি! কাগজ বিক্রির ধান্দা। নষ্ট সাংবাদিকতা।' ওইটুকু বয়সে বাবার ওইসব কথার কতটুকুই বা বুঝি। মনের ভেতর যে বাঙালি বীরের ছবি এঁকেছি, তা তো আর হুট করে মুছে ফেলতে পারি না। তাই নিষিদ্ধ ফলের প্রতি আকর্ষণের মতো 'শৈলমারী ঘুরে এলাম' প্রতিবেদনটি আমি গোগ্রাসে গিলতাম নিয়মিত।

> ডাক্তারি ব্যাগটা গুছিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ফরিদ কাকু বাবার উদ্দেশে বললেন, দেখে নেবেন শেখ মুজিবুর রহমান একদিন বাঙালি জাতিকে সবচেয়ে বড়ো উপহারটি দেবেন

শিশু-কিশোরের মন নতুন চরের মতো। কত বিচিত্র জিনিস নিয়ত সেখানে দাগ ফেলে। একটা ঢেউ দাগ ফেলে আবার পরের বড়ো ঢেউ সে দাগ মুছে দিয়ে নতুন চিহ্ন আঁকে। আমার মনেও নেতাজির নামটি মুছে দিয়ে শেখ মুজিব নাম আঁকা হলো দ্রুত ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনায়, হুপিং কাশি রোগে আক্রান্ত হয়ে আমি তখন ঘরবন্দি। রোগটা

ছোঁয়াচে, তাই আইসোলেশন বা হোম কোয়ারিন্টিনে আটকে আছি। মাঝেমধ্যে ফরিদ ডাক্তার এবং নলিনী ডাক্তার বাসায় এসে দেখেশুনে যান। ওষুধ পালটান। নতুন ওষুধের প্রেসক্রিপশন লিখে দেন। দুজনেই শহরের নামকরা চিকিৎসক। ফরিদ কাকুর এক ছেলে আবিদ, স্কুলে আমার সহপাঠী এবং বন্ধু। একদিন ফরিদ কাকু প্রেসক্রিপশন লেখা শেষ করে চা-বিস্কুট খেতে খেতে বাবার সঙ্গে বেশ চিন্তিতভাবে আলাপ করতে গিয়ে বললেন, শেখ মুজিবকে নাকি লঞ্চ থেকেই নামতে দেওয়া হবে না। মুজিবুরও ঠিক করেছেন তিনি লঞ্চঘাট থেকে পার্টির লোকদের নিয়ে শহরের ভেতর মিছিল করে হেঁটে যাবেন। ঠান্ডা মিয়া একটু বাড়াবাড়িই করছে। ক্ষমতার দাপট কি সারাজীবন থাকে! তাছাড়া শেখ মুজিবও তো জাতীয় নেতা। আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব তো এখন তাঁর হাতেই। পাকিস্তান সরকার যদি কোনো বাঙালিকে ভয় পায় তো তিনি শেখ মুজিবুর রহমান। এই অঞ্চলের বাইরে ঠান্ডা মিয়াকে চেনে কয়জন। দেখবেন এই শেখের হাতেই একদিন ঠান্ডা মিয়ারা ঠান্ডা হবে আর বাঙালির মুক্তি আসবে।

শেষের দিকে ফরিদ কাকুর কথায় বেশ উত্তেজনা ছিল। আর ছিল দৃঢ়তা এবং শেখ মুজিবের ওপর আস্থা ও শ্রদ্ধা। ফরিদ কাকু ছিলেন পিতৃতুল্য এবং তাঁকে দেখতামও অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে। বারবার অসুখ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠায় ফরিদ কাকুর চিকিৎসার প্রতি পরিবারের অন্যদের মতো আমারও খুব আস্থা ছিল। দেখতেও সুদর্শন ছিলেন তিনি, চলনে-বলনেও ছিলেন স্মার্ট। সব মিলিয়ে আমার শিশুমনে ফরিদ কাকুর একটা বড়োসড়ো ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছিল। সেই বড়োসড়ো ফরিদ কাকুরও যে কেউ নেতা থাকতে পারেন, যাকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসেন, এটা জেনে সেই নেতাকে দেখতে এবং তাঁর সম্পর্কে জানতে অধীর হয়ে উঠলাম। ফরিদ কাকুর নেতা শেখ মুজিবের একটা বীরোচিত অবয়ব আমার মনের ভেতর আঁকা শুরু হলো। ডাক্তারি ব্যাগটা গুছিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ফরিদ কাকু বাবার উদ্দেশে বললেন, দেখে নেবেন শেখ মুজিবুর রহমান একদিন বাঙালি জাতিকে সবচেয়ে বড়ো উপহারটি দেবেন। বাবা জানতে চাইলেন কী সেটা। মুক্তি। উত্তর দিয়ে ফরিদ ডাক্তার আর সময় নষ্ট না করে বাড়ির বাইরে চলে গেলেন। তাঁর অপস্রিয়মাণ অবয়বের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত আমি, কানে কেবলই বাজতে থাকল মুক্তি, মুক্তি, মুক্তি। শেখ মুজিব এবং মুক্তি। দুটো শব্দই চিরতরে মনে গেঁথে গেল। মুক্তির প্রকৃত অর্থ বোঝার বয়স তখন আমার হয়নি। অসুস্থ আমি সুস্থ হয়ে বাড়ির বাইরে যাব, ঘরবন্দি জীবন থেকে মুক্ত হব– এটাই তখন আমার কাছে একমাত্র মুক্তি।

ঘরে বসেই খবর পাই শেখ মুজিবের আসা নিয়ে শহরময় টেনশন। ঠান্ডা মিয়ার লাঠিয়াল বাহিনী রীতিমতো ভয় দেখিয়ে দিনরাত মহড়া দিচ্ছে। অপরদিকে শেখ মুজিবও নাকি তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়। লঞ্চ থেকে নেমে তিনি শহরের একমাত্র প্রধান রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবেনই। কেউ যদি সঙ্গে না-ও থাকে, তবুও তিনি যা বলেছেন তা করেই ছাড়বেন। বাসায় ফিরে মায়ের সঙ্গে বাবা রোজই এসব নিয়ে আলোচনা করেন। মা ভীত হন। কিন্তু শেখ মুজিবুরের প্রতি বাবার আস্থা ও সমর্থন দিন দিন ক্রমশ বেড়েই চলে। শত বাধাবিপত্তি এবং বাধার বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে যিনি সাহস করে বুক চিতিয়ে দাঁড়ান, তিনিই নাকি সত্যিকারের বীর। বাবার এমন কথা শুনতে শুনতে আমিও মনের ক্যানভাসে যে বীরের ছবি আঁকি, তিনি শেখ মুজিবুর রহমান। বাস্তবে যাঁকে আমি কখনো চাক্ষুষ করিনি। এ সময় একদিন ফরিদ ডাক্তার আবার আমাকে দেখতে এলেন। হুপিং কাশি রোগটা সহজে সারার নয়। এই রোগে অনেকের মৃত্যুও হতো। আমার স্বাস্থ্যের খুব একটা উন্নতি হচ্ছে না দেখে তিনি খানিক দুশ্চিন্তায় পড়লেন। তবে আসল দুশ্চিন্তার কথা বোঝা গেল তিনি যখন বললেন, শেখ মুজিব কালই আমাদের শহরে আসবেন। আমাদের শহর কী? এটা তো তাঁরই শহর। এখানে তিনি বড়ো হয়েছেন, স্কুলে পড়েছেন, বন্ধুদের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করেছেন, স্কুলের উন্নয়নের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আন্দোলন করতে গিয়ে শেরেবাংলা এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সুনজরে পড়েছেন। এই শহর থেকেই তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য সুদূর কলকাতায় গেছেন, যেখানে তাঁর সর্বভারতীয় রাজনীতির যাত্রা শুরু। শুনলাম, শেখ মুজিবের পক্ষে লোক এসেছে কোটালীপাড়া, হরিদাসপুর, মানিকদহ এমনকি রামদিয়া, সিন্দিয়াঘাট থেকেও। তাদের কেউ কেউ সঙ্গে করে ঢাল-সড়কিও নিয়ে এসেছে। বাধা দিলে বাধবে লড়াই, বিষয়টা এমনই। ঠান্ডা মিয়ার গুন্ডারাও শহরময় ভয়ভীতি দেখাচ্ছে সবাইকে। এই অঞ্চলে আওয়ামী লীগ তখনও সাংগঠনিকভাবে পাকাপোক্ত হয়নি। মুসলিম লীগবিরোধী যারা, তাদের সম্পৃক্ততা বেশি ছিল বাম রাজনীতির সঙ্গে এবং তারা অনেকেই হিন্দু ধর্মাবলম্বী। পাকিস্তান সরকারের একমাত্র হিন্দু মন্ত্রী যোগেন মণ্ডলের অনুসারীর সংখ্যাও কম ছিল না। যোগেন মণ্ডল ছিলেন তফসিলি হিন্দুদের নেতা, যিনি পাকিস্তানের মন্ত্রী থাকাবস্থায় অনেকটা গোপনেই চলে গিয়েছিলেন ভারতের কলকাতায়। মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতার দাপটে হিন্দু ধর্মাবলম্বী, বিরোধী মতের মানুষ এই শহরে বেশ কোণঠাসাই হয়ে থাকত। শ্রদ্ধাভাজন আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর এক্ষেত্রে একটা ব্যাখ্যা আছে। পঞ্চাশ সালে বরিশালে যে ভয়াবহ দাঙ্গা ঘটিয়েছিল মুসলিম লীগ, সেই দাঙ্গায় সর্বস্তরের হিন্দুদের ওপর অকথ্য অত্যাচার হয়েছিল। নেহেরু-লিয়াকত চুক্তির মাধ্যমে বিশেষ স্টিমার পাঠিয়ে নির্যাতিত এবং সর্বস্ব হারানো সহায়সম্বলহীন হিন্দুদের কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ভয়াবহ সেই দাঙ্গার ক্ষত সহজে শুকায়নি, অনেক দিন পর্যন্ত নির্মমতার স্মৃতি বইতে হয়েছে বরিশাল-গোপালগঞ্জ-খুলনা অঞ্চলের হিন্দুদের। অসাম্প্রদায়িক শেখ মুজিবের পক্ষপাতহীন নেতৃত্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদের আন্দোলন দৃঢ় হতে শুরু করলে সেই অত্যাচারের দুঃসহ স্মৃতি ক্রমেই ধূসর হতে থাকল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় স্বস্তি পেল শেখ মুজিবের মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক জীবনদর্শন এবং সাহসী নেতৃত্বের গুণে। একই কথা আমাকে আরেক শ্রদ্ধাভাজন প্রয়াত এমআর আখতার মুকুলও বলেছিলেন। মুকুল ভাইয়ের বাবা পঞ্চাশ সালে বরিশালে একজন শীর্ষ পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন।

আমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে ফরিদ ডাক্তার সেদিন দ্রুত চলে গেলেন। আজ তিনি এক চুমুক চাও মুখে দিলেন না। ভীষণ অস্থির তিনি আজ। আমার ভেতরেও ভীষণ অস্থিরতা তখন। বীর বাঙালি শেখ মুজিবের আগমনে বাধা দিতে যে গুন্ডাবাহিনী কয়েক দিন ধরে শহরে ভয়ের আতঙ্ক তৈরি করেছে, তাদের প্রতি চরম ঘৃণা জানালাম মনে মনে। আর আমার পরম আরাধ্য বীরের যেন কোনো ক্ষতি না হয় এবং জয়ীর মতো যেন তাঁর আগমন সফল হয়, ভগবানের কাছে আন্তরিকভাবে এই প্রার্থনা করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি।

পরদিন সকাল থেকে উৎকণ্ঠা। তিনি কি এলেন। তাঁর আগমন সফল হয়েছে তো! মুসলিম লীগের গুন্ডারা কি মারামারি করেছে! এসব প্রশ্ন আমার শিশুমনকে উদ্বিগ্ন করে তুলছিল। দোতলায় যে ঘরটাতে আমাকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছিল, সেই ঘরের জানালায় দাঁড়ালে অদূরের বড়ো রাস্তা দেখা যায়। অসুস্থ শরীর নিয়ে কতবার যে জানালায় গিয়ে দাঁড়ালাম। যদি তিনি একবার এই পথ দিয়ে যান। না, সারা দিন অপেক্ষা করেও রাস্তায় বা বাইরে কোনো বাড়তি উত্তেজনা টের পেলাম না। প্রতিদিনের মতোই চেনা-অচেনা মানুষ রাস্তা দিয়ে যাওয়া-আসা

করছে। উদ্বিগ্নতা আর অস্থিরতা নিয়ে কেটে গেল সারা দিন। বাবাও বাইরে থেকে যে খবর নিয়ে বাড়ি ফরলেন, সেখানেও কোনো উত্তেজনা নেই খুব একটা। তবে কি তিনি আসেননি! তবে কি তাঁকে লঞ্চ থেকে নামতে দেয়নি গুন্ডার দল! তবে কি পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে জেলে ভরেছে! কারণ বাবার কাছে শুনেছি সরকার নাকি তাঁকে খুব ভয় পায়, তাই যখনই সুযোগ পায়, তখনই গ্রেফতার করে আটকে রাখে। নিস্তরঙ্গ সময় বয়ে যায়, আমার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা কাটে না। অপেক্ষা করি ফরিদ কাকুর আসার জন্য। অসুস্থতা কাটিয়ে অল্প অল্প ভালো হতে শুরু করেছি তখন।

অবশেষে দুদিন বাদে ফরিদ কাকু এলেন। বেশ উৎফুল্ল মেজাজে ছিলেন সেদিন। বাবার সঙ্গে কথা বলার সময় কান খাড়া করে থাকলাম। ফরিদ কাকু বললেন, ঠান্ডা মিয়ার গুন্ডাদের সেদিন খুঁজেই পাওয়া যায়নি। তবে গোয়েন্দারা নাকি শেখ মুজিবুরকে আসতে নিষেধ করেছিল এই বলে যে, তাঁর আগমনের কারণে দুই পক্ষের ভেতর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হবেই এবং এই জন্য তাঁকে দায়ী করে গ্রেফতারও করা হবে। এই কথা শুনে উত্তরে শেখ মুজিব বলেছিলেন, 'গ্রেফতারের ভয় আমি পাই না। আর যদি রক্তারক্তি হয়, এর জন্য দায়ী হবে মুসলিম লীগ সরকার আর তাদের পুলিশ ও গুন্ডাবাহিনী। আমার আসার কারণে যদি এক ফোঁটা রক্ত ঝরে তবে সারা পূর্ব পাকিস্তানে আমার কর্মীরা আগুন জ্বালিয়ে দেবে। কথাটা মনে রাখবেন।' গোয়েন্দারা ভড়কে গিয়েছিল এবং ঠান্ডা মিয়ার গুন্ডাদের মারামারি করা থেকেও নিবৃত্ত করেছিল। তখন বুঝিনি; কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার পর বুঝেছি, সাহস আর বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সেদিনের উদ্ভূত পরিস্থিতির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। সামান্য বাধাও সৃষ্টি হয়নি, এক ফোঁটা রক্তও ঝরেনি। সব শঙ্কা ও উদ্বিগ্নতার আগুনে জল ঢেলে প্রতিকূল পরিস্থিতির ভেতর তিনি তাঁর সাংগঠনিক কাজ সেরে গেলেন। একেই বুঝি বলে নেতৃত্বের বিচক্ষণতা।

বেশ অনেক দিন অসুস্থ থেকে ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠলাম। স্কুলে যাওয়াও শুরু করলাম। ফরিদ ডাক্তার আর আমার স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে আসেন না। আমার মন খারাপ তাতে। কারণ ফরিদ কাকু বাড়িতে আসা মানে বাবার সঙ্গে শেখ মুজিবকে নিয়ে আলোচনা। ফরিদ কাকু না আসায় আমিও শেখ মুজিবকে নিয়ে কিছু শুনতে পাই না। বীর শেখ মুজিব সম্পর্কে এ রকম অন্ধকারে থেকে সদ্যশৈশব পার হওয়া আমার মাঝেমধ্যেই মন খারাপ হতো। লোকসেবক পত্রিকার ধারাবাহিক 'শৈলমারী ঘুরে এলাম' আগের মতো আর গোগ্রাসে গিলি না। বাবা যেমন বলেন 'কল্পকাহিনি', তেমনি শৈলমারীর সাধুরূপী নেতাজির ঘটনাকেও আমি কল্পকাহিনি বলে বিশ্বাস করতে শুরু করলাম। নেতাজি সুভাষ বসু, ফরিদ কাকু, আশু মামা– এরকম আরও অনেককে ছাড়িয়ে আমার একমাত্র স্বপ্নের নায়ক তখন শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর হাতেই নাকি একদিন বাঙালির মুক্তি আসবে। শেখ মুজিব এবং মুক্তি শব্দ দুটি অভিন্ন। বয়সের দিক দিয়ে আমি তখন কৈশোরের একেবারে শুরুতে। মনটা নতুন চরের মতো পেলব, মসৃণ, নরম, দাগহীন, নবীন। ওই বয়সে যে বীরের ছবি জলছাপ হয়ে মনে বসে গেছে, তা সারাজীবনে অমোচনীয়ই থেকে গেল। বড়ো হওয়ার পর নেতা মুজিবকে বহুবার দেখেছি। অনেক দূর থেকে, আবার অনেক কাছে থেকেও। কিন্তু তাঁকে পুরোপুরি চেনা, তাঁর সম্পর্কে সম্পূর্ণ জানা এবং তাঁকে আবিষ্কার করার নেশা আমার এ জীবনে ফুরাবে না। সেটা সম্ভবও নয়।

**লেখক: আহ্বায়ক, সম্প্রীতি বাংলাদেশ**

**গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য**
**পিআইবি'র প্রকাশনা**

**যোগাযোগ**
**প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ**
**প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)**
**৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা**

# বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের আশ্রয়দাতা দেশগুলোর উচিত দুঃখ প্রকাশ করা

**রেজা সেলিম**

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে যেসব বিপথে যাওয়া সেনা কর্মকর্তা নৃশংসভাবে সপরিবারে হত্যা করেছিল, তারা সেবছরের নভেম্বর পর্যন্ত দেশেই ছিল। তাদের ধারণা ছিল– যা ঘটেছে এবং তারা যা ঘটিয়েছে, এর বিরুদ্ধে যেহেতু কোনো সংগঠিত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে উঠেনি, ফলে তারা হয়তো নিরাপদ। বিভিন্ন তথ্যসূত্রে জানা যায়, এদের অনেকেই চিন্তিত ছিল কোনো অঘটন ঘটার আশঙ্কায় এবং সেকারণে পরিবার-পরিজন নিয়ে বিদেশে পাড়ি দিতে তারা ব্যস্ত ছিল। চেষ্টা করছিল যাতে মোশতাক সরকার সেরকম একটি ব্যবস্থা নেয়। এসবের ফলেই খন্দকার মোশতাক তাদের, নিজের ও ষড়যন্ত্রকারীদের রক্ষায় সুদূরপ্রসারী চিন্তা থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারবর্গ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমেই শাস্তি এড়ানোর নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' আইন প্রণয়ন করেছিল। ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তখনকার রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমেদ এই ইনডেমনিটি (দায়মুক্তি) অধ্যাদেশ জারি করে। এসবের জন্য তখনকার সরকারের ওপর হত্যাকারী ও পরিকল্পনাকারীদের নিশ্চয়ই চাপ ছিল। যদিও এ অধ্যাদেশ জারি করে তাদের উদ্বেগ নিরসনে ৪০ দিনের মতো

সময়ও লেগেছিল। কী সেই চাপ, সরকারি নথিপত্রে নেপথ্য পরিকল্পনার এবং সেই মতে এগিয়ে যাওয়ার যা যা প্রমাণ বা দলিলাদি আছে, এই নিয়ে প্রাইমারি গবেষণা হওয়া দরকার। আমাদের কাছে যেসব তথ্য আছে, সেগুলোর অধিকাংশই সেকেন্ডারি বা নানাজনের সাক্ষাৎকার ও লেখালেখি সূত্রে পাওয়া। অ্যাভিডেন্সগুলো এখন প্রকাশ হওয়া দরকার।

পঁচাত্তরে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের পটপরিবর্তনের শেষের পর্যায়ে সব নেপথ্য ঘটনার অনুঘটক সুযোগসন্ধানী জেনারেল জিয়াউর রহমান সাজানো নাটকীয় পরিস্থিতির মাধ্যমে সামরিক ক্ষমতার সামনে বা দৃশ্যপটে চলে আসেন। এতদিন তিনি নেপথ্যে কলকাঠি নাড়ছিলেন, তা নানা সূত্রে প্রমাণিত। রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক এই সময়ে অপসারিত হন এবং তখনকার প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম মোশতাকের স্থলাভিষিক্ত হন। বঙ্গবন্ধুর চেয়ে বছর চারেকের বড়ো, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ও ত্রিশের দশকে কলকাতা বার-এর নবীন আইনজীবী হিসেবে সুপরিচিত, পরবর্তীকালে ঢাকা হাইকোর্টে শেরেবাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হকের সহায়ক আইনজীবী, পূর্ব পাকিস্তান আইনজীবী পরিষদের নেতা হিসেবে বিশেষ পরিচিত এই সায়েমকে ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু হাইকোর্টে দেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। বাহাত্তরের ডিসেম্বরে বঙ্গবন্ধু দেশে সুপ্রিম কোর্ট গঠন করেন এবং সেদিন থেকে বিচারপতি সায়েম দেশের সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব নেন। ১৯৭৫ সালের ৩ ও ৬ নভেম্বর এর সামরিক অভ্যুত্থান ও পালটা অভ্যুত্থানের পর মূলত ৬ নভেম্বরই বিচারপতি সায়েমকে দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের পরই তিনি সংসদ ও মন্ত্রিপরিষদ ভেঙে দিয়ে সারা দেশে সামরিক আইন জারি করেন এবং নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ঘোষণা করেন। ১৯৭৬ সালের ২৯ নভেম্বর তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন এবং সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানের কাছে সামরিক শাসনের ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল পর্যন্ত বিচারপতি সায়েম রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। ফলে সংগত কারণেই পঁচাত্তরের নভেম্বর থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সংঘটিত সব ঘটনাবলির দায় তাকে নিতে হবে। এই পুরো সময়ে জেনারেল জিয়াউর রহমান বিচারপতি সায়েমকে সামনে রেখেই তার সব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন– এ নিয়েও কোনো সংশয় নেই। তখনকার অস্থির পরিস্থিতিতে হত্যাকারী দলের সদস্যরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে বিদেশে চলে যেতে চাইছিলেন বা কেউ কেউ লিখেছেন তাদের সঙ্গে সেরকম প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল। কে সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কখন বা বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্রের কোন পর্যায়ে এসে তা দেওয়া হয়েছিল, তার আনুপুঙ্খ আমাদের জানা দরকার। ফলে তথ্য অনুসন্ধানের কাজ এবং তা উন্মোচন-প্রকাশের কাজ এখানেও চালাতে হবে। এসব সত্য আড়ালে থেকে যাওয়ার কোনোই কারণ নেই।

১৯৭৫ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত ও চিহ্নিত হত্যাকারীদের একটি দলের বিদেশ যাওয়ার সব বন্দোবস্ত করা হয়। বিশেষ বিমানে তারা প্রথমে মিয়ানমার ও থাইল্যান্ড হয়ে লিবিয়ায় যায় এবং ছিয়াত্তরের জুন পর্যন্ত লিবিয়ায় অবস্থান করে। বিভিন্ন সূত্রে এখন জানা যাচ্ছে, ১৯৭৬ সালের ৮ জুন জিয়াউর রহমানের অন্যতম বিশ্বস্ত সঙ্গী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুরুল ইসলাম শিশুর মধ্যস্থতায় এদের ১২ জনকে বাংলাদেশের বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরির বন্দোবস্ত করা হয় এবং সে অনুযায়ী নিয়োগপত্র পেয়ে এদের সবাই কাজে যোগ দেয়। হত্যাকারীদের মধ্যে দুজন শীর্ষস্থানীয় সদস্য কর্নেল ফারুক ও কর্নেল রশীদ চাকরি না নিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নানারকম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। সেসময়ে যে ১২ জন হত্যাকারীকে চাকরি বন্দোবস্ত করা হয় এরা হলো– লে. কর্নেল আজিজ পাশা আর্জেন্টিনায় প্রথম সচিব হিসেবে, লে. কর্নেল শরিফুল হক (ডালিম) চীনে প্রথম সচিব, মেজর একেএম মহিউদ্দিন আহমেদ আলজেরিয়ায় প্রথম সচিব, মেজর শাহরিয়ার রশিদ ইন্দোনেশিয়ায় দ্বিতীয় সচিব, মেজর বজলুল হুদা পাকিস্তানে দ্বিতীয় সচিব, মেজর নূর চৌধুরী ইরানে দ্বিতীয় সচিব, মেজর রাশেদ চৌধুরী সৌদি আরবে দ্বিতীয় সচিব, মেজর শরিফুল হোসেন কুয়েতে দ্বিতীয় সচিব, ক্যাপ্টেন কিসমত হাশেম আবুধাবিতে তৃতীয় সচিব, লে. নাজমুল হোসেন কানাডায় তৃতীয় সচিব, লে. খায়রুজ্জামান মিসরে তৃতীয় সচিব ও লে. আবদুল মাজেদ সেনেগালে তৃতীয় সচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু তখন পৃথিবীর অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ও অবিসংবাদিত জনপ্রিয় নেতা। যেসব দেশে হত্যাকারীদের চাকরি দেওয়া হলো, সেসব দেশ কেনই বা তাদের গ্রহণ করতে সম্মতি দিল?

প্রশ্ন হলো– ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শিশুর এই মধ্যস্থ তৎপরতার নেপথ্য ঘটনাগুলো কী? আমরা জানি, বিদেশের দূতাবাসে কোনো কর্মকর্তাকে পদায়ন করা হলে সে দেশের অগ্রিম অনুমতি বা সম্মতি নিতে হয়। কূটনীতির এই শিষ্টাচার এই ক্ষেত্রে কেমন করে অনুসরণ করা হয়েছিল? কে করেছিলেন, কীভাবে করেছিলেন? বঙ্গবন্ধু তখন পৃথিবীর অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ও অবিসংবাদিত জনপ্রিয় নেতা। যেসব দেশে হত্যাকারীদের চাকরি দেওয়া হলো, সেসব দেশ কেনই বা তাদের গ্রহণ করতে সম্মতি দিল? যুক্তি বা তর্কের খাতিরে আমরা মধ্যপ্রাচ্য বা পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল দেশগুলোর এই সম্মতি দেওয়া যদি মেনেও নিই, তাহলেও অন্তত কয়েকটি দেশের ভূমিকা আজও রহস্যজনক বা আমাদের অজানা, যেমন– আলজেরিয়া, আর্জেন্টিনা, কানাডা ও সেনেগাল। বিশেষ করে আলজেরিয়ায় তখন জোটনিরপেক্ষ

দেশগুলোর আন্দোলনের অন্যতম নেতা হুয়েরই বুমেদিন বঙ্গবন্ধুর বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন এবং ১৯৭৩ সালের ৩-৯ সেপ্টেম্বরে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত ন্যামের চতুর্থ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বুমেদিনের বিশেষ আমন্ত্রণে অংশ নেন। এই সময়ে তিনি বিশ্বের নামিদামি নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে বাংলাদেশের দৃঢ় অবস্থান তুলে ধরেন। এই সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ফিদেল কাস্ত্রো, মার্শাল টিটো, আনোয়ার সাদাত, গাদ্দাফিসহ অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং বাংলাদেশের এই নেতার অবস্থান বিশ্বব্যাপী আলোচিত হয়।

প্রশ্ন উঠতেই পারে আলজেরিয়া কেমন করে সে অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর একজন প্রত্যক্ষ হত্যাকারীকে তার দেশের দূতাবাসে চাকরি করতে সম্মতি দিল? পশ্চিমের ধনী দেশ ও কমনওয়েলথ সদস্য কানাডাই বা কী করে অপর একজন হত্যাকারীকে চাকরি করতে সম্মতি দেয় বা সেনেগালের মতো স্বল্পোন্নত দেশ, যার সঙ্গে বাংলাদেশের উন্নয়ন দর্শনের তেমন কোনো অমিল ছিল না। তাহলে আরও প্রশ্ন জাগে– এসব সম্মতিদানের নেপথ্য ঘটনা কী? আমাদের জানা দরকার আমরা সেসব দেশের সঙ্গে কোনো কূটনৈতিক আলোচনা করেছিলাম কি না, যাতে সেসব দেশের পরিচয় হত্যাকারীদের আশ্রয়দাতা হিসেবে না হয়? যদি এসব সিদ্ধান্ত বঙ্গবন্ধুর মতো উচ্চমানের সম্মানিত ব্যক্তিত্বের নির্মম হত্যাকাণ্ডের তাৎপর্য বা গুরুত্ব বিবেচনা না করেই ওই দেশগুলো নিয়ে থাকে, আমরা নিশ্চয়ই সেসব দেশকে এখন দুঃখ প্রকাশ করতে আহ্বান জানাতে পারি। কোনো কোনো দেশের এখন বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চাওয়ারও যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ তারা ইতিহাসের এক কলঙ্কিত সন্ত্রাস সংঘটনকারীদের প্রশ্রয়দাতা হিসেবে এবং একটি দেশের জাতির পিতার হত্যাকারীদের আশ্রয় দিয়েছে বলে এ দেশের জনগণের কাছে ধিকৃত হয়ে আছে।

আমাদের জানা দরকার জিয়া ও এরশাদের আমলে এসব ঘৃণ্য অপরাধীরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে কেমন করে বছরের পর বছর চাকরি অব্যাহত রেখেছে, এমনকি পদোন্নতিও পেয়েছে? শুধু তা-ই নয়, প্রথমে এদের চাকরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডেপুটেশনে দেওয়া হলেও ১৯৮০ সালে জিয়াউর রহমানের আমলে এদের সবাইকে ফরেন সার্ভিসের ক্যাডারভুক্ত করা হয়, যা আমাদের বৈদেশিক দফতরের জন্য অত্যন্ত বিব্রতকর ও লজ্জার বিষয়!

প্রশ্ন হলো– আমাদের বন্ধুপ্রতিম অনেক দেশ তাদের গ্রহণ করেছে? কেন করেছে? আলজেরিয়া কীভাবে করে? পদোন্নতি পেয়ে রাশেদ চৌধুরী একসময় জাপানে বদলি হয়। বন্ধু ও শান্তিপ্রিয় দেশ জাপান কেন তাকে গ্রহণ করল? ডালিমকে বেইজিং থেকে পোল্যান্ড বদলি করা হলে একমাত্র পোল্যান্ডই তাকে গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, পরে তাকে কেনিয়ায় হাইকমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এ কাজ কেমন করে সম্ভব হয়েছিল? মেজর নূর ব্রাজিলে চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। আর বিভিন্ন সময়ে পদোন্নতি পেয়ে বদলি হলে দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অন্য সব দেশই এদের মেনে নিয়েছিল। তাহলে এসবের পেছনে কি কোনো বড়ো শক্তির সমর্থন ও ইঙ্গিত ছিল? বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনার রহস্য উন্মোচনে ওইসব দেশের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা থাকতে হবে এবং উত্তর পেতে হবে। এমনকি আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতো একটি প্রফেশনাল বিভাগেরও নৈতিক মান অক্ষুণ্ন ও দায়মুক্ত রাখতে এসবের উত্তর জানা দরকার।

আর ওইসব দেশ সব জেনেশুনে, এমনকি অপরাধের বিচার করা যাবে না– এমন আইনের অধীনে থাকা হত্যাকারী অপরাধীদের কেমন করে কূটনৈতিক মর্যাদা দিয়ে তাদের দেশে কাজ করতে দিয়েছে? আইন করেই যদি অপরাধের বিচার করা না যাবে, তাহলে তো তারা সেই অপরাধ করেছিল প্রমাণিতই হয়, যা বিশ্ব ইতিহাসের জন্য এক বিশাল কলঙ্কের বোঝা হয়েছিল। সেসব দেশ কেন এই অপরাধীদের অপরাধ আমলে নেয়নি। আজকের বিশ্বে এর ঐতিহাসিক ও কূটনৈতিক বিশ্লেষণ বের করে আনা জরুরি।

**লেখক: পরিচালক, আমাদের গ্রাম গবেষণা প্রকল্প**

**গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য**
**পিআইবি'র প্রকাশনা**

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
**প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)**
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

# আমার দেখা
## বঙ্গবন্ধু

**মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পু**

৮ এপ্রিল ১৯৬৬। দুপুরবেলা। যথাসম্ভব দেড় কি পৌনে ২টা বাজে। পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রব বগা মিয়ার বাসায় এলেন বঙ্গবন্ধু। উদ্দেশ্য– ছয় দফার প্রচারসভায় যোগ দেবেন, তার আগে দুপুরের জলখাবার। যতটুকু দেখেছি ও জেনেছি– ছয় দফাকে স্বাধীনতার সিঁড়ি ভাবতেন জাতির পিতা। বলতেন, 'ছয় দফায় যে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি শোষিত-বঞ্চিত আদম সন্তানের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নাই।'

অধিকার আদায়ের এ চিন্তা থেকেই ছয় দফার আন্দোলন দেশব্যাপী প্রচার করতে শুরু করেন বঙ্গবন্ধু। সেই ধারাবাহিকতায় পাবনায় (টাউন হল) সমাবেশ করতে আসা। চাচার বাসায় আসায় জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধুকে দেখতে গেলাম। বিশেষ সাক্ষাতের সুযোগ হলো। বগা চাচা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহকর্মী এম মনসুর আলী, এএইচএম কামারুজ্জামানসহ অন্য নেতাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বভাবসুলভ আদরের 'তুই' সম্বোধন করে বেশকিছু দিকনির্দেশনা দিলেন। সর্বশেষ বললেন, 'মাঠে (সভাস্থল) আয়।' উপস্থিত জেলা

ছাত্রলীগের নেতা আকবর মজিদ, শফিকুল আজিজ মুকুল, আব্দুস ছাত্তার লালুদেরও বললেন আমাকে যেন সভাস্থলে নিয়ে যায়।

সদ্য এসএসসি পাস করেছি। পরিচয়ে তখনও কলেজের তকমা পাইনি। রাজনীতির কতটুকুই বা বুঝি? কিন্তু ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি দীর্ঘদেহী এই মানুষটির স্নেহমাখা 'মাঠে আয়' স্বরে কী যেন লুকিয়ে ছিল। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিলাম– কেউ না নিলেও একা একা জনসভায় যাব। কিন্তু সেটি আর করতে হলো না। সবার সঙ্গেই টাউন হলে গেলাম। বঙ্গবন্ধু ও কেন্দ্রীয় নেতাদের বক্তৃতা শুনলাম। হঠাৎ খেয়াল করলাম, মনের অজান্তেই মুগ্ধ শ্রোতা থেকে গগনবিদারী স্লোগানদাতা হয়ে গেছি। মাধ্যমিকেই বঙ্গবন্ধুর প্রতি অনুপ্রাণিত ছিলাম। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের ব্যবধানে আমি যেন তাঁর ছাত্রলীগের অন্যতম সক্রিয় কর্মী। সেই সক্রিয় প্রবেশ কিছুক্ষণ আগেই বঙ্গবন্ধুর 'মাঠে আয়' নির্দেশের মধ্য দিয়ে ঘটল। মূলত রাজনীতিতে আমার সক্রিয় ভাবটা ওই মুহূর্ত থেকেই। এরপর আর পেছনে তাকাইনি। তাকাতে হয়নি। কয়েক মিনিটের সাক্ষাতে পিতা মুজিব যেভাবে রাজনৈতিক অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন, সেটাই যে আমাকে এডওয়ার্ড কলেজ ছাত্রলীগের জিএস, অবিভক্ত পাবনা জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি এবং জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হিসেবে ছয় বছর দায়িত্ব পালনে উৎসাহ জুগিয়েছে; তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বঙ্গবন্ধু হেলিকপ্টারে উঠতে যাচ্ছেন, এমন মুহূর্তে আমার কাছে জানতে চাইলেন– ঢাকা যাব কি না? আগে-পাছে চিন্তা না করে রাজি হয়ে গেলাম

পাবনার সেই ১৯৬৬ সালের ৮ এপ্রিলের পর বেশ কয়েকবার নাতিদীর্ঘসময় বঙ্গবন্ধুর সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছে। যতবার দেখা হয়েছে, ততবারই তাঁর কাছ থেকে নতুন কিছু শিখেছি। বঙ্গবন্ধু চলে গেছেন ৪৫ বছর আগে। দীর্ঘ এ সময়ে স্বৈরশাসন, বিএনপি-জামায়াতের দুঃশাসন এবং ওয়ান ইলেভেন এসেছে। রাজনৈতিক জীবনেও অনেক উত্থানপতন দেখেছি, কত কিছু শিখেছি। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সংস্পর্শে থাকার সেই মুহূর্তগুলো ভুলতে পারিনি। জীবদ্দশায় পারবও না। এগুলো আমার কাছে জীবন চলার 'ফুয়েল'। 'সেই ফুয়েল' আজও আমাকে শক্তি জোগায়। শক্তি দেয় এ কারণে যে, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ আজও বাংলাদেশসহ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ ধারণ করে। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের উন্নয়নে যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, কন্যা শেখ হাসিনার হাত ধরে সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। সাত দশকে পা দেওয়া আওয়ামী লীগের হাত ধরে দেশ উঠেছে উন্নয়নের মহাসড়কে। পৌঁছেছে স্বল্প উন্নয়নের দেশ থেকে উন্নয়নশীলে। ইতিহাসসেরা প্রকল্প পদ্মা সেতু হচ্ছে, দুর্বার গতিতে মেট্রো রেলসহ বড়ো বড়ো প্রকল্প। সব মিলিয়ে বলা যায়, শেখ হাসিনার হাত ধরে অনেকটাই এগিয়ে গেছে দেশ। এখন উচিত– দল-মত নির্বিশেষে বাংলাদেশের সেই উন্নয়নকে সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টিকোণ থেকে এগিয়ে নেওয়া। শেখ হাসিনার পতাকাতলে সমবেত হওয়া।

**দুই.**

স্বাধীনতার পর কয়েকবার বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সম্মুখসাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল আমার। যার একটি ঘটনা আজও আমাকে অনুপ্রেরণা দেয়। সালটা ১৯৭২, ফেব্রুয়ারি মাস। বন্যাকবলিত মানুষকে বাঁচাতে পাবনার কাশিনাথপুর/নগরবাড়ীতে 'মুজিববাঁধ' উদ্বোধন করতে আসেন জাতির পিতা। আমি তখন জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি। যথারীতি জনসভার আয়োজন হলো। স্বাগত বক্তব্যের দায়িত্ব পড়ল আমার ওপর। বক্তৃতা দিলাম। ডায়াস থেকে যখন মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতে উদ্যত হয়েছি, ঠিক তখনই বঙ্গবন্ধু আমার হাত ধরে ফেললেন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দাঁড়িয়ে গিয়ে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কপালে চুমু এঁকে বললেন– 'তুই তো ভালো বলিস'। বঙ্গবন্ধুর বুকে লেপটে আছি; কী বলব, কী বলা উচিত, বুঝতে পারছিলাম না। মুহূর্তের জন্য হতবিহ্বল হয়ে গেলাম। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম জাতির পিতার দিকে। পরে দু-একটি কথা বলে স্টেজের সাইডে গেলাম। পরে এই ভেবে উৎসাহী হলাম যে, মাত্র ১৮ মিনিট বক্তৃতায় যিনি সাত কোটি মানুষকে এক সুতোয় গেঁথেছিলেন, লাখ লাখ মানুষকে রাস্তায় নামিয়েছেন– সেই মানুষটি যখন আমার ভাষণের প্রশংসা করলেন, তখন সেটা নিঃসন্দেহে ছোটো ব্যাপার নয়।

বঙ্গবন্ধুকে 'গার্ড অব অনার' প্রদানের মধ্য দিয়ে যথারীতি অনুষ্ঠান শেষ হলো। বঙ্গবন্ধু হেলিকপ্টারে উঠতে যাচ্ছেন, এমন মুহূর্তে আমার কাছে জানতে চাইলেন– ঢাকা যাব কি না? আগে-পাছে চিন্তা না করে রাজি হয়ে গেলাম। প্রথমবারের মতো হেলিকপ্টার ভ্রমণের সুযোগ হলো, তা-ও রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে। ঢাকায় হেলিকপ্টার থামল পুরোনো বিমানবন্দর তেজগাঁওয়ে। আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে ডাকলেন বঙ্গবন্ধু। নির্দেশ দিলেন– 'ওকে (আমাকে) বাসায় নিয়ে খেতে দাও, তারপর খরচ দিয়ে পাবনা পাঠিয়ে দিও'।

১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি সাংগঠনিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আরেকবার পাবনা আসেন বঙ্গবন্ধু। জনসভার আয়োজন তখন স্টেডিয়ামে। জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হিসেবে সেবারও বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ হলো। বক্তৃতা শেষে বঙ্গবন্ধু ঠিক আগের মতো আমাকে জড়িয়ে ধরেন। মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেন, আমি যেন ভবিষ্যতে আরও উন্নতি করি।

এজন্য বলি– ১৫ আগস্ট আমার কাছে শোক দিবস তো বটেই, সেই সঙ্গে এক বেদনাবিধুর হৃদয় ভাঙার দিন। এ শোক একদিনের নয়, অনন্তের। এ শোক শুধু বাঙালির নয়, বিশ্ববাসীর। ১৬ আগস্ট

হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শুনে সাবেক জার্মান চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্ডেট (Willy Brandt) তো বলেই ফেললেন, 'শেখ মুজিবকে হত্যার পর বাঙালি জাতিকে আর বিশ্বাস করা যায় না।' ফিদেল কাস্ত্রো লিখলেন, 'শেখ মুজিবের মৃত্যুতে বিশ্বের শোষিত মানুষ হারাল তাদের একজন মহান নেতাকে, আমি হারালাম একজন অকৃত্রিম বিশাল হৃদয়ের বন্ধুকে।' মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এতটাই দুঃখ পেয়েছিলেন যে, আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'তোমরা আমারই দেওয়া ট্যাঙ্ক দিয়ে আমার বন্ধু মুজিবকে হত্যা করেছ! আমি নিজেই নিজেকে অভিশাপ দিচ্ছি।'

বঙ্গবন্ধু ছিলেন স্বভাব নেতা। কি শৈশব, কৈশোর কিংবা মত্ত যৌবন– সবখানেই এক কালজয়ী মহাপুরুষ ছিলেন তিনি। ইতিহাসের বাঁক ঘোরানো রাজনীতিবিদ ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। বঞ্চনা, অধিকার থেকে যে জাতিকে তিনি একাত্তরে স্বাধীনতা এনে দিলেন; সেই জাতিই যে তাঁকে স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরে জীবন নিয়ে নেবে– সেটা কি জানতেন!

কী হয়েছিল সেই ভোরে? অন্যদিনের মতোই রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ১৪ আগস্ট রাত ৮টা নাগাদ বাড়িতে (ধানমন্ডি ৩২ নম্বর) ফেরেন। খাওয়াদাওয়া শেষে ঘুমাতে যান রাত ১২টার দিকে। বাড়ির নিচতলার একটি কক্ষে কর্মরত ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত সহকারী এএফএম মুহিতুল ইসলাম। যিনি রাত ৩টা নাগাদ ঘুমাতে যান। বঙ্গবন্ধু মামলার এজাহারে মুহিতুল উল্লেখ করেন, কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম, তা খেয়াল নেই। হঠাৎ টেলিফোন মিস্ত্রি আমাকে উঠিয়ে জাগিয়ে তুলে বলেন, প্রেসিডেন্ট সাহেব আপনাকে ডাকছেন। সময় তখন ভোর সাড়ে ৪টা কি ৫টা। চারদিকে আকাশ ফরসা হয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধু ফোনে আমাকে বললেন, সেরনিয়াবাতের বাসায় দুষ্কৃতকারী আক্রমণ করেছে। আমি জলদি পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ফোন করলাম। অনেক চেষ্টার পরও লাইন পাচ্ছিলাম না। তারপর গণভবন এক্সচেঞ্জে লাইন লাগানোর চেষ্টা করলাম। বঙ্গবন্ধু উপর থেকে নিচে নেমে এলেন। আমার কাছে জানতে চাইলেন পুলিশ কন্ট্রোল রুমে কেউ ফোন ধরছে না কেন? আমি ফোন ধরে হ্যালো হ্যালো বলে চিৎকার করছিলাম। বঙ্গবন্ধু আমার হাত থেকে রিসিভার নিয়ে বললেন আমি প্রেসিডেন্ট বলছি। এ সময় দক্ষিণ দিকের জানালা দিয়ে একঝাঁক গুলি এসে ওই কক্ষের দেওয়ালে লাগল। তখন অন্য ফোনে চিফ সিকিউরিটি মহিউদ্দিন কথা বলার চেষ্টা করছিলেন। গুলির তাণ্ডবে কাচের আঘাতে আমার ডান হাত দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। জানালা দিয়ে আসা অনর্গল গুলি থেকে বাঁচতে বঙ্গবন্ধু শুয়ে পড়লেন। আমিও শুয়ে পড়ি।

কিছুক্ষণ পর সাময়িকভাবে গুলি বন্ধ হলে বঙ্গবন্ধু উঠে দাঁড়ান। উপর থেকে কাজের ছেলে সেলিম ওরফে আবদুল বঙ্গবন্ধুর পাঞ্জাবি ও চশমা নিয়ে আসে। সেগুলো পরে বঙ্গবন্ধু বারান্দায় দাঁড়ান। বঙ্গবন্ধু চিৎকার করে বলেন– আর্মি সেন্ট্রি, পুলিশ সেন্ট্রি এত গুলি চলছে তোমরা কী কর? এ সময় শেখ কামাল বলল, 'আর্মি ও পুলিশ ভাই আপনারা আমার সঙ্গে আসুন। কালো পোশাক পরা একদল লোক এসে শেখ কামালের সামনে দাঁড়াল। আমি (মুহিতুল) ও ডিএসপি নূরুল ইসলাম খান শেখ কামালের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। নূরুল ইসলাম পেছনদিক থেকে টান দিয়ে আমাকে তার অফিস কক্ষে নিয়ে গেল। আমি ওখান থেকে উঁকি দিয়ে বাইরে দেখতে চেষ্টা করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে আমি গুলির শব্দ শুনলাম। এ সময় শেখ কামাল গুলি খেয়ে আমার পায়ের কাছে এসে পড়লেন। কামাল ভাই চিৎকার করে বললেন, 'আমি শেখ মুজিবের ছেলে শেখ কামাল, ভাই ওদেরকে বলেন।'

মুহিতুল ইসলাম এজাহারে বলেন, 'আক্রমণকারীদের মধ্যে কালো পোশাকধারী ও খাকি পোশাকধারী ছিল। এ সময় আবার আমরা গুলির শব্দ শোনার পর দেখি ডিএসপি নূরুল ইসলাম খানের পায়ে গুলি লেগেছে। তখন আমি বুঝতে পারলাম, আক্রমণকারীরা আর্মির লোক। হত্যাকাণ্ডের জন্যই তারা এসেছে। নূরুল ইসলাম যখন আমাদের রুম থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন, তখন মেজর বজলুল হুদা এসে আমার চুল টেনে ধরল। বজলুল হুদা আমাদের নিচে নিয়ে গিয়ে লাইনে দাঁড় করাল। কিছুক্ষণ পর নিচে থেকে আমরা বঙ্গবন্ধুর উচ্চকণ্ঠ শুনলাম। বিকট শব্দে গুলি চলার শব্দ শুনতে পেলাম আমরা। শুনতে পেলাম মেয়েদের আত্মচিৎকার, আহাজারি। এরই মধ্যে শেখ রাসেল ও কাজের মেয়ে রুমাকে নিচে নিয়ে আসা হয়। রাসেল আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'আমাকে মারবে না তো।' আমি বললাম, 'না তোমাকে কিছু বলবে না।' আমার ধারণা ছিল অতটুকু বাচ্চাকে তারা কিছু বলবে না। কিছুক্ষণ পর রাসেলকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে রুমের মধ্যে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এরপর মেজর বজলুল হুদা বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের গেটে দাঁড়িয়ে থাকা মেজর ফারুককে বলে, 'অল আর ফিনিশড।'

সত্যিই কি ফিনিশড? না, বরং বঙ্গবন্ধুর দেহ চলে গেছে ঠিকই; কিন্তু তা নীতি-আদর্শে উজ্জীবিত হয়েছে নতুন মোড়কে, নতুন উদ্যমে।

**তিন.**

স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে ফিরে আসি। দলীয় কোন্দলের জেরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে কোহিনূরসহ সাত ছাত্রলীগ নেতাকে গুলি করে হত্যা করা হয় ১৯৭৪ সালের ৪ এপ্রিল। মাহবুব উদ্দিন বীরবিক্রম ছিলেন তখন ঢাকার পুলিশ সুপার। হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে তিনি দেখলেন, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম প্রধান নিজে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন। বিষয়টি তিনি (মাহবুব উদ্দিন) তৎকালীন অতিরিক্ত আইজিপি (এসবি) ই এ চৌধুরীকে অবহিত করলে তাৎক্ষণিক তা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলীকে জানানো হয়। বঙ্গবন্ধু তখন মস্কোতে চিকিৎসাধীন। বঙ্গবন্ধুর বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ এই সহচর (মনসুর আলী) সাহসিকতার সঙ্গে পুরো পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। সিনিয়র কেবিনেট কলিগের সঙ্গে পরামর্শ করে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকসহ অন্য নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের উদ্যোগ নেন তিনি।

যে পরিকল্পনা, সেই কাজ। হত্যার পরদিনই (৫ এপ্রিল) শফিউল আলম প্রধানকে গ্রেফতার করা হয় ঢাকা কলেজের বিপরীতে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিচে 'সীতারাম মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' থেকে। পর্যায়ক্রমে অন্য আসামিরাও গ্রেফতার হয়। সেসময় পাবনা জেলা ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে আমিই প্রথম বিবৃতি দিয়ে এই সাহসী পদক্ষেপের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাই। পরে রাজশাহী জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম ঠান্ডু ও সাধারণ সম্পাদক মফিজ উদ্দিনও আমার পথে হাঁটে। প্রধানকে গ্রেফতারে অভিনন্দন জানানোয় মনিরুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ পাবনা জেলা ছাত্রলীগের কমিটিকে বিলুপ্ত করে, যা পরদিন 'দৈনিক বাংলার বাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। চিকিৎসা শেষে বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে এলে তাঁকে সব ঘটনা জানানো হয়। পুরো বিষয়টি জানার পর ছাত্রলীগ নেতাকে গ্রেফতারের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ সিনিয়র মন্ত্রীদের সাধুবাদ জানান বঙ্গবন্ধু। শুধু তা-ই নয়, সেসময় প্রধানের মুক্তি দাবিতে অনশনরত ছাত্রলীগ কর্মীদের আধা ঘণ্টার মধ্যে অনশন ভাঙার নির্দেশ দেন। অনশন না ভাঙলে গ্রেফতারের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন তিনি। বাধ্য হয়ে তারা অনশন ভাঙেন। অবশ্য জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হওয়ার পর দণ্ডপ্রাপ্ত এই শফিউল আলমকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তার পরবর্তী রাজনৈতিক জীবন তো সবারই জানা।

এদিকে আমার জেলা ছাত্রলীগ কমিটি বিলুপ্ত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে ক্ষুব্ধ ছিলাম। বিষয়টি সরাসরি বঙ্গবন্ধুকে জানানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রায় এক মাস পর অর্থাৎ চুয়াত্তরের মের প্রথম সপ্তাহে বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎ পেলাম। যাতে সহায়তা করলেন শ্রদ্ধেয় এম মনসুর আলী। বঙ্গবন্ধু সেদিন রমনা পার্কের গেট ও বেইলি রোডের মুখে অবস্থিত রাষ্ট্রীয় ভবন 'সুগন্ধা'য় অবস্থান করছিলেন। আমরা সেখানে সকাল ৯টায় পৌঁছি। তোফায়েল আহমেদ তখন বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সচিব। বলে রাখা ভালো, দেশে তখন তথাকথিত মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ চলছিল। সেই দুর্ভিক্ষকে ঘিরে জাহাজে দেশ-বিদেশ থেকে ত্রাণ আসছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র থেকে ত্রাণ নিয়ে আসা দুটি জাহাজ ডুবে যাওয়ায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন বঙ্গবন্ধু। এটা আন্দাজ করতে পেরেই তোফায়েল আহমেদ সেদিন কথা না বলার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। আমরাও চলে আসতে উদ্যত হই। ঠিক তখনই বঙ্গবন্ধু আমাদের ডাক দেন। তিনি তখন বারান্দায় থাকা বেতের চেয়ারে বসে পত্রিকা পড়ছিলেন।

যাই হোক, আমরা বঙ্গবন্ধুর কাছে এগিয়ে গেলাম। তিনি আমাদের দেখে প্রথমেই বলেন– 'ষড়যন্ত্র আর ষড়যন্ত্র। আমার মনটা খুবই খারাপ, পিএল ৪৮০'র অধীনে চট্টগ্রাম অভিমুখে আগমনরত দুটি গমভর্তি জাহাজ একই সময়ে ভারতের বোম্বাই উপকূলে সমুদ্রগর্ভে ডুবে গেছে। আমি কি এ ষড়যন্ত্র বুঝি না? দেশের উত্তরাঞ্চলে খাদ্য সংকট চলছে, এই সময় একত্রে দুটি জাহাজডুবি আমার সরকারকে বিপদের সম্মুখীন করা।' অত্যন্ত আবেগতাড়িত হলেন বঙ্গবন্ধু। একজন বীর দেশপ্রেমিকের কণ্ঠে এ কথা শুনে আমরা আমাদের অভিযোগ থেকে দূরে থাকব বলে সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তো নিজ কর্মীদের বুঝতে পারেন, তিনি ছাড়লেন না। আসার মূল কারণ জানতে চাইলেন। পরে কমিটি বিলুপ্ত হওয়ার খবরটি তাঁকে সবিস্তার জানাই। বঙ্গবন্ধু রাগান্বিত কণ্ঠে বলে উঠলেন– 'ছাত্রলীগ কার?' হতবিহ্বল অবস্থায় বললাম, আপনার। তিনি আমাদের বললেন– তোরা পাবনায় ফিরে যা এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম কর। আমি দেখব কে তোদের বিরত করে? বলা বাহুল্য, এরপর আমাদের জেলা ছাত্রলীগের কার্যক্রমে আর কোনো বাধা আসেনি। সে ধারাবাহিকতায় পাবনা জেলা যুবলীগের সভাপতিও হয়েছিলাম আমি।

১৯৭৫ সালের জুনে বাকশাল গঠন হয়। উদ্দেশ্য– দল-মত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান ও চিকিৎসা নিশ্চিত করা। বলা যায়, আর্থসামাজিক মুক্তিই ছিল এর উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে প্রথমে বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পরে জেলা গভর্নরসহ জেলা কমিটিগুলো গঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর স্নেহধন্য হওয়ায় তিনি আমাকেও এর সদস্য করেন। পদায়ন করেন পাবনা জেলা বাকশালের যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে। সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ছিলেন এখানকার সাধারণ সম্পাদক। বঙ্গবন্ধু স্বহস্তে প্রণয়ন করেছিলেন এই কমিটির তালিকা। পরে বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলীর মুখে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক আমার নামটি লেখার গল্প শুনেছিলাম। এর চেয়ে বড়ো পাওয়া কী হতে পারে?

কমিটি গঠনের পর জেলা বাকশালের সম্পাদক ও পাঁচ যুগ্ম সম্পাদক মিলে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তিনি তখন ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাসায়। জাতির পিতার স্বভাব ড্রেসকোড 'হাফ-শার্ট' ও 'লুঙ্গি' পরেছিলেন। এটা ছিল বঙ্গবন্ধুকে আমার শেষ দেখা। এই সাক্ষাতের দুই মাস পরেই যে তিনি চলে যাবেন, কে জানত সেটা? যাই হোক, ভবনে ঢুকে বঙ্গবন্ধুকে সালাম দিলাম। বাকশাল কমিটিতে স্থান দেওয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। তিনি আমাদের নানা দিকনির্দেশনা দিলেন। চলে আসব, ঠিক এই মুহূর্তে ডাকলেন বঙ্গবন্ধু। বললেন, 'কীরে, আমার সাথে তো ছবি না তুলে কেউ যায় না; তোরা কেন যাস।' তাৎক্ষণিক ক্যামেরাম্যান ডাকলেন। ফটোবন্দি হলাম রাজনীতির কবির সঙ্গে। বঙ্গবন্ধুর হাত থেকে নেওয়া সেই ছবি আজও আমি আগলে রাখছি। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া সর্বশেষ স্মৃতিচিহ্ন যে এটাই!

১৫ আগস্ট মোশতাক চক্রের বুলেটে বঙ্গবন্ধু সপরিবার শহিদ হলে আমি ও পাবনা আওয়ামী লীগ নেতা রফিকুল ইসলাম বকুলের নেতৃত্বে প্রতিরোধ গড়ে তুলি। বিশাল এক মিছিল নিয়ে জেলা শহর প্রদক্ষিণ করি। আমি, বেবি ইসলাম, রফিকুল ইসলাম বকুল, ফজলুল হক মন্টু, আবুল কালাম আযাদ, রেজাউল রহিম লালের নেতৃত্বে অস্ত্র সংগ্রহ করে জোরালো প্রতিরোধ গড়ে তুলি। সকাল ৮টা-সাড়ে ৮টার দিকে পাবনার জেলার তৎকালীন পুলিশ সুপার পি বি মিত্র আমাদের কোনো অ্যাকশনে যেতে বারণ করলেন। তিনি জানালেন, তিন বাহিনীসহ বিডিআর প্রধান ও রক্ষীবাহিনী ইতোমধ্যে মোশতাক সরকারের আনুগত্য প্রকাশ করেছে। তোমাদের উচিত আত্মগোপনে চলে যাওয়া। বিষয়টি অনুধাবন করলাম। শহর ছেড়েছিলামও; কিন্তু ২০ আগস্ট খুনি মোশতাকের তৎসময়ের অনুগত বিপথগামী কিছু সেনা ও পুলিশ সদস্যের হাতে গ্রেফতার হই। সামরিক আইনের ৭ ধারায় (সন্দেহভাজন) হিসেবে ডিএসপি মো. শামসুদ্দিন আমাকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকারী সেই কর্মকর্তা ছিলেন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মুক্তিযোদ্ধা ব্যাচ (১৯৭৩) থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত।

গ্রেফতারের পর জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয় আমাকে। সেপ্টেম্বরের প্রথমদিকে কোনো এক গভীর রাতে জেলখানা থেকে চোখ বেঁধে বালুর ট্রাকে করে সেনা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। শুরু হয় নতুন উদ্যমে নির্যাতন। সেই নির্যাতনকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ডিএসপি কংশধর তরফদার। ছিলেন পাকিস্তানফেরত সেনা কর্মকর্তা মেজর জেনারেল এএলএম ফজলুর রহমানও। ফজলুর রহমান আমাকে একের পর এক বুটের লাথি মারতে থাকেন আর বলতে থাকেন, 'এই ব্যাটা তোর বঙ্গবল্টু কোথায়?' এও বলা হয়– তোরা শেখ মুজিব হত্যার প্রতিবাদ করেছিলি, মিছিল করেছিলি? তোদের গুলি করে মারা হবে। ভেবেই নিয়েছিলাম, জীবন চলে যাবে। যে দেশে জাতির পিতা সপরিবারে নিহত হন, সে আমি আর এমন কী! কিন্তু পরক্ষণেই দেখলাম, আমাদের আবারও গাড়িতে ওঠানো হচ্ছে। পরে সেনা ক্যাম্পে ফিরিয়ে নিয়ে প্রায় অর্ধমৃত অবস্থায় পুনরায় কারাগারে পাঠানো হয়।

জেল থেকে বের হয়ে পরিবারের সব সদস্যের আর্থিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে আমিও দুর্বল হয়ে যাই। ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলি বর্ণাঢ্য এক রাজনৈতিক জীবন। কষ্ট হলো তখন, যখন দেখলাম বঙ্গবন্ধুকে গালি দিয়ে আমাকে নির্যাতন করা সেই ফজলুর রহমানই বিজিবি প্রধান (ফেব্রুয়ারি ২০০০-জুলাই ২০০১) হয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন করা বাংলাদেশে বসে রাষ্ট্রীয় সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন তিনি।

আগস্ট এলেই দুঃসহ স্মৃতি ভেসে ওঠে মানসপটে। বারবার স্মৃতি খুঁজে ফিরে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কাটানো সেই নাতিদীর্ঘ সময়গুলো। কিছুটা আশ্বস্ত হই এই ভেবে যে প্রিয় নেতা, ঘাতক জল্লাদরা আপনাকে হত্যা করেছে ঠিকই; কিন্তু বাঙালি জাতির হৃদয়-আসন থেকে আপনাকে কি সরাতে পেরেছে? পারেনি। আপনি অমর-অক্ষয়-অবিনশ্বর। ছড়া-কবিতা-গান, শিল্প-কাব্য-সাহিত্য, চিন্তা-চেতনা-আদর্শ, পরিবার-সমাজ এমনকি রাষ্ট্র– বঙ্গবন্ধু, কোথায় নেই আপনি?

নির্ভীক এ বিশ্বনেতাসহ তাঁর পরিবার এবং ১৫ আগস্টে নিহত সব শহিদের প্রতি রইল বিনম্র শ্রদ্ধা।

**লেখক: বীর মুক্তিযোদ্ধা ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য**

# বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের বন্ধু

**শাহাব উদ্দিন মাহমুদ**

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের কথা। পৃথিবীর বহুদেশ তখনও পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। ইংরেজদের দখলে পুরো ভারতবর্ষ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। ভারতবর্ষের অজানা ও নিভৃত প্রত্যন্ত গ্রাম, নাম টুঙ্গিপাড়া, যে গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে মধুমতী নদী। প্রত্যন্ত এই গ্রামে যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, একসময় সে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, তাঁর নাম ও যশ ছড়িয়ে পড়বে দূরদূরান্তে– এতটুকু স্বপ্ন হয়তো বা তাঁর গর্বিত পিতা-মাতার ছিল। অজানা আশঙ্কা থাকাও অসম্ভব ছিল না। পরাধীন দেশে মানুষের স্বপ্ন কতটুকুই বা পূর্ণতা পায়। আর দূরদূরান্তে যশ ছড়িয়ে পড়া! সে কত দূরকে বোঝাবে? আজ থেকে ৯৮ বছর আগে ১৯২০ সালে এই অঞ্চলে যখন ঢাকা শহর থেকে দূরের এমন অনেক গ্রাম আছে, যেখানে যেতেই দুই-তিন দিনের মতো সময় লেগে যেত, তখন এই সীমানার মধ্যে বড়ো হওয়াটা স্বপ্নেরও অতীত। গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে শেখ লুৎফর রহমান ও শেখ সায়েরা খাতুনের ঘর আলোকিত করে যে ফুটফুটে ছেলের জন্ম হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাঙালির ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। প্রথম পুত্রসন্তান, মা-বাবার অনাবিল

আনন্দ, শেখ পরিবারের নতুন অতিথি– সবাই আদর করে নাম রেখেছিলেন খোকা। ১৯২৭ সালে খোকা গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন, যখন তাঁর বয়স সাত বছর। ১৯২৯ সালে ৯ বছর বয়সে খোকা গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখানেই ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ১৯৩৭ সালে গোপালগঞ্জ মাথুরানাথ ইনস্টিটিউট মিশন স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। চোখে জটিল রোগের সার্জারির কারণে ১৯৩৪ থেকে চার বছর তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ চালিয়ে যেতে পারেননি। ১৯৪১ সালে তিনি গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, তারপর কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। ১৯৪৪ সালে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে আইএ এবং একই কলেজ থেকে ১৯৪৭ সালে বিএ পাস করেন। ভারত ভাগের পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে অধ্যয়নের জন্য ভর্তি হয়েছিলেন। তবে পড়াশোনা শেষ করতে পারেননি। কারণ চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ন্যায্য দাবিদাওয়ার প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে তাঁদের বিক্ষোভে উসকানি দেওয়ার অভিযোগে ১৯৪৯ সালের প্রথমদিকে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। স্কুলজীবন থেকেই শেখ মুজিবের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ঘটেছিল। তিনি যখন গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলের ছাত্র, সেসময় ১৯৩৯ সালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক ওই স্কুল পরিদর্শনে আসেন। ওই অঞ্চলের অনুন্নত অবস্থার প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কিশোর মুজিব বিক্ষোভ সংগঠিত করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় কর্মী এবং ১৯৪৩ সাল থেকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর একনিষ্ঠ অনুসারী। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের পক্ষে ফরিদপুর জেলায় দলীয় প্রার্থীদের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতার সিরাজউদ্দৌলা হোটেলে পূর্ব পাকিস্তানের পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারণে সমবেত হয়েছিলেন কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক কর্মী। সেখানে পাকিস্তানে একটি অসাম্প্রদায়িক ভাবধারার রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগঠন করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের কর্মী সম্মেলনে গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক যুবলীগের কর্মী সম্মেলনে ভাষাবিষয়ক কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলো পাঠ করেছিলেন সেদিনের ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। ভাষা সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করে তিনি বলেছিলেন, 'পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের লেখার বাহন ও আইন-আদালতের ভাষা করা হউক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হইবে, তৎসম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনসাধারণের ওপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক। এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হউক।' বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনে অংশ নেওয়ার মাধ্যমেই তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতার সূচনা ঘটে। ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠনে প্রধান সংগঠকদের একজন ছিলেন শেখ মুজিব। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন গণপরিষদের অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তব্যে বলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তার এই বক্তব্যে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। প্রতিবাদী শেখ মুজিব অবিলম্বে মুসলিম লীগের এই পূর্বপরিকল্পিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরুর সিদ্ধান্ত নেন। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে পাকিস্তানের স্রষ্টা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও তাঁর মৃত্যুর পরে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব তাঁর মনে যুগপৎ হতাশা ও স্বপ্ন তৈরি করেছিল। শেখ মুজিব বরাবর আত্মপ্রত্যয়ী এবং কখনো হাল ছাড়ার পাত্র নন। দুটি বিষয় তিনি তখনই উপলব্ধি করেছিলেন– পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং মুসলিম লীগ বাঙালির ভবিষ্যৎ নির্মাণের উপযুক্ত রাজনৈতিক দল নয়। ফলে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সামনে রেখে ১৯৪৯ সালেই প্রতিক্রিয়াশীল গণবিরোধী দল মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। তরুণ শেখ মুজিব দলের সামনের কাতারে বর্ষীয়ান নেতাদের রাখলেও এর চালিকাশক্তি যে তিনিই ছিলেন, তা পরবর্তী ঘটনাবলি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। ১৯৪৮ সালে ভাষার প্রশ্নে তাঁর নেতৃত্বেই প্রথম প্রতিবাদ এবং ছাত্র ধর্মঘট শুরু হয়, যা চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে। শেখ মুজিব ছিলেন ভাষা আন্দোলনের প্রথম কারাবন্দিদের একজন। কারাগার থেকে পরপর তিনদিন তিনি ভাষা আন্দোলন দমনের প্রতিবাদে বিবৃতি দেন। বায়ান্নর ঘটনাবলির পরে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রদেশের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। ক্রমে মুসলিম জাতীয়তাবাদকে ডিঙিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা জোরদার হয়। এই প্রবণতার স্পষ্ট প্রতিফলন

তরুণ শেখ মুজিব দলের সামনের কাতারে বর্ষীয়ান নেতাদের রাখলেও এর চালিকাশক্তি যে তিনিই ছিলেন, তা পরবর্তী ঘটনাবলি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। ১৯৪৮ সালে ভাষার প্রশ্নে তাঁর নেতৃত্বেই প্রথম প্রতিবাদ এবং ছাত্র ধর্মঘট শুরু হয়, যা চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে

ঘটেছে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ পূর্ববঙ্গ থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। তখন থেকেই প্রদেশে ধর্মের পরিবর্তে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের একচ্ছত্র বিকাশ নিশ্চিত হয়। মুজিব ও তাঁর অনুসারীরা তখনই দল থেকে সাম্প্রদায়িক পরিচয় মুছে দিলেন। আওয়ামী লীগ তখন পুরোপুরি সেক্যুলার গণতান্ত্রিক দলে পরিণত হয়। ১৯৫৫ সালের ২১ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা ভাষার প্রশ্নে তাঁর প্রদত্ত ভাষণ ছিল উল্লেখযোগ্য। মাতৃভাষায় বক্তব্য রাখার অধিকার দাবি করে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'আমরা এখানে বাংলায় কথা বলতে চাই। আমরা অন্য কোনো ভাষা জানি কি জানি না, তাতে কিছুই যায় আসে না। যদি মনে হয়, আমরা বাংলায় মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি, তাহলে ইংরেজিতে কথা বলতে পারা সত্ত্বেও আমরা সব সময় বাংলাতেই কথা বলব। যদি বাংলায় কথা বলতে দেওয়া না হয়, তাহলে আমরা পরিষদ থেকে বেরিয়ে যাব। কিন্তু পরিষদে বাংলায় কথা বলতে দিতে হবে। এটাই আমাদের দাবি।'

১৯৫৬ সাল। সোহরাওয়ার্দী তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রী। পূর্ব পাকিস্তানে এসেছেন সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পাকিস্তানের নেতারা। অনেকেই উর্দুভাষী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে তাঁদের সম্মানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সংগীত, নাটক, নৃত্য ভালোই হলো। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান বলে বসলেন, "এত নাটক হলো, গান হলো; কিন্তু তোমরা 'আমার সোনার বাংলা' শোনাবা না?" শিল্পীরা আবার মঞ্চে উঠলেন। সবাই মিলে গান ধরলেন, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।' ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলন অব্যাহত ছিল। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অনুমোদনের মাধ্যমে এই আন্দোলন তার লক্ষ্য অর্জন করে। বস্তুত জেলে অন্তরিন থাকা অবস্থায় নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদকের তিনটি পদের মধ্যে একটিতে নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবের সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। পঞ্চাশের দশক তাঁর রাজনৈতিক উত্থানের কাল। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠেন দূরদর্শী এক রাজনৈতিক নেতা। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান মুসলিম লীগ ছেড়ে দেন এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মওলানা ভাসানীর সঙ্গে মিলে গঠন করেন 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'। তিনি দলের প্রথম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সালে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষিমন্ত্রী এবং ১৯৫৬ সালে কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রিসভায় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান তিনি। আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভা থেকে নয় মাস পর ইস্তফা দেন। ষাটের দশকে সারা বিশ্বের মতো দেশের ছাত্র-তরুণ, শিল্পী-সাহিত্যিক, শিক্ষক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বামপন্থার দিকে ঝোঁক বেড়েছিল। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষের মধ্যে তখন এই ধারার প্রভাব বেড়ে যায়। শোষণ-বঞ্চনা, সাম্প্রদায়িকতা-ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও সব সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে এই ধারায় যে রাজনীতি, এর সঙ্গে শেখ মুজিব তাঁর জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে যুক্ত করতে সক্ষম হন। ১৯৬৪ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের শাসনামলে আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করার মতো সাহসিকতা দেখিয়েছেন শেখ মুজিব, পাকিস্তান ধারণাটির ব্যাপারে ইতোমধ্যেই বঙ্গবন্ধুর মোহমুক্তি ঘটেছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের মনোভাবের মধ্যে সমতা ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ ছিল না। ১৯৬৬ সালেই তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলগুলোর একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে পাকিস্তানে বাংলার মানুষের এবং বাঙালির অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে তিনি তাঁর বিখ্যাত ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং এই ছয় দফাকে আখ্যায়িত করেন বাঙালির 'মুক্তির সনদ'রূপে। দফাগুলো হলো: ১. ফেডারেল রাষ্ট্র গঠন এবং সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন; ২. প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র ব্যতীত অপর সব বিষয় প্রাদেশিক সরকারগুলোর হাতে ন্যস্ত করা; ৩. দুই রাষ্ট্রের জন্য পৃথক মুদ্রা চালু করা অথবা পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচার রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ; ৪. করারোপের সব ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারগুলোর হাতে ন্যস্ত করা; ৫. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলোকে স্বাধীনতা প্রদান; ৬. রাষ্ট্রগুলোকে নিজের নিরাপত্তার জন্য মিলিশিয়া বা আধা সামরিক বাহিনী গঠনের ক্ষমতা প্রদান করা। সংক্ষেপে এ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে রাজনীতির প্রতি তাঁর এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, ছয় দফা কর্মসূচির অর্থ ছিল কার্যত পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বাধীনতা। সব রাজনৈতিক দলের রক্ষণশীল সদস্যরা এ কর্মসূচিকে আতঙ্কের চোখে দেখলেও এটা তরুণ প্রজন্ম বিশেষত ছাত্র, যুবক ও শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে নতুন জাগরণের সৃষ্টি করে। ছয় দফা কর্মসূচির চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার পর আইয়ুব সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করে। শেখ মুজিবসহ আরও ৩৪ জনের বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে একটি রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করা হয়। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে ঢাকা কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের বিশেষ ট্রাইব্যুনালে মামলাটির বিচার চলছিল, যেটা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানের আধিপত্যবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে বাঙালিদের আবেগ-অনুভূতিকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। ১৯৬৯ সালের প্রথমদিকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে গণআন্দোলন এমন একপর্যায়ে পৌঁছে যে, আইয়ুব সরকার দেশে আসন্ন একটি গৃহযুদ্ধ এড়ানোর চেষ্টায় মামলাটি প্রত্যাহার করে নেয়। শেখ মুজিব ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি নিঃশর্ত মুক্তিলাভ করেন। মুক্তির পরদিন সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ রমনার রেসকোর্সে তাঁর সম্মানে গণসংবর্ধনার আয়োজন করে। সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে পরিষদের সভাপতি তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর আয়োজিত এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ববাংলার নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'। উনসত্তরের বিশাল গণআন্দোলনে সামরিক শাসক আইয়ুব খানের পতন হলো। গণঅভ্যুত্থানের পরে বঙ্গবন্ধু জনগণের আস্থাভাজন প্রিয়নেতা এবং সবাইকে ছাপিয়ে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা, এই জনপদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহানায়ক। এই সময়ে তাঁর নেতৃত্বে দেশের মানুষ কাতারবন্দি হতে থাকে। তিনি মাঠপর্যায়ের তখনকার সময়ের শক্তিশালী প্রগতিশীল বামধারার রাজনৈতিক দল এবং পেশাজীবী, ছাত্র-তরুণ ও শিল্পী-বুদ্ধিজীবীসহ অধিকাংশের আস্থা অর্জনে সক্ষম হন। তিনি সত্তরের নির্বাচনকে নিলেন তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার পক্ষে গণভোট হিসেবে। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক আইনসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টির মধ্যে ৩০৫টি আসন লাভ করে। ব্যালটে তিনি এমন অভাবিত বিজয় অর্জন করলেন, যখন পাকিস্তানিদের বুলেট, ট্যাংক, কামান সবই তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। এ নির্বাচনে বাঙালিরা বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার প্রতি সমর্থন জানিয়ে তাঁকে অভূতপূর্ব বিজয় উপহার দিয়েছিল। বাঙালিরা প্রথমবার এই দেশের শাসনভার গ্রহণ করবে, পাকিস্তানি মিলিটারির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

১৯৭১ সাল। ৩ জানুয়ারি। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জনসভা। বঙ্গবন্ধু সদ্যনির্বাচিত জাতীয় পরিষদের সদস্যদের শপথ করালেন, কেউই ছয় দফা থেকে এক অক্ষরও সরবে না, সরতে পারবে না। সভার শেষে দুটো গান পরিবেশিত হয়। 'ধনধান্য পুষ্পভরা' আর 'আমার সোনার বাংলা'। এমএ ওয়াজেদ মিয়া তাঁর বইয়ে লিখেছেন, "সেদিন রাতে খেতে বসে বঙ্গবন্ধু একপর্যায়ে গম্ভীর হয়ে আমাদের উদ্দেশ করে বললেন, 'দেশটা যদি কোনোদিন স্বাধীন হয়, তাহলে দেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে কবিগুরুর 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটিকে গ্রহণ করো।" ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পল্টন ময়দানের জনসভায় স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে 'আমার সোনার বাংলা' গানটিকে গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করা হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে 'আমার সোনার বাংলা' গানটি জাতীয় সংগীত হিসেবে গাওয়া হয়। 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'– বঙ্গবন্ধু 'সোনার বাংলা' শব্দবন্ধটি তুলে নিয়েছিলেন এই গান থেকে। সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্ন তিনি দেখতেন, এই স্বপ্নে তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন দেশবাসীকে। ১৯৭০ এর নির্বাচনের আগে পোস্টার করা হয়েছিল, 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন'। স্বাধীনতার পর তিনি বলতেন, 'সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই।'

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পল্টন ময়দানের জনসভায় স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে 'আমার সোনার বাংলা' গানটিকে গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করা হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে 'আমার সোনার বাংলা' গানটি জাতীয় সংগীত হিসেবে গাওয়া হয়

একাত্তরের শুরুতে জুলফিকার আলী ভুট্টো সামরিক কর্তাদের যোগসাজশে বিজয়ী দল আওয়ামী লীগ ও বিজয়ী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধা সৃষ্টি করে সংঘাতের পথ রচনায় সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছেন। তবে এই নির্বাচনের ফলাফলেও পাকিস্তানের দুই প্রদেশের ঐক্য যে অবাস্তব এবং দেশটির ঐক্যবদ্ধ ভবিষ্যৎ যে সংকটাপন্ন, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করলেও ২৬৭টি অর্থাৎ সব আসনই জিতেছে পূর্ব পাকিস্তানে। আবার ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টির কোনো ভিত্তিই ছিল না দেশের পূর্বাংশে। দুই প্রদেশে প্রতিনিধিত্বকারী কনভেনশন মুসলিম লীগ আগেই কাগুজে দলে পরিণত হয়েছিল এবং এই বাংলায় চিরকালের জন্য দলটি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলে পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে বাঙালির ভবিষ্যৎ নিয়ে শেখ মুজিবের চিন্তার দূরদর্শিতা স্পষ্ট বোঝা যায়। বঙ্গবন্ধু কালের যাত্রাপথে নানা সংকটে-বিপদে-বিপর্যয়ে অবিচল থেকে একে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার অনিবার্যতা আগেই বুঝেছিলেন বলে স্বাধীনতা নিয়ে তাঁর মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। ছয় দফা, মাঠের রাজনীতি এবং বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু তাঁর যাত্রাপথ স্পষ্টই রেখেছিলেন। নির্বাচনে বিজয়ী শক্তিশালী বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এতটাই ভয় পেয়েছিল যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা তারা ভাবতেই চায়নি। এটাও ঠিক যে, তারা বাঙালি মুসলমানদের কখনো সমকক্ষ নাগরিক ভাবতে পারেনি। এদের দ্বারা শাসিত হওয়ার বিষয়ে তাদের চরম অনীহা প্রকাশ পেয়েছে। এমনকি তারা বঙ্গবন্ধুকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসিয়ে ব্যর্থতার দায় চাপানোর চক্রান্তের পুরোনো কৌশল প্রয়োগের সাহসও করেনি। তারা সামরিক হস্তক্ষেপ ছাড়া বিকল্প কিছু ভাবতে পারেনি। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ আকস্মিক এক ঘোষণায় ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন। বিশাল ষড়যন্ত্রের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী তারা নির্বাচনের রায় অস্বীকার করা মাত্রই সারা দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। তাঁর নির্দেশে এই অঞ্চল চলতে শুরু করল। সমগ্র প্রদেশ তাঁকে সমর্থন জানাল। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে (২-২৫ মার্চ ১৯৭১) পূর্ব পাকিস্তানের গোটা বেসামরিক প্রশাসন তাঁর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এবং তাঁর নির্দেশমতো চলে। তিনি কার্যত প্রদেশের সরকারপ্রধান হয়ে যান। লন্ডনের দৈনিক Evening Standard পত্রিকার ভাষায়: 'জনতার পুরোপুরি সমর্থন পেয়ে শেখ মুজিব যেন পূর্ব পাকিস্তানের কর্তৃত্বে সমাসীন হন।' বেতারে ইয়াহিয়ার বিবৃতি প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বাঙালি জাতি অপেক্ষা করতে থাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কী নির্দেশ দেন।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রমনার রেসকোর্স মাঠে পূর্বঘোষিত জনসভায় ১০ লক্ষাধিক মানুষের বিশাল সমাবেশে বঙ্গবন্ধু তাঁর পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে, তা নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েই ক্ষান্ত হননি। তিনি অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি দেন, যা বাংলাদেশের সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হতে থাকে। তিনি বেসামরিক প্রশাসন চালু করার জন্য ৩৫টি বিধি জারি করেন। ১৯৭১ সালে ৭ মার্চ থেকে পূর্ব বাংলা মূলত তাঁর নির্দেশেই চলতে থাকে। সেদিন থেকেই ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়িটি ছিল পূর্ব বাংলার জনগণের সব আশা-আকাঙ্ক্ষার উৎস। মানুষ আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকত সেখান থেকে কী নির্দেশ আসে? দেশের বাস্তব সার্বভৌমত্ব যখন জনগণের হাতে, এমনই এক পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দলের সঙ্গে আলোচনা শুরু করতে ১৫ মার্চ ঢাকায় আসেন। পরদিন থেকে আলোচনা শুরু হয়, যা মাঝেমধ্যে বিরতিসহ

২৫ মার্চ সকাল পর্যন্ত চলে। এ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন এবং লাগাতার হরতাল চলছিল। ২ মার্চ থেকে ছাত্র ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা স্বাধীনতা ঘোষণা করতে থাকেন এবং এ ধারা অব্যাহতভাবে চলে।

২৫ মার্চ ১৯৭১। টালমাটাল মার্চের এদিন মানুষের ঢল নামে মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসভবনে। সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সারাদিন মাঝে মাঝে মিছিলের সামনে এসেই তিনি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদান করেন এবং সবাইকে সর্বাত্মক সংগ্রামের জন্য তৈরি হওয়ার আহ্বান জানান। এদিন তাঁর বাড়িতে সকাল থেকে অগণিত সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের মধ্যে প্রায় ২০০ ছিলেন বিদেশি। বেলা ১২টায় শেখ মুজিব খবর পান, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সদলবলে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে চলে গেছেন। ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে পূর্ব বাংলায় সামরিক অভিযান চালানোর নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন– আমি শুধু বাংলার মাটি চাই, মানুষ নয়। বাঙালির আবেগ, সংগ্রাম ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে নির্মূল করতে অস্ত্র হাতে ইতিহাসের নির্মম হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠার নীলনকশা চূড়ান্ত করে শোষিত ও নির্যাতিত মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অপারেশন সার্চলাইটের নামে ২৫ মার্চ মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে পৈশাচিক তাণ্ডব চালিয়ে ছাত্র-শিক্ষক এবং নিরীহ লোকদের গণহারে নিষ্ঠুরভাবে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। বঙ্গবন্ধু আত্মগোপন বা গা ঢাকা দিয়ে প্রতিবেশী সম্ভাব্য বন্ধুরাষ্ট্রে গিয়ে স্বাধীনতার সংগ্রাম চালানোর চেয়ে প্রতিপক্ষের হাতে বন্দি হওয়াকেই নিজের ভাগ্য হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর মতো ক্যারিশম্যাটিক জনপ্রিয় নেতার জন্য হয়তো এটাই স্বাভাবিক পদক্ষেপ। তবে তাজউদ্দীন আহমদসহ সতীর্থ সবাইকে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার এবং তাঁর অনুগামী জনগণকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণাও দিয়েছিলেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গণহত্যা শুরু করলে ২৬ মার্চের সূচনালগ্নে গ্রেফতার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশে বলেন, 'এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ হতে বাংলাদেশ স্বাধীন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিত পিলখানার ইপিআর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের লোকদের হত্যা করছে। ঢাকা-চট্টগ্রামের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। আমি বিশ্বের জাতিগুলোর কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ– দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোনো আপস নেই, জয় আমাদের হবেই। আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সব আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী এবং অন্য দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাপ্রিয় লোকদের এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আমাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।'

বঙ্গবন্ধুর এই স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার হওয়ার পর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বর ও নির্বিচারে গণহত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও সর্বব্যাপী পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতি তাদের সর্বশক্তি নিয়ে সশস্ত্র লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সারাদেশে শুরু হয় প্রতিরোধ যুদ্ধ। অপ্রস্তুত জাতির ওপর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীই বস্তুত যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তারপর বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব রূপকথার মতো অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। নিষ্ঠুর আক্রমণের মুখে লাখো নিরস্ত্র মানুষ যেমন ঘরবাড়ি, সহায়সম্পদ, দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল; তেমনই আবার বাঙালি সেনা এবং কিশোর থেকে বৃদ্ধ নানা বয়সের হাজারও মানুষ যুদ্ধে যাওয়ার জন্য পাগলপারা হয়েছে। এ এক রূপান্তরের কাহিনি। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে মেহেরপুরের অখ্যাত গ্রাম ভবের পাড়া। ওই গ্রামেরই বৈদ্যনাথতলায় সাদামাটা পরিবেশে একটি আমবাগানে শপথ নিয়েছিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকার। একাত্তরের ১৭ এপ্রিল শপথ নেওয়া ওই সরকারের নেতৃত্বেই দেশের অকুতোভয় সূর্যসন্তানরা দীর্ঘ নয় মাস তুমুল যুদ্ধ করে ৩০ লাখ শহিদের প্রাণের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে বৈদ্যনাথতলার নামকরণ করা হয় মুজিবনগর। সে সরকারও পরিচিতি পায় মুজিবনগর সরকার নামে। মিয়ানওয়ালি কারাগারে বন্দি অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর বিচার চলাকালে ডিফেন্স ল'ইয়ার হিসেবে একে ব্রোহিকে নিয়োগ দিতে চেয়েছিল পাকিস্তান সরকার। দৃঢ়চেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, 'আই উইল নট ডিফেন্ড মাইসেলফ। বিকজ ইয়াহিয়া খান ইজ দ্য প্রেসিডেন্ট অব পাকিস্তান। ইয়াহিয়া খান ইজ দ্য চিফ মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। হি ইজ দ্য কনফার্মিং অথরিটি অব মাই ডেথ সেনটেন্স। অলরেডি হি টোল্ড, মুজিব ইজ এ ট্রেইটর। যেহেতু রায় দেওয়া হয়ে গেছে। সুতরাং আমি নিজকে ডিফেন্ড করব না।' একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর হানাদার বাহিনী মাথা নত করে পরাজয় স্বীকার করে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। বিশ্বের মানচিত্রে স্থান পায় একটি স্বাধীন দেশ, স্বাধীন পতাকা– যার নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের পর ভুট্টো ভীত হয়ে পড়ে যে, ইয়াহিয়া কি ইতোমধ্যে মুজিবকে হত্যা করেছে? তাহলে বাংলাদেশে এই খবর পৌঁছলে সেখানে বন্দি হয়ে থাকা প্রায় এক লাখ পাকিস্তানি সৈন্যের প্রতি মুক্তিবাহিনী কোনো প্রকার যুদ্ধবন্দির সম্মান বা করুণা প্রদর্শন না করার আশঙ্কাই বেশি। তাদের জীবিত ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। ভুট্টো নিউইয়র্কে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে ব্যস্ত থাকার কারণে সর্বশেষ কয়েকদিন মুজিবের অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। ভুট্টোর চাপাচাপিতে ইয়াহিয়া স্বীকার করেন যে, মুজিব এখনো বেঁচে আছেন। কিন্তু ইয়াহিয়া এটাও বলেন যে, প্রাণ থাকতে তিনি মুজিবকে জীবিত ফেরত দেবেন না। এদিকে ১৯ ডিসেম্বর রাতে পরাজয়ের অপমান সহ্য করতে না পেরে পদত্যাগ করেন তৎকালীন পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান। রাতে পাকিস্তান বেতারে প্রেসিডেন্ট পদে ইয়াহিয়া খানের ইস্তফাদানের বার্তা ঘোষিত হয়। বার্তায় বলা হয়, 'আগামীকাল প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের সাথে সাথে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো নিউইয়র্ক থেকে দেশের পথে রয়েছেন এবং তিনি নতুন সরকার গঠন করবেন বলে মনে করা হচ্ছে।' ভুট্টোর ফেরার খবর পেয়েই জরুরি মিটিং ডাকেন ইন্দিরা গান্ধী। ভুট্টোর বিমান রিফুয়েলিংয়ের জন্য থামার কথা ছিল হিথ্রো বিমানবন্দরে। ইন্দিরা গান্ধী চেয়েছিলেন, সেসময় সেখানে উপস্থিত থাকুক কোনো ভারতীয় প্রতিনিধি। যাতে তিনি জানতে পারেন, শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে কী ভাবছেন তিনি? সেই বৈঠকে ছিলেন বিদেশমন্ত্রকের উপদেষ্টা দুর্গা প্রসাদ ধর, RAW প্রধান রামনাথ কাও, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পিএন হাসকার, বিদেশ সচিব টিএন কাউল। পূর্ব পাকিস্তানের চিফ সেক্রেটারি মুজাফফর হোসেন ভারতে যুদ্ধবন্দি হন এবং ডিপি ধরের বাড়িতে অতিথির মর্যাদায় ছিলেন। তার স্ত্রী ছিলেন লন্ডনে। ফলে সেই সময় কূটনীতিকদের মাধ্যমেই যোগাযোগ করতেন স্বামী-স্ত্রী। অবসরপ্রাপ্ত কূটনীতিবিদ শশাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তিনিই দুজনের মাধ্যম হয়ে উঠেছিলেন। ফলে দুজনের সঙ্গেই ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। লায়লা ছিলেন ভুট্টোর একসময়ের বান্ধবী।

সেই লায়লাকেই কাজে লাগান ইন্দিরা গান্ধী। ভুট্টোর সঙ্গে কথা বলতে পাঠান লায়লাকে। উদ্দেশ্য ছিল একটাই– শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে কী ভাবছেন, সেটা জানা। এই শশাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়ই লায়লাকে জানান, তিনি যাতে হিথ্রো বিমানবন্দরে গিয়ে একসময়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভুট্টোকে বলেন, তাঁর স্বামীকে ভারত থেকে ছাড়ার ব্যবস্থা করতে। সেই মতো এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে দেখা হয় দুজনের। কথাবার্তা শেষে লায়লাকে কাছে টেনে তার কানে কানে একটা বার্তা দেন ভুট্টো। বলেন, 'লায়লা আমি জানি, তুমি কী জানতে এসেছ! একটা মেসেজ দিও ইন্দিরা গান্ধীকে। বলো, আমি মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেব। কিন্তু বদলে কী চাইব? সেটা পরে জানাব।' বার্তা জানান লায়লা। তবুও সন্দেহ দূর হয় না। ভারতকে ভুল পথে চালিত করছেন না তো ভুট্টো? কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই সন্দেহের অবসান হলো। খবরটা সত্যি, সেটাই জানা গেল। বদলে চাওয়া হলো ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দিকে। ক্ষমতা হারানোর শেষ মুহূর্তে ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা জেলের অন্য কয়েদিদের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার চক্রান্ত করে। মিয়ানওয়ালি কারাগারের কয়েদিদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে, বাংলাদেশে নিয়াজিকে হত্যা করা হয়েছে। এর প্রতিশোধ হিসেবে মুজিবকে হত্যা করতে হবে। চক্রান্তের পরিকল্পনা ছিল ভোর ৬টায় কয়েদিদের সেল খুলে দেওয়া হবে এবং তারা বঙ্গবন্ধুর সেলে আক্রমণ চালাবে। কিন্তু জেলার হাবিব আলীর সহৃদয়তায় বঙ্গবন্ধু বেঁচে যান। জেলার ভোর ৪টায় বঙ্গবন্ধুকে নিজ বাড়িতে নিয়ে যান এবং বঙ্গবন্ধু সেখানে পরবর্তী দুইদিন অবস্থান করেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়ে প্রথম ভাষণেই 'ভাঙা পাকিস্তান'কে জোড়া লাগানোর আবেদন জানিয়ে ভুট্টো বলেছিলেন, 'পূর্ব পাকিস্তান আমাদের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারা এদেশের বৃহদাংশ। আমি নিশ্চিত তারা আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে বাস করতে চায়। আমি তাদের কাছে আবেদন করছি, তারা যেন আমাদের ভুলে না যায়। তবে তারা যদি ক্ষুব্ধ হয়ে থাকে, তাহলে তারা যেন আমাদের ক্ষমা করে।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা পূর্ব পাকিস্তান ফিরে পেতে লড়াই করব।' ক্ষমতা হারানোর শেষ মুহূর্তে ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা জেলের অন্য কয়েদিদের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার চক্রান্ত করেন। ব্যর্থ হয়ে দায়িত্ব হস্তান্তরের সময় বঙ্গবন্ধুকে হত্যায় মরিয়া ইয়াহিয়া ভুট্টোকে প্রস্তাব দেন পেছনের তারিখ দেখিয়ে মুজিবকে ফাঁসিতে ঝোলানো যায় কি না। কিন্তু ভুট্টো অস্বীকৃতি জানান।

মুক্ত বাংলাদেশে বিজয়োল্লাসের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবস্থান সম্পর্কে জানতে উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়ে সবাই। পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ সংবাদমাধ্যমগুলো বিবেকবান উদ্বিগ্ন মানুষকে জানিয়ে দেয় যে, মুজিব বেঁচে আছেন। স্বস্তি পায় পুরো পৃথিবী। কিন্তু অপেক্ষার এক দীর্ঘ প্রহর শুরু হয় সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে, বঙ্গবন্ধুর নিজের মানুষের মাঝে। কবে নেতা ফিরে আসবেন? নেতার ফিরে আসা ছাড়া এই স্বাধীনতা অর্থহীন। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ তাঁর জীবন বাঁচাতে উদ্যোগী হলে রাওয়ালপিন্ডিতে বিদেশি সংবাদদাতাদের জন্য আয়োজিত নৈশভোজে পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো স্বীকার করলেন, শেখ মুজিব অক্ষত রয়েছেন। তবে শীঘ্রই তাঁকে মুক্তি দিয়ে গৃহবন্দি করে রাখা হবে। ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধুকে রাওয়ালপিন্ডির সিহালা নামক স্থানে একটি বাড়িতে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং তাঁকে সেখানে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। ক্ষমতা সংহত করে সেখানে দেখা করতে হাজির হন জুলফিকার আলী ভুট্টো। ২৩ এবং ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ দু'দফায় বৈঠক করেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে। ভুট্টোকে প্রথমবার দেখে বঙ্গবন্ধু বিস্ময় প্রকাশ করেন, ভুট্টো আপনি এখানে কেন? ভুট্টো জানান, তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। বঙ্গবন্ধু শ্লেষাত্মক হাসি দিয়ে বলেন, সেই ম্যান্ডেট তো আমার ছিল, আপনি কোন যোগ্যতায়? বিব্রত ব্যক্তিত্ব হারানো ভুট্টো উচ্চারণ করেন যে, তিনি পাকিস্তানের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকও বটে। ভ্রাতৃত্বের দোহাই, কোনোভাবে দুই পাকিস্তানকে এক রাখার চেষ্টা, ভুট্টোর সরকারের পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হওয়া কিংবা অন্তত কনফেডারেশন– এরকম অনেক উদ্ভট প্রস্তাব উড়িয়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধু শুধু বলেন, 'আমার মানুষদের কাছে ফিরে যাওয়া ছাড়া আমি কিছুই বলতে পারব না।' বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে প্রিয় শব্দ 'আমার মানুষ'। করাচিতে নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে এক বৈঠকে ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি মুজিবের মুক্তির ব্যাপারে ভুট্টো সিদ্ধান্ত নেন বলে জানা যায়। কিন্তু সঠিক তারিখটি গণমাধ্যমকে জানাননি তিনি। তারপর ৩ জানুয়ারি করাচিতে লাখো মানুষের এক উন্মুক্ত জনসভায় ভুট্টো পাকিস্তানের জনগণের সম্মতি আদায় করে নেন মুজিবের মুক্তির ব্যাপারে। ভুট্টোর প্রশ্নের জবাবে জনতা চিৎকার করে জবাব দেয়, হ্যাঁ, আমরা মুজিবের মুক্তি চাই। ভুট্টো স্বস্তির সঙ্গে উচ্চারণ করেন 'শুকরিয়া'। কিন্তু ভুট্টো ভেতরে ভেতরে গোপন ষড়যন্ত্র আঁটতে থাকে!

ভ্রাতৃত্বের দোহাই, কোনোভাবে দুই পাকিস্তানকে এক রাখার চেষ্টা, ভুট্টোর সরকারের পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হওয়া কিংবা অন্তত কনফেডারেশন– এরকম অনেক উদ্ভট প্রস্তাব উড়িয়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধু শুধু বলেন, 'আমার মানুষদের কাছে ফিরে যাওয়া ছাড়া আমি কিছুই বলতে পারব না'

১৯৭২ সালের ৭ জানুয়ারি সন্ধ্যায় ডিনার টেবিলে ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে বলেন যে, ইরানের শাহ আসছেন। তাই নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তানের আকাশসীমা বন্ধ এবং সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। ভুট্টো প্রস্তাব করেন যে, এই পরিস্থিতিতে মুজিব তাঁর দেশে ফেরা বিলম্বিত করতে পারেন কি না। বঙ্গবন্ধু বুঝতে পারেন যে, মরিয়া ভুট্টো শাহের মাধ্যমে তাঁকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবেন দুই পাকিস্তানের কোনো সম্পর্কসূত্র রাখার ব্যাপারে। বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। আপনি চাইলেই পাকিস্তানের আকাশসীমা আবার খুলতে পারেন।' ভুট্টোর শেষ চেষ্টাটিও ব্যর্থ হয়। যে বাড়িতে বঙ্গবন্ধু গৃহবন্দি ছিলেন, সেখান থেকে

নিজে গাড়ি চালিয়ে বঙ্গবন্ধুকে বিমানবন্দরে পৌঁছে দেন ভুট্টো। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন রেডক্রসের একটি বিমানে নিরপেক্ষ কোনো দেশে পৌঁছতে। সেখান থেকে তিনি নিজের মানুষদের কাছে পৌঁছবেন। শেষ পর্যন্ত রেডক্রসের বিমান সংস্থান করতে পারেননি ভুট্টো। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সম্মতিতেই তাঁর লন্ডন যাত্রার ব্যবস্থা করেন। বঙ্গবন্ধুকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ইরান কিংবা তুরস্কে যাওয়ার। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। লন্ডনের প্রস্তাবটি তিনি গ্রহণ করেন। চাকলালা বিমানবন্দর ছিল নিরাপত্তার চাদরে ঘেরা। আর বঙ্গবন্ধু লন্ডনে পৌঁছার পর ভুট্টো গণমাধ্যমের কাছে প্রকাশ করেন যে, মুজিবকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং তিনি এখন লন্ডনে। এটি ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রস্থানের ১০ ঘণ্টা পর। বিমানে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলেন ডক্টর কামাল হোসেন এবং তাঁর পরিবার। আরও ছিলেন পাকিস্তানের বিমানবাহিনী এবং বিমান চলাচল দপ্তরের কয়েকজন কর্মকর্তা। লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধু পৌঁছেন ৮ জানুয়ারি ভোরে। লন্ডনে বঙ্গবন্ধুর আগমনের সংবাদ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ পান বঙ্গবন্ধুর বিমান অবতরণের এক ঘণ্টা আগে। হইচই পড়ে যায় ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের সাউথ এশিয়ান ডেস্কে। তারা সিদ্ধান্ত নেন যে, বঙ্গবন্ধুকে পূর্ণ রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা দেওয়া হবে। বিমানবন্দরে দৌড়ে যান সাউথ এশিয়া ডেস্কের সচিব স্যার ইয়ান সাদারল্যান্ড। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ তাঁর অবকাশ বাতিল করে ডাউনিং স্ট্রিটে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ফিরে আসেন। ৮ জানুয়ারি সকাল ৭টায় বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসে প্রচারিত খবরে বলা হয়: 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বিমানে লন্ডনে আসছেন।' বিমানবন্দরে অবতরণ করার পর ব্রিটিশ সরকার বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রীয় অতিথির মর্যাদা দেয়। বঙ্গবন্ধু ক্ল্যারিজেস হোটেল থেকে টেলিফোনে কথা বলেন ঢাকায় তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে, বিশেষ করে শিশু রাসেল, তাঁর রাজনৈতিক সহচর এবং প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ আর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে। ইতোমধ্যে গণমাধ্যম মারফত জানতে পেরে হোটেল এবং আশপাশের রাস্তায় মানুষের ঢল নামে। বিলেতের বাঙালি কমিউনিটির লোকজন প্রিয় নেতাকে একবার দেখতে চায়, তারা বঙ্গবন্ধুর 'আমার মানুষেরা'। বঙ্গবন্ধু হোটেলের বারান্দায় এসে তাদের দিকে হাত নাড়েন– এক সূর্যমাখা হাত, নিজের মানুষের জন্য ভালোবাসামাখা হাত। বঙ্গবন্ধু ক্ল্যারিজেস হোটেলে প্রেস কনফারেন্সে গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। সাংবাদিকদের তিনি জানান, তিনি জীবিত এবং সুস্থ আছেন। তিনি আরও জানান যে, তাঁর জনগণ যে মহাকাব্যিক স্বাধীনতাযুদ্ধের মাধ্যমে মুক্তি অর্জন করেছে, এর বাঁধভাঙা আনন্দ তিনি সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করতে পেরে খুব ভালো অনুভব করছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ এবং লেবার দলীয় বিরোধী দলীয় নেতা হ্যারল্ড উইলসনের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের কথাও সাংবাদিকদের জানান। বঙ্গবন্ধু প্রেস কনফারেন্সের আগেই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে বৈঠক করেন। বাংলাদেশের স্বীকৃতি আর বিবিধ সহযোগিতা নিয়ে কথা বলেন। পাকিস্তানের সঙ্গে ন্যূনতম সম্পর্কসূত্র রাখার কোনো সম্ভাবনা নেই বলে প্রধানমন্ত্রী হিথকে সাফ জানিয়ে দেন বঙ্গবন্ধু।

প্রধানমন্ত্রী হিথের সম্মতিতে রয়েল এয়ারফোর্সের একটি বিশেষ বিমান বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যাত্রা করে দিল্লির উদ্দেশে। বিমানে তাঁর সঙ্গে ডক্টর কামাল হোসেন, তাঁর স্ত্রী হামিদা হোসেন, লন্ডনস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের প্রথম সচিব ভেদ মারওয়া এবং লন্ডনস্থ ভারতীয় দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব ও পলিটিক্যাল অফিসার শশাঙ্ক ব্যানার্জি। শশাঙ্কের বর্ণনায় জানা যায়, বঙ্গবন্ধু বিমানের মধ্যেই 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি গাইছিলেন এবং তাঁর চোখে ছিল জল। তিনি বিমানে বসেই এই গানটিই বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হবে বলে জানান শশাঙ্ককে। তিনি বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের ব্যাপারে বিমানের মধ্যেই আলাপ করেন বলে জানান শশাঙ্ক। বঙ্গবন্ধু দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে অবতরণ করেন ১০ জানুয়ারি সকালে। সেখানে তাঁকে সাদরে গ্রহণ করতে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী, ভারতের রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার শরণ সিং, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, তিন বাহিনীর প্রধান এবং ভারত সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। বাংলাদেশের পক্ষে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ। একুশবার তোপধ্বনির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানানো হয়। এর মধ্যেই বিমানবন্দরের লাউঞ্জে আলাপে বঙ্গবন্ধু ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়টি ইন্দিরা গান্ধীকে বলেন। ইন্দিরা গান্ধীও সহাস্য সম্মতি প্রদান করেন। দিল্লির পালাম বিমানবন্দরের আশপাশে ছিল উৎসুক জনতার ভিড়। দিল্লিতে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ভারত সরকারের কর্মসূচি ছিল অনেক দীর্ঘ। বঙ্গবন্ধু সেই কর্মসূচি সংক্ষিপ্ত করার অনুরোধ করেন। সেটাও তাঁর সোনার বাংলা আর তাঁর মানুষদের কাছে দ্রুত ফেরার তাগিদেই। বঙ্গবন্ধুকে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য দিল্লির প্যারেড গ্রাউন্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। চারদিকে জনতার হর্ষধ্বনি শেখ মুজিব জিন্দাবাদ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, জয় বাংলা। বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা শুরু করেন ইংরেজিতে। কিন্তু জনতা চিৎকার করে উঠে নেতার কণ্ঠে বাংলায় বক্তৃতা শোনার জন্য। বঙ্গবন্ধু বাংলায় বক্তৃতা করেন। শুরু করেন 'আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা' সম্বোধন দিয়ে। কৃতজ্ঞতা জানান ভারত সরকার আর ভারতের জনগণের প্রতি। নিজেদের দুঃখ-কষ্ট থাকার পরও এক কোটি মানুষকে খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করার জন্য তিনি ভারতের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। বঙ্গবন্ধুর প্রাণ রক্ষায় মিসেস গান্ধীর সারা পৃথিবীময় কূটনীতির জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। মিসেস গান্ধীর সঙ্গে তাঁর মতাদর্শিক মিলের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যাওয়া হয় ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনে। প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে রাষ্ট্রপতি ভবন পর্যন্ত প্রায় আট কিলোমিটার রাস্তা ছিল লোকে লোকারণ্য। একটি বিমান নিম্ন উচ্চতায় উড়ে উড়ে ফুলের পাপড়ি বর্ষণ করছিল। শশাঙ্কের বয়ানে জানা যায়, লন্ডন থেকে বিমান-যাত্রার মধ্যেই বঙ্গবন্ধুকে কলকাতা যাওয়ার আমন্ত্রণবার্তা পাঠান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়। কলকাতার মানুষ বঙ্গবন্ধুকে দেখতে উদ্‌গ্রীব ছিল। বঙ্গবন্ধুও তাঁর মানুষদের কাছে ফিরে আসতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। তাই এই প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী ব্রিটিশ এয়ারফোর্সের বিমানটি ঢাকার আকাশে দেখা দেয় ১০ জানুয়ারি ১৯৭২, দুপুর ১টা ২০ মিনিটে। এর ২০ মিনিট পর তিনি বিমান থেকে নেমে আসেন। দিনটি ছিল সোমবার। জনতার ১০ মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে নেতা ফিরে আসেন তাঁর দেশে, তাঁর মানুষের মাঝে। বিমানবন্দরে তাঁকে বরণ করে নেন তাঁর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহকর্মীরা, তাঁর প্রবাসী সরকারের সদস্যরা, স্বাধীন বাংলা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ। আরও উপস্থিত ছিলেন বিবিধ দেশের কূটনীতিক, ছিলেন মিত্রবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। গার্ড অব অনার প্রদান করে তিন বাহিনী। তারপর তাঁকে বহন করে একটি খোলা ট্রাক এগিয়ে চলে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের দিকে। ২৯০ দিনের কারাজীবন আর ফাঁসির মঞ্চ পেছনে ফেলে নেতা এগিয়ে চলেছেন জনতার জোয়ারের ভেতর দিয়ে। চারদিক লোকে লোকারণ্য।

প্রিয় নেতাকে একবার দেখার বাসনায় দূরদূরান্ত থেকেও লোকজন এসেছে। দেশজুড়ে রাস্তাঘাট তখনও অচল, ব্রিজ-কালভার্ট সব ভেঙে পড়ে আছে। এখানে-সেখানে লাশ পড়ে আছে, পড়ে আছে পরিত্যক্ত যুদ্ধাস্ত্র অথবা ভয়ানক মাইন। সেসব বাধা ডিঙিয়ে মানুষ এগিয়ে এসেছে প্রিয় নেতাকে বরণ করে নিতে। চারদিক স্লোগানমুখরিত। শেখ

মুজিব জিন্দাবাদ, জয় বাংলা স্লোগানে প্রকম্পিত আকাশ-বাতাস। পুলিশ ব্যারিকেড ভেঙে নেতার সঙ্গে একটু হাত মেলানো কিংবা নেতাকে জড়িয়ে ধরার আবেগে উদ্বেল ছিল জনতা। তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স মাত্র পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা। প্রায় দুই ঘণ্টা লেগে যায় লাখ লাখ জনতার স্রোত পেরিয়ে পৌঁছতে। নেতা পৌঁছেন সাড়ে ৪টায়। এবিসি নিউজের সাংবাদিক রন মিলারের রিপোর্ট মতে, প্রায় ১০ লাখ লোকের সমাবেশ হয়। জনতার উদ্দেশে ভাষণে উঠে আসে বঙ্গবন্ধুর কারাজীবনের স্মৃতি। বক্তৃতার শুরুতেই বঙ্গবন্ধু শহিদ ছাত্র, শ্রমিক, সেপাই আর সাধারণ মানুষের আত্মার মঙ্গল কামনা করেন। তিনি আবেগি কণ্ঠে বলেন, 'আমার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে, আমার মনের আশা পূর্ণ হয়েছে। আমার বাঙালি আজ মুক্তি পেয়েছে।' বঙ্গবন্ধু দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম। বাংলাদেশকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।' সারাদেশে আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের বন্যা বয়ে যায়। লন্ডন থেকে প্রকাশিত দৈনিক গার্ডিয়ান পত্রিকা ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেছিল: 'শেখ মুজিব ঢাকা বিমানবন্দরে পদার্পণ করা মাত্র নতুন প্রজাতন্ত্র এক সুদৃঢ় বাস্তবতা লাভ করে।' ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু বিশ্ব মিডিয়ার নজর কেড়েছিলেন। আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় তাঁকে তুলে ধরা হয়েছে 'মহান নেতা' ও 'অসামান্য ব্যক্তিত্ব' শিরোনামে। নিউজ উইক ম্যাগাজিন তাদের প্রচ্ছদে বঙ্গবন্ধুকে 'পয়েট অব পলিটিকস' অভিধায় আখ্যায়িত করে নিবন্ধ প্রকাশ করেছিল। গোপালগঞ্জের নিভৃত পল্লিতে জন্মগ্রহণ করেও কালের পরিক্রমায় জাতিকে প্রস্তুত করে তিনি অনগ্রসর এ জাতিকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করেছেন। দিয়েছেন স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত রাষ্ট্রটির উত্থানের লক্ষ্যে শুরু হয় এক নতুন সংগ্রাম। আর অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে 'সোনার বাংলাদেশ' গড়ে তোলার এক অদম্য স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরন্তর প্রচেষ্টা শুরু করেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুই মূলধারার রাজনীতিবিদ, যিনি স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন প্রথম থেকেই লালন করেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন, পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বাঙালির বিকাশ সম্ভব নয়। তবে গুরুত্বপূর্ণ হলো, তিনি কেবল স্বপ্ন দেখেননি, তিনি এর বাস্তব সম্ভাবনাও দেখেছেন। তিনিই সেই রাজনীতিবিদ, যিনি এই স্বপ্ন ও সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অবিরাম রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। বিজয়ী বাংলাদেশকে তিনি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর দলে ব্যবসায়ী-জমিদার শ্রেণির মানুষ থাকলেও রাজনীতিতে তিনি বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের পক্ষে ছিলেন। তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছেন, জগৎ শোষক ও শোষিতে বিভক্ত এবং শোষিতের পক্ষেই থাকবেন। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি শোষণ-বৈষম্যমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চেয়েছিলেন বলেই রাষ্ট্রের মূলনীতিতে সমাজতন্ত্র যুক্ত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেন নিজ দেশে বাঙালি মাথা উঁচু করে বিকশিত হতে পারে।

হাজার বছরের চিরায়ত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে তাঁর অর্জিত দূরদৃষ্টি, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং পবিত্র জীবনদর্শন দিয়ে জাতিকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা তাঁকে গড়ে তুলেছে মহীয়ান! তাঁর জীবনদর্শনে মিশে আছে সততা, নির্লোভ, মানুষের প্রতি গভীর মমতা, আত্মত্যাগ এবং দুর্মর সাহস। একটি দেশ, একটি জাতি, একটি পতাকা– এই স্বপ্ন বুকে নিয়ে মুক্তির আন্দোলনে তিনি অকুতোভয়চিত্তে দিয়েছেন সর্বোত্তম নেতৃত্ব। তাঁর অদৃশ্য ছায়ায় পরিচালিত হয়েছে বাঙালির সুমহান মুক্তিযুদ্ধ। এ মহান নেতার ৫৫ বছরের জীবনের প্রায় অর্ধেক শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য আর যৌবনের এক অংশ কেটে যায় ভবিষ্যতের প্রস্তুতিতে, পরাধীন ভারতবর্ষে। তারপর ১৯৪৭ সালের আগস্ট থেকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত ২৪ বছর কেটে যায় নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানে বাংলার মানুষের এবং বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে। জীবনের এই অধ্যায়ের প্রায় পুরো সময়টাই কেটে গেছে পাকিস্তানিদের হাতে প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার হয়ে এবং কারা অভ্যন্তরে। আর ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত থেকে ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে মুক্তি পাওয়া পর্যন্ত ৯ মাস কেটে যায় সুদূর পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে। মুক্তির পরের সাড়ে তিন বছর সময় অতিবাহিত হয় একদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশকে গড়ে তোলার নিরবচ্ছিন্ন কঠোর প্রচেষ্টায় এবং একই সঙ্গে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত সামলাতে। চূড়ান্ত স্বাধীনতা অর্জনের আগে ব্রিটিশরা এই অঞ্চলটিকে প্রায় দুইশ বছর শাসন-শোষণ করেছে। তাদের হাত থেকে স্বাধীনতার জন্য হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছে, জেল খেটেছে, দ্বীপান্তরিত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের রক্তে লাল হয়ে উঠেছিল বাংলার মাটি। বঙ্গবন্ধু তখন তরুণ নেতা। অনাদিকালের ভ্রাতৃত্ব ও একতার মাধুর্যে গড়া বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের দাঙ্গা রোধে বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করেছিলেন। তাই জাতির মহান এই নেতা বাঙালি জাতির হৃদয় স্পর্শ করে বুঝতে পেরেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব, উন্নতি, মর্যাদা এবং শক্তির অন্যতম অবলম্বন হবে বাঙালি সংস্কৃতিপ্রসূত অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রনীতি। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম মৌলিক আদর্শ হিসেবে সন্নিবেশিত করলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। সংবিধানে সুনির্দিষ্ট ধারা যোগ করে রক্ষাকবচ তৈরি করলেন, যাতে বাংলাদেশে কেউ ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি আর করতে না পারে। তিনি

তাঁর জীবনদর্শনে মিশে আছে সততা, নির্লোভ, মানুষের প্রতি গভীর মমতা, আত্মত্যাগ এবং দুর্মর সাহস। একটি দেশ, একটি জাতি, একটি পতাকা– এই স্বপ্ন বুকে নিয়ে মুক্তির আন্দোলনে তিনি অকুতোভয়চিত্তে দিয়েছেন সর্বোত্তম নেতৃত্ব

বিভিন্ন সময় তাঁর দেওয়া বক্তৃতায় বলেছিলেন– এই দেশ হিন্দুর না, এই দেশ মুসলমানের না। এই দেশকে যে নিজের বলে ভাববে, এই দেশ তার। এই দেশের কল্যাণ দেখে যার মন খুশিতে ভরে উঠবে, এই দেশ তার। এই দেশের দুঃখে যে কাঁদবে, এই দেশ তার। এবং এই দেশ তাদের, যারা এই দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও দেবে। সাম্প্রদায়িকতা যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশ। মুসলমান তার ধর্মকর্ম করবে। হিন্দু তার ধর্মকর্ম করবে। বৌদ্ধ তার ধর্মকর্ম করবে। কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবে না। কিন্তু ইসলামের নামে আর বাংলাদেশের মানুষকে লুট করে খেতে দেওয়া হবে না। এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণি আছে, তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে বঙ্গবন্ধু যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন, তা তিনি বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি। কিন্তু স্বৈরাচারী শোষকদের দোসররা কখনোই চায়নি জাতির পিতার সেই ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলার স্বপ্ন কোনোদিন সত্যি হোক। আর তাই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একদল বিপথগামী সেনা সদস্য ও ক্ষমতালোভী দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের শিকার হন বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম কিংবদন্তি এই জননেতা। আর সেখানেই থমকে যায় সম্ভাবনাময় একটি বাংলাদেশের সোনার স্বপ্ন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে তাঁকে হত্যার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি পরাজিত শক্তি বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা পিছিয়ে দিয়েছিল। প্রতিবছর আগস্ট সমাগত হলে বাঙালি শোকাতুর ও যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ে। সেই দিন ঘৃণ্য নরপশুরা শুধু একজন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেনি, তারা একে একে হত্যা করেছে বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধুর পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশুপুত্র শেখ রাসেলসহ পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামালকে। জঘন্যতম এ হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা পাননি বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের, ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত, ভাগনে শেখ ফজলুল হক মনি, বেগম আরজু মনি, কর্নেল জামিলসহ ১৭ জন। ঘাতকদের নিক্ষিপ্ত গোলায় মোহাম্মদপুরে কয়েকজন সাধারণ নারী-পুরুষও মারা যান। এসব হত্যার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের মহান আদর্শ ও চেতনাকে মুছে ফেলার চেষ্টা শুরু হয়। যার ডাকে জেগেছিল সাড়ে সাত কোটি প্রাণ রণাঙ্গনে, সেই কণ্ঠকে স্তব্ধ করাই শুধু নয়, জাতির বিকাশকে স্তিমিত করার ঘৃণ্য চেষ্টা অবলোকন করেছে বিশ্ববাসী। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যখন ভারতবাসী তাদের অকৃত্রিম বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার ঘটনা জানতে পারে, তখন ভারতের স্বাধীনতা দিবসের আনন্দ মুহূর্তেই বিষাদে রূপ নেয়। ফিন্যান্সিয়াল টাইমস ১৯৭৫ সালে তাঁকে নিয়ে লিখে: 'বঙ্গবন্ধু না থাকলে কখনই বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না।' বিখ্যাত টাইম ম্যাগাজিন প্রচ্ছদে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শিরোনাম করে: 'বাংলাদেশ: ফ্রম জেইল টু পাওয়ার'। দ্য গার্ডিয়ানে লেখা হয়: 'শেখ মুজিব ছিলেন এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব'। পশ্চিম জার্মানির পত্রিকায় শেখ মুজিবকে চতুর্দশ লুইয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়। জনগণ তাঁর কাছে এত প্রিয় ছিল যে, লুইয়ের মতো তিনি এ দাবি করতেই পারেন, আমিই রাষ্ট্র। প্রয়াত ভারতীয় বিজ্ঞানী ও সাবেক রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামের ভাষায়, "বঙ্গবন্ধু নিজেই ছিলেন 'ঐশ্বরিক আগুন' এবং তিনি নিজেই সে আগুনে ডানা যুক্ত করতে পেরেছিলেন।" ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ভাষায় তিনি হলেন এ দেশের মুক্তিদাতা ও বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের বন্ধু। কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হিমালয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। শ্রীলঙ্কার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী লক্ষ্মণ কাদির গামা উপমহাদেশের এ মহান নেতা সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'দক্ষিণ এশিয়া গত কয়েক শতকে বিশ্বকে অনেক শিক্ষক, দার্শনিক, দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক, রাজনৈতিক নেতা ও যোদ্ধা উপহার দিয়েছে। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান সবকিছুকে ছাপিয়ে যান, তাঁর স্থান নির্ধারিত হয়ে আছে সর্বকালের সর্বোচ্চ আসনে।' সাবেক ইরাকি প্রেসিডেন্ট প্রয়াত নেতা সাদ্দাম হোসেন বলেছিলেন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রথম শহিদ। তাই তিনি অমর।' ফিলিস্তিনি নেতা ইয়াসির আরাফাত বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বলেন, 'আপসহীন সংগ্রামী নেতৃত্ব আর কুসুমকোমল হৃদয় ছিল মুজিব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।' নোবেল বিজয়ী উইলিবান্ট বলেন, 'মুজিব হত্যার পর বাঙালিদের আর বিশ্বাস করা যায় না, যারা মুজিবকে হত্যা করেছে, তারা যে কোনো জঘন্য কাজ করতে পারে।' বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার খবর শুনে কাস্ত্রো বলেছিলেন, 'শেখ মুজিবের মৃত্যুতে বিশ্বের শোষিত মানুষ হারাল তাদের একজন মহান নেতাকে, আমি হারালাম একজন অকৃত্রিম বিশাল হৃদয়ের বন্ধুকে।' মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এতটাই দুঃখ পেয়েছিলেন যে, তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'তোমরা আমারই দেওয়া ট্যাংক দিয়ে আমার বন্ধু মুজিবকে হত্যা করেছ! আমি নিজেই নিজেকে অভিশাপ দিচ্ছি।'

১৯৭৫ সালের সেই ভোরে কী বৃষ্টি হয়েছিল? খুব ভোরে টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভাঙে বঙ্গবন্ধুর, তিনি শুনতে পান আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায় হামলা হয়েছে, গোলাগুলি হচ্ছে। তিনি টেলিফোন করেছিলেন পুলিশকে। কিন্তু তিনি কোনো দিনও ভাবেননি তাঁর বাড়িতেও যে হামলা হতে পারে! ভারত ও আমেরিকানরা সাবধান করে দিয়েছিল, বিশেষ প্রতিনিধি বাড়িতে এসে খবর দিয়েছিল এবং সাবধান করে দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, বাংলার মানুষ কোনো দিনও আমার ক্ষতি করবে না। পাকিস্তানি জেনারেলরা সাহস পায়নি গায়ে হাত দেওয়ার, বাঙালিরা কোত্থেকে পাবে? কিন্তু তিনি যখন দেখলেন, তাঁর বাড়িতেও আক্রমণ করা হয়েছে, বাইরে গোলাগুলি হচ্ছে, তখন কী ভাবছিলেন বঙ্গবন্ধু? যখন দেখলেন, শেখ কামালের বুলেটবিদ্ধ শরীর থেকে রক্তের ধারা বইছে, তখন এই বাঙালিদের ওপর থেকে আস্থা কি টলে যাচ্ছিল? না। কারণ, বঙ্গবন্ধু পুলিশকে বলেছিলেন, পালটা গুলি করা বন্ধ করো। গুলি বন্ধ হলো। খুনিরা ঢুকে গেল বাড়িতে। বঙ্গবন্ধু সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন। পরনে লুঙ্গি, পাঞ্জাবি, হাতে পাইপ আর দেশলাই। 'তোরা কী চাস?' বঙ্গবন্ধুর এই প্রশ্নের জবাবে ওরা যখন গুলি করল, তখনও কি বাঙালিদের ওপর থেকে আস্থা হারাননি? গুলিবিদ্ধ হয়ে সিঁড়িতে পড়ে যেতে যেতে কী ভেবেছিলেন বঙ্গবন্ধু? ওরা বাংলার মানুষ, ওরা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারে না! বলেছিলেন, আমি বাঙালি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলা আমার দেশ... আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন– এই দেশের মানুষের কাছে তাঁর ঋণ ছিল, তারা তাঁকে খুব ভালোবাসত, তাঁর রক্ত দিয়ে যদি সেই ঋণ কিছুটা শোধ যায়, তবে তাই হোক...। হায়রে ঘাতক বাঙালি! তোমরা জাতির পিতাকে নয়, পুরো বাঙালি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে হত্যা করেছিলে সেদিন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকদের বুলেটের আঘাতে নশ্বর মুজিব অবিনশ্বরতার পথে চলে গেলেন চিরতরে। তাঁর জীবনাবসানে উত্থান হলো চিরন্তন মুজিবের। ইতিহাস তাঁকে নিয়ে গেল ধরাছোঁয়ার ঊর্ধ্বে রূপকথার মহানায়কের আসনে, তাঁর যথাযোগ্য স্থানে। এই পৃথিবীর কোনো ষড়যন্ত্র আর কোনো দিন তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না।

**লেখক: শিক্ষাবিদ ও গবেষক**

# চিরায়ত বাঙালি

**জাফর ওয়াজেদ**

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে এসেছে ততদিনে। তারই অভিঘাত যদিও আসেনি এই বঙ্গদেশে, তবুও ভারতবর্ষে তখনও আঁধার কেটে আলোর ঝরনা বইছিল না। দখলদার শ্বেতাঙ্গ শাসকরা নিজে আলোকিত হলেও উপমহাদেশজুড়ে অন্ধকারের বাতাবরণ তখন। মানুষ চায় শোষণ, নিপীড়ন থেকে বেরিয়ে স্বাধীন সত্তার বিকাশ ঘটাতে। কিন্তু শাসকের শক্তিমত্তার কাছে তা অসহায়ত্ব ছাড়া কিছু ছিল না। এমনই পরিবেশ তখন দেশজুড়ে। আর তখন পৃথিবীর মানচিত্রের বিশালত্বের ভেতর টুঙ্গিপাড়া নামক গ্রামটি, পৃথিবীর বিচ্ছিন্নতম গ্রামটিতে একদিন আলোর ফোয়ারা জ্বেলে জেগে উঠেছিল বাংলার প্রাণমন আপ্লুত করে এক মানবশিশুর কান্না-হাসির উতরোল। একটি শতক আগে অর্থাৎ বিংশ শতকের পাদপ্রান্তে তখন মানুষ রণক্লান্ত। মহাযুদ্ধ শেষে পৃথিবীর ঘরে ঘরে তখনও উৎকণ্ঠা। মানবতার অপমান বেজে ওঠে। ফুলের কুঁড়িরাও নিজের ইচ্ছামতো ফুটতে পারে না তখন আর। ঠিক সেসময় আকাশের মতো বিস্তীর্ণ, প্রান্তরের মতো উদার এক শিশু স্পর্শ রাখল বাংলার সবুজ মাটিতে। কালের প্রবাহ ধরে আলোকিত শিশুটিই 'আরও আলো চাই গো' বলে সারা দেশ তোলপাড় করে ছড়িয়ে দিয়েছিল সূর্যের শিরায় শিরায় বাংলার প্রাণ।

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের গ্রাম টুঙ্গিপাড়ায় চৈত্রদিনের গান, বসন্তকালের আলো-হাওয়া প্রবাহিত তখন, আর এরই মাঝে আবির্ভূত হলেন বাংলার সহস্র বর্ষের সাধনার নাম– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তিনি শুধু একটি নাম নন, হলেন একটি জাগ্রত ইতিহাস। একটি স্বাধীন জাতিসত্তার অপরিমেয় অহংকার, বর্ণিল ঐশ্বর্য। বঙ্গবন্ধু, বাঙালি এবং স্বাধীনতা একসূত্রে গাঁথা। বাংলাদেশের অস্তিত্বস্পর্শী অমর নাম। ন্যায়, সত্য, কল্যাণ এবং আত্মমুক্তির পক্ষে সোচ্চার উদার হৃদয় মহান মানুষ। কোনো প্রকার সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প তাঁকে স্পর্শ করেনি কখনো। বাঙালিত্ব ছিল তাঁর অহংকার। এই বাঙালিকে তিনি জাগিয়ে তুলেছেন রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক দক্ষতায়। কোটি কোটি মানুষের ইচ্ছার অনিন্দ্য কুসুম ফুটিয়ে তুলেছিলেন তিনি। তাঁরই আহ্বানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যুদ্ধজয়ের রক্তাক্ত অধ্যায়ে বাঙালি জাতি। সৃষ্টি করেছিল ইতিহাস। জাতির শানিত শিরায় অকুতোভয় সাহস ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। দুঃসময়, হতাশার সব বাধার দেওয়াল ভেঙে দীর্ঘ পরাজিত, শোষিত, বঞ্চিত জাতিকে স্বাধীনতার সূর্যস্নানে স্নাত করিয়েছেন। তাই তো প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম উচ্চারিত হয় ত্যাগের উজ্জ্বল মহিমায় সিক্ত একটি নাম– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই নাম অবিরাম প্রতি সূর্যোদয়ে, সূর্যাস্তে অক্ষয়-অম্লান। চিরদিন বাংলার আকাশে-বাতাসে-মাটিতে শৌর্যে-বীর্যে বহমান নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের প্রিয় নাম হয়ে প্রজ্বলিত যুগ থেকে যুগে। বঙ্গবন্ধু তো শুধু একটি নাম নন, তিনি হলেন একটি জাতির জাগ্রত ইতিহাস। একটি জাতির জন্মদাতা। একটি স্বাধীন জাতিসত্তার অপরিমেয় অহংকার, বর্ণিল ঐশ্বর্য। বঙ্গবন্ধু, বাঙালি এবং স্বাধীনতা একসূত্রে গাঁথা।

বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজের জীবনের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। অসমাপ্ত সেই জীবনী। ঘাতকের উদ্যত সঙ্গিন সেই রচনা সমাপ্ত হতে দেয়নি। একাত্তরের পরাজিত শক্তি এবং তাদের দেশি-বিদেশি এজেন্টরা বাঙালিত্বের চেতনা এবং স্বাধীনতার সব অর্জনকে নস্যাৎ করে দিতে বঙ্গবন্ধুর ওপর আঘাত হানে। যে শালপ্রাংশু, সিংহহৃদয় মহান মানুষটি অসীম দেশপ্রেম, জনগণের প্রতি তর্কাতীত ভালোবাসা, অনমনীয় দৃঢ়তা, ভয়-দ্বিধাহীন প্রত্যয় এবং কঠোর অধ্যবসায়কে সম্বল করে ক্রমে ক্রমে ইতিহাসের দীর্ঘ কণ্টকাকীর্ণ পথ পাড়ি দিয়েছেন। শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু, জাতির পিতা এবং সর্বোপরি একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা পেয়েছেন। তাঁকে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট দস্যুর মতো রাতের অন্ধকারে নিরস্ত্র অবস্থায় পরিজনসহ হত্যা করা হয়েছিল। এ যে জাতির জন্য কত বড়ো গ্লানি, অপমান ও লজ্জার কথা; তা অবর্ণনীয়। ইতিহাসের চাকা, সভ্যতার চাকাকে নিষ্পেষিত করে ঘাতকরা বাঙালি জাতির জীবনে সৃষ্টি করেছিল ট্র্যাজেডি।

টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম যে মহান মানুষটির, তাঁর জীবন ও কর্ম একটি জাতির জীবনকে দিকনির্দেশনা দেয় প্রতিমুহূর্তে। মানুষের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য, মানুষের প্রতি মমত্ববোধ শেখ মুজিবকে এক মহানপ্রাণ মহামানবে পরিণত করার দিগন্ত উন্মীলিত করেছে। বাঙালি জাতির প্রাণপ্রবাহ এবং ধমনিতে তিনি সাহসের মন্ত্র বুনে দিয়েছেন। নির্যাতিত-নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন তিনি। বাংলার অবহেলিত এবং হতভাগ্য জনগণের কল্যাণ কামনায় সর্বক্ষণ ব্যাপৃত ছিলেন। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষণ কেটেছে তাঁর অত্যন্ত ব্যস্ততায়। একটি মুহূর্তকেও অপচয় খাতে প্রবাহিত করেননি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ একটি নাম, একটি ইতিহাস। বাঙালি জাতির সংগ্রামী জীবনধারার প্রতিটি সিঁড়িতে ছিলেন তিনি এককভাবে অগ্রসরমান। সবাইকে পেছনে রেখে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন একটি পশ্চাৎপদ ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তোলার কঠিন কাজটি সম্পাদনে। একটি জাতির জাগরণ, একটি জাতির অভ্যুত্থান, একটি রক্তাক্ত একাত্তর এবং একটি স্বাধীনতা– সবকিছুই সম্ভব হয়েছে একক নেতৃত্বে। আর এই যুগান্তকারী কালজয়ী নেতাই হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালি যাকে 'বঙ্গবন্ধু' খেতাব দিয়ে সম্মানিত-সমৃদ্ধ করেছে নিজেদের। জাতি জানে, এসব অর্জন সম্ভব হয়েছিল একজন শেখ মুজিবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিশাল ব্যক্তিত্বের কারণে। ছিলেন দূরদর্শী, দুঃসাহসী, আপসহীন। সততা, কর্মনিষ্ঠতা, কর্মকুশলতা– সবকিছু মিলিয়ে এক অতুলনীয় মানবে পরিণত হয়েছিলেন শেখ মুজিব। হয়ে উঠেছিলেন বাঙালি জাতির জীবনে আপন দ্যুতিতে প্রজ্বল এক অবিনাশী ধ্রুবতারা। সহস্র বছরের সাধনা শেষে বাঙালি জাতি পেয়েছে তার মহানায়ককে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিকে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ একটি নাম, একটি ইতিহাস। বাঙালি জাতির সংগ্রামী জীবনধারার প্রতিটি সিঁড়িতে ছিলেন তিনি এককভাবে অগ্রসরমান। সবাইকে পেছনে রেখে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন একটি পশ্চাৎপদ ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তোলার কঠিন কাজটি সম্পাদনে

শেখ মুজিবুর রহমানের পুরো জীবনটাই নিবেদিত তাঁর দেশ, জাতি ও জনগণের জন্য। বুকের তাজা রক্ত দিয়ে জাতির প্রতি যে অপরিসীম ভালোবাসা, তা প্রমাণ করে গেছেন। জীবনের পুরো পথ পরিক্রমায় বাঙালির সুখ-দুঃখের সঙ্গে একাকার ছিলেন। নিরন্ন, দুঃখী, অভাবী, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত জাতির দুর্ভোগ মোচনে নিবেদিতপ্রাণ হিসেবে অগ্রসেনানীর দায়িত্ব পালন করেছেন। দাঙ্গাপীড়িত বাঙালি-অবাঙালিকে রক্ষায় জীবন বাজি রেখে এগিয়ে গিয়েছেন। লোভ-মোহের ঊর্ধ্বে ছিলেন বলেই শাসকের নানা প্রলোভন উপেক্ষা করে দুঃসাহসে প্রতিবাদ-প্রতিরোধী হয়েছেন। দিনের পর দিন কেটেছে কারাগারে। লৌহকপাটের অন্তরালে কখনো ভেঙে পড়েননি। হতাশা গ্রাস করেনি। শাসকদের সমঝোতার পথকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ভোগ, বিলাস, ক্ষমতার অংশীদারিত্ব ইত্যাদিকে তুচ্ছজ্ঞান করে বাঙালি জাতির ভাগ্যোন্নয়নের জন্য আপসহীনভাবে লড়াই করে

গেছেন শেষদিন পর্যন্ত। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে সগর্বে ঘোষণা করেছেন, 'দাবায়ে রাখতে পারবা না।' সেই সাহসী উচ্চারণ অহেতুক ছিল না। প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, বাঙালি জাতিকে দাবিয়ে রাখা সহজসাধ্য নয়। এই ঘুমন্ত জাতিটিকে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে গেছেন চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে। যে জাতি কখনো বন্দুক-বেয়নেট দেখেনি, সে জাতি একাত্তরে অস্ত্র হাতে লড়াই করেছে বাঁশের লাঠি, লগি-বৈঠা ফেলে। 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' হিসেবে জেনেছেন তিনি। ঘুমন্ত জাতির প্রতিটি শিরা-উপশিরায় রক্তপ্রবাহের উত্তাপ বঙ্গবন্ধু ধারণ করতেন। তাই জাতিকে নিজের মতো করে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ইতিহাসের চাকাকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। হাজার বছর ধরে পরাধীন-পর্যুদস্ত থেকে থেকে যে জাতিটি আধমরা থেকে পুরো মরায় পরিণত হচ্ছিল ক্রমশ; বজ্রহুংকারে শুধু নয়, আদরে-সোহাগে প্রাণের প্রবাহে স্পন্দন তুলে একটি বিন্দুতে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি তিনি। জীবনের পুরো সময়ই থেকেছেন আন্দোলন, সংগ্রামে। তাঁর আজীবন স্বপ্ন ছিল পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করার। দেশ স্বাধীন করার। দীর্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। লাল-সবুজের পতাকায় বাঙালির মুক্তির জয়গান লিখেছেন। তাঁর জীবন এক বীরত্বগাথা।

শুধু বাঙালি জাতি নয়, বাংলা ভাষীসহ অন্য ভাষাভাষী মানুষের কাছেও মুক্তির প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন শেখ মুজিব। বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গার সময় ছুটে গিয়েছেন কোনো পক্ষাবলম্বন না করেই। দুপক্ষকেই নিরস্ত করতে পেরেছিলেন। অবাঙালিদের বলেছিলেন, তোমরা আমার ভাই। পাশাপাশি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, আমার দেশের মানুষের রক্তে হোলিখেলার চেষ্টা করো না। দেশে বসবাসরত বাংলা ভাষী নয়, এমন মানুষকেও তিনি কাছে টেনেছেন। বলেছেন, সাম্য-মৈত্রীর বন্ধনে সবাই যেন যার যার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও এক হয়ে মিশি। ভুলে যাই যেন ভেদাভেদ। নিজের জীবনেও তিনি এই বিশ্বাসবোধের প্রমাণ রেখেছেন। উর্দু ভাষীদের তিনি ঘৃণার চোখে কখনো দেখেননি। বরং তাদেরও বাঙালিদের সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। পৃথিবীর নিপীড়িত জাতিসত্তার বিকাশের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘে বক্তৃতাও করেছিলেন এবং তা বাংলা ভাষায়। বিশ্বদরবারে বাংলা ভাষাকে তিনি দিয়েছিলেন উচ্চাসন।

বঙ্গবন্ধু স্কুলজীবন থেকেই স্বাধীনচেতা ও নির্ভীক ছিলেন। হিন্দু, খ্রিষ্টান এবং মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে বেড়ে উঠেছেন। তাই জন্মগতভাবে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় লালিত ছিলেন। ধর্মীয় গ্রন্থ কোরআন পাঠ করেছেন। কারাগারের জীবনে এবং পাকিস্তানি কারাগারে একাত্তরের ৯ মাস বন্দিজীবনকালে নিয়মিত কোরআন তেলাওয়াত করতেন। কিন্তু কখনোই ধর্মান্ধ ছিলেন না।

তাই ইংরেজি ভাষা ছাত্রজীবনেই চর্চা করেছেন। এ ভাষায় পারদর্শী ছিলেন বলেই এবং মেধাবী হিসেবে সেসময়ের কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হতে পেরেছিলেন। আইন বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা চলাকালেই বহিষ্কৃত হন। অপরাধ, বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি-দাওয়ার প্রতি সমর্থন দান।

মাত্র ১৭ বছর বয়সে 'নেতাজি সুভাষ বোসের' সান্নিধ্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। স্থানীয় জনগণের সমস্যা সমাধানের দাবিতে তিনি যখন অগ্রসরমান, তখন রাজনৈতিক গণ্ডির পরিধিতে ক্রমশ প্রবিষ্ট হতে থাকেন। গোপালগঞ্জে পড়াকালে যে স্বাধীনচেতা মনোভাব তৈরি হয়েছিল, কলকাতায় তা আরও প্রসারিত হয়। সেখানে ছাত্র আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৩৯ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্য তাঁকে রাজনীতিতে সক্রিয় করে তোলে। সাহস ও যোগ্যতায় তিনি সমকালীন অনেককে ডিঙ্গিয়ে পাদপীঠে চলে আসেন। পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমানদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল ১৯০৫ সালে মুসলিম লীগ। তখনকার সময়ের রাজনীতিতে শেখ মুজিব তাঁর গুরু সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগে যোগ দেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেও সক্রিয় ছিলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠার পর দেখেন পশ্চিম পাকিস্তানিরা শাসনক্ষমতায় সর্বত্র। স্পষ্ট হয় যে, এক ব্রিটিশ শোষণ থেকে মুক্তি পেয়ে পাকিস্তানি বেনিয়া শোষকদের হাতে পড়েছে বাঙালি। রাষ্ট্রক্ষমতার কোথাও বাঙালির প্রবেশাধিকার নেই। এমনকি নিজেদের শাসন করার অধিকারটুকুও পাকিস্তানি শাসকরা কব্জা করে রেখেছে। উপলব্ধি হলো, পূর্ববঙ্গবাসী দিন দিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে পড়ছে। শিক্ষা, চিকিৎসা, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান– মানুষ এই মৌলিক অধিকারগুলো থেকেও বঞ্চিত। পূর্ববঙ্গের কৃষকের উৎপাদিত পাটসহ অন্যান্য পণ্য বিদেশে রফতানি করে যে আয় হয়, তার পুরোটাই পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন ও শিল্পায়নে ব্যয় হচ্ছে। পূর্ববঙ্গের মানুষের জীবন আরেক পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ছে। কৃষিজীবী, শ্রমজীবী মানুষের বেঁচে থাকার উৎসগুলো ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট করলেন যে, পূর্ব বাংলার মানুষ অনুভব করে যে, পূর্ববঙ্গকে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ বানানো হয়েছে। পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মী হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মোহমুক্তি ঘটতে শেখ মুজিবের সময় লাগেনি। তাই মুসলিম লীগবিরোধী নতুন রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগ যখন প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন একজন নেতারূপে দেখা দিলেন শেখ মুজিব। গড়ে তুললেন শক্তিশালী বিরোধী দল। বইয়ে দিলেন দেশজুড়ে আন্দোলনের জোয়ার। সেই জোয়ার বাংলার মাঠ, ঘাট, প্রান্তরে প্রবাহিত হতে থাকে। স্বজাত্যবোধ ক্রমশ তৈরি হতে থাকে গণমানুষের মধ্যে। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারে মুসলিম লীগ যে পন্থা নিয়েছে, শেখ মুজিবসহ অন্য নেতারা এর বিরোধিতা করেন। পাকিস্তানকে ধর্মীয় রাষ্ট্র বানানোর নামে শোষণের পথকে আরও সুগম করার পাকিস্তানি মনোভাব ও তৎপরতার বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানীকে নিয়ে সোচ্চার ছিলেন শেখ মুজিব। তাঁদের রাজনীতি বরাবরই অসাম্প্রদায়িক চেতনাসমৃদ্ধ ছিল। তাঁরা পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। সব ধর্মমতের ব্যক্তির রাজনীতিতে ও সংগঠনে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করেন। দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে করা হয় আওয়ামী লীগ। শেখ মুজিব ক্রমশ পূর্ববঙ্গে তাঁর নেতৃত্ব ও সংগঠন সংহত করলেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের কথা বললেন। তিনি উপস্থাপন করলেন ছয় দফা। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা শাসক তার জবাব দিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তৈরি করে। এতেই আগুনে ঘি পড়ল। পূর্ব বাংলার মানুষ শেখ মুজিবকেই একমাত্র স্বার্থরক্ষক হিসেবে দেখলেন। ছাত্ররা ছয় দফাকে এগারো দফায় অন্তর্ভুক্ত করে নামে আন্দোলনে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে সামরিক শাসক আইয়ুব খান বিদায় নিলেন। শেখ মুজিব জেল থেকে মুক্তি পেলেন এবং হলেন বঙ্গবন্ধু। অর্থাৎ বাংলার বন্ধু। এমন যে হতে পারলেন তার কারণ বঙ্গবন্ধুর একাগ্রতা। বিশ্বাস না করে তিনি কোনো কথা বলেননি। যা বলেছেন, তা যথাসাধ্য পালন করেছেন; ভয়ে বা লোভে পড়ে আপস করেননি। ছয় দফার পক্ষে জনমত গঠন করতে গিয়ে এমন জায়গা নেই যেখানে তিনি গ্রেফতার হননি। আজ যশোর, কাল খুলনা, পরশু রাজশাহী, তার পরদিন সিলেট, তারপরে ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম গ্রেফতার হয়েছেন। জামিন পেতে যে সময়টুকু অপচয় হয়েছে, তারপর আরেক জায়গায় ছুটে গেছেন। আবার

গ্রেফতার হওয়া, জামিন পাওয়া, অন্যত্র ছুটে যাওয়া। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পরিণাম কী হতে পারত, জানা নেই। তবে এটুকু জানি যে, আইয়ুব খান তাকে শাস্তি, এমনকি মৃত্যুদণ্ড দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। যেমন, একাত্তরে ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর জেলখানার পাশে কবর খুঁড়েছিলেন এবং মৃত্যুদণ্ড ঘোষণাও করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু কিন্তু এসবে ভীত হননি কখনো। কাপুরুষ হননি বলেই পৌরুষোচিত বীরত্ব ছিল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিঘ্ন সৃষ্টির বহু চেষ্টা হয়েছিল। মওলানা ভাসানীও ভোটের আগে ভাত চেয়েছিলেন, ব্যালট বাক্সে লাথি মারতে বলেছিলেন। তেইশ বছরে পাকিস্তানে একবারও সাধারণ নির্বাচন হয়নি। এ কথা মনে রাখলে নির্বাচন না চাওয়া বিস্ময়কর মনে না হয়ে পারে না। নির্বাচন হলো এবং বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেন। তাঁর সমালোচকরা বলল, এবার তিনি আপস করবেন। কিন্তু আপস হয়নি। সারা পৃথিবী সংগ্রামের এক নতুন রূপ দেখেছিল। সেদিন এ সংগ্রামে সারা দেশের মানুষ তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। তখন বঙ্গবন্ধুর বয়স পঞ্চাশ বছর। তাঁর চেয়ে বর্ষীয়ান ও অভিজ্ঞ নেতা অনেক ছিলেন দেশে। মানুষ কিন্তু বঙ্গবন্ধুকেই তাদের নেতা বলে, তাদের স্বার্থের রক্ষক বলে জেনেছিল। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত অন্তত মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। বিপুল ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেলেও পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ও তাদের দোসর জুলফিকার আলী ভুট্টো ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র শুরু করে। বিজয়ী দল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি তোলা হলেও তারা তাতে কর্ণপাত করেনি। আলোচনার টেবিলে পাকিস্তানিরা আপসের নানা ফর্মুলা দিলেও বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষের অধিকার রক্ষার প্রশ্নে কোনো আপসে রাজি হননি। বঙ্গবন্ধু বুঝতেন, পাকিস্তানিদের সঙ্গে আর বসবাস সম্ভব নয়। জোড়াতালি দিলেও মেলানো যাবে না। সুতরাং, ছয় দফা দাবিকে সামনে রেখে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু এক দফা ঘোষণা করলেন এবং তা স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম। সারাদেশ গর্জে উঠল সেই ডাকে। পাকিস্তানের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল বাংলাদেশ। বিশ্বের মানচিত্র থেকে মুছে গেল 'পূর্ব পাকিস্তান' নামটি। উঠে এলো 'বাংলাদেশ' নামক একটি নতুন রাষ্ট্র। বঙ্গবন্ধুর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনকালে পুরো জাতি যে একটি বিন্দুতে এসে স্থির-প্রত্যয়ী হয়ে ওঠে, তা হচ্ছে স্বাধীনতা। পূর্ব বাংলার মানুষ স্বাধিকারের দাবি থেকে স্বাধীনতার দাবিতে পৌঁছে গেছে ততদিনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে। পশ্চিমা সংবাদপত্রে বলা হলো 'ভয়েস অব বেঙ্গল'। সত্যিকার অর্থেই বঙ্গবন্ধু তখন বাংলার কণ্ঠস্বর। ৭ মার্চের ভাষণে তিনি পুরো জাতিকে তাঁর স্বাধীনতার জন্য করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিলেন। এমন পূর্বাভাসও দিলেন, 'আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তবে তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।' ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরস্ত্র মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বাঙালি নীরবে আক্রমণ মেনে নেয়নি। বঙ্গবন্ধু 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে' তোলার জন্য বলেছিলেন। সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিব। পাকিস্তানিদের আক্রমণের মুখে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। সেই ঘোষণা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। সারা বাংলার মানুষ প্রতিরোধী হয়ে ওঠে। গণহত্যার বিরুদ্ধে, স্বাধীনতার লক্ষ্যে বাঙালি অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল শেখ মুজিবের ডাকে। গড়ে উঠল স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার। যুদ্ধের নয় মাস বঙ্গবন্ধু অনুপস্থিত। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা তাঁকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে যায়। কিন্তু বাংলার জনগণ সশস্ত্র যুদ্ধ চালিয়ে যায় বঙ্গবন্ধুর নামে। বঙ্গবন্ধুর প্রভাব এমন সর্বব্যাপী ছিল যে, মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে পাকিস্তানের সঙ্গে আপস করার চেষ্টা যারা করেছিল, তারাও বঙ্গবন্ধুর নাম ব্যবহার করেছিল।

স্বাধীন বাংলাদেশের পরিস্থিতি নাজুকই ছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে অস্ত্রের ব্যবহার নাগরিক সমাজকে বদলে দিয়েছিল। রাজনীতির ধরনটাই পালটে দিয়েছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম এবং পরিণামে সবকিছুর মূল্য বেড়ে গেল। দেশের প্রধান রফতানি পণ্য পাটের চাহিদা কমে গেছে। মানুষের প্রত্যাশা পূরণের সুযোগ তখন ঘটছিল না। দেশি ও বিদেশি ষড়যন্ত্র শুরু হয় বাংলাদেশকে ঘিরে। বামপন্থি ও দক্ষিণপন্থিরা আদাজল খেয়ে লাগল। পরস্পরবিরোধী দাবিতে রাজপথ মুখর হতে থাকল। কেউ চায় পাকিস্তানি সেনাদের বিচার, কেউ চায় পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনে যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি। কেউ চায় ঘাতক-দালালদের বিচার। আবার দালাল আইন প্রত্যাহার না করলে আন্দোলন করবেন বলে স্বয়ং মওলানা ভাসানী ঘোষণা করলেন। স্বাধীনতাবিরোধীদের চক্রান্ত বাড়তে থাকে।

পূর্ব বাংলার মানুষ স্বাধিকারের দাবি থেকে স্বাধীনতার দাবিতে পৌঁছে গেছে ততদিনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে। পশ্চিমা সংবাদপত্রে বলা হলো 'ভয়েস অব বেঙ্গল'। সত্যিকার অর্থেই বঙ্গবন্ধু তখন বাংলার কণ্ঠস্বর

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের জন্য যে বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দায়ী, তা জনগণকে বোঝানো হয়নি। ছাত্রদের একটি অংশ 'গণবাহিনী' নামে সশস্ত্র অবস্থান নেয়। তারা থানা লুট, ফাঁড়ি লুট, পাট ও খাদ্যের গুদামে আগুন দেওয়াসহ নাশকতামূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। অনেক স্থানে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের হত্যা করা হয়। পাকিস্তানিদের দোসর আলবদর ও রাজাকাররা ১৯৭১'র ১৬ ডিসেম্বরের পর পাকিস্তান, মধ্যপ্রাচ্যসহ ইংল্যান্ডে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তারাও বিদেশ থেকে বাংলাদেশবিরোধী প্রচার অব্যাহত রাখে। নানামুখী ষড়যন্ত্রের মুখে বঙ্গবন্ধু দেশ, জাতি ও রাষ্ট্র রক্ষায় একটি মহৎ প্রকল্প নেন। তিনি স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির অপতৎপরতা প্রতিরোধেরও

ডাক দেন। তাঁর আহ্বান জনগণের কানে পৌঁছলেও শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। চোরাগোপ্তা হামলায় প্রাণহানি ঘটছিল, ধ্বংস হচ্ছিল সম্পদ। সর্বহারা পার্টি নামে পাকিস্তানপন্থি দলগুলো এবং তাদের দোসর স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই সশস্ত্র অবস্থান নিয়েছিল। এই অরাজকতা, ধ্বংস, হানাহানির বিরুদ্ধে তিনি জনগণকে সংগঠিত করার প্রয়াস নেন। গড়ে তোলেন কৃষক-শ্রমিকের জন্য সংগঠন 'বাকশাল'। একটি জাতীয় ঐক্যের মঞ্চ। বাকশাল নীতিমালা প্রণীতও হয়। কিন্তু কার্যকর করার শুরুর সময় হতেই সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী সদস্য ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে। যারা তাঁকে হত্যা করেছিল, তারা পাকিস্তানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চেয়েছিল। তাই যে তাজউদ্দীন আহমদ এক বছর আগে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, সেই তাঁকেও ঘাতকরা রেহাই দেয়নি। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর আরও তিন জাতীয় নেতার সঙ্গে স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনকেও জেলখানায় হত্যা করেছিল। পাকিস্তান অভিনন্দন জানিয়েছিল 'ইসলামি প্রজাতন্ত্রী' বাংলাদেশকে।

মুক্তিযোদ্ধাদের সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়া পঁচাত্তর সালের ৭ নভেম্বর ক্ষমতা দখল করার পর খুনি মোশতাকের ধারায় দেশকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত করার সুযোগ নেয়। তিনি একাত্তরের পরাজিত শক্তিকে রাজনীতিতে পুনর্বাসন করার কাজটি করেন। এরা শাসনক্ষমতায় বসে। এরপর ছড়ি ঘুরাতে থাকে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে যায়। স্বাধীনতার ইতিহাস, মূলনীতি বিকৃত হয়। বিকৃত হয় জাতীয় সংগীত। এভাবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে ফেলাই শুধু নয়, শেখ মুজিবের নামও মুছে ফেলার চেষ্টা চলে। কিন্তু ইতিহাসের পাতাজুড়ে শেখ মুজিবের নাম জ্বলজ্বল করে। সবকিছু ছাপিয়ে এই একুশ শতকেও আছেন বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির জন্য দিকনির্দেশনা নিয়ে। তাঁর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জাতি শেখ মুজিব হত্যার বিচার পেয়েছে। পলাতক খুনিদের দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু হত্যার আরও আসামি মৃত্যুদণ্ডাদেশ নিয়ে পলাতক রয়েছে। জেলহত্যার বিচারও হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবনদানের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন, তিনি তাঁর দেশ, জাতি ও জনগণের প্রতি ছিলেন সৎ। তাঁর সততা ছিল বাঙালির প্রতি, বাঙালির সংস্কৃতির প্রতি, বাঙালির স্বাধীনতার প্রতি। সততার মাত্রা তীব্র ছিল বলেই কোনো দিন রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাননি। লড়াই করেছেন সাহসের সঙ্গে। গুলি বঙ্গবন্ধুর বুকেই লেগেছিল, পিঠে নয়।

**লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক, মহাপরিচালক**
**প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)**

**গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য**
**পিআইবি'র প্রকাশনা**

**যোগাযোগ**
**প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ**
**প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)**
**৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা**